ছোটদের সেরা মাসিকপত্র শারদীয়া সংখ্যা ১৩৮৮

সন্দেশ

লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ ও সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত

3-upmanship!

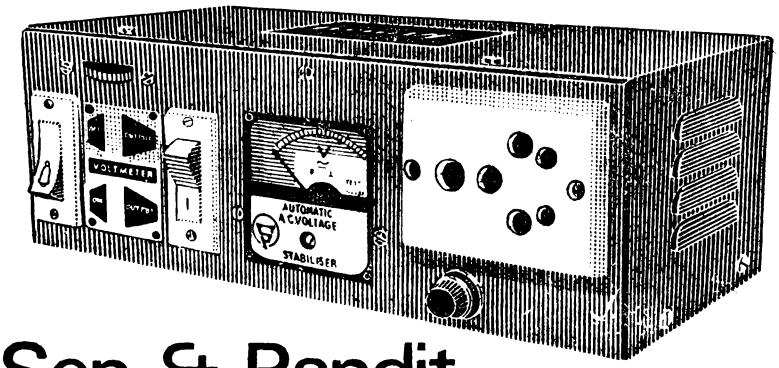

Sen & Pandit voltage stabilisers: thrice ahead on design, quality control, after-sales-service.

Superior design guarantees superior performance. Rigorous quality control ensures it. And dependable after-sales-service maintains it over the years!
More people depend on Sen & Pandit than any other stabiliser.

DESIGN QUALITY SERVICE

Electronics Division Sales & Service
SEN & PANDIT LIMITED
16/B Lake View Road, Calcutta 700 029, Phone : 42-4026

শারদীয়া সংখ্যা

ভাদ্র-আশ্বিন

সন্দেশ

লীলা মজুমদার - নলিনী দাশ

ও সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত

কার্ত্তিক মাস থেকে শুরু হবে

লীলা মজুমদারের উপন্যাস

হাওয়ার দাঁড়ি।

পৃষ্ঠা

১৬। **রেলগাড়ির আদিপর্ব।** ১৬

১৭। **বাংলার শরৎ** সুলতা সেনগুপ্ত

১৯। **তিনটি তামার পয়সা** মীরা বালসুব্রমনিয়াম্

২২। **প্রজাপতি** আভা রায়

২৩। **শেলটার** লীলা মজুমদার

৩০। **দাদা গো দাদা** সুব্রত সেন

৩১। **ছিরু হরবোলার ডাক** অজেয় রায়

৩৬। **ডাক নাম** সন্তোষ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

৩৭। **রবিদাস কাহিনী** রেবন্ত গোস্বামী

৪৩। **তফাৎ কিছুই নেই** করুণাময় বসু

৪৫। **ছুটি** প্রণব মুখোপাধ্যায়

৪৭। **উপকার** কুমারেশ ঘোষ

৪৯। **পিঁপড়ে রাণীর সিংহাসন** গৌরী ধর্মপাল

৫২। **রাজা** দেবী চৌধুরী

৫৫। **ঘোড়ায় চেপে কত খেলা** উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

৫৭। **জাম্বুবানের মা** সঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়

৬৩। **বাচ্চা ভূত** সুধীন্দ্র সরকার

৬৪। **ভাইরাসের গল্প** ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

৬৭। **কোনটা** শৈলেন কুমার দত্ত

৬৯। **ডাক্তার কিষ্কিন্ধ্য** অশোক মুখোপাধ্যায়

৭৪। **ভক্তের খোঁয়াড়** ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

৭৭। **প্যারী শহরে দেখানো ম্যাজিক** যাদুসম্রাট এ সি সরকার

৭৯। **রাজা ও পারিষদ** রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

৮০। **জাদুকর** অশোক হালদার

৮০। **সর্ব প্রধান** আদিনাথ নাগ

৮১। **নেপোলিয়নের চিঠি** সত্যজিৎ রায়

৯৩। **মা দুর্গার হাসি** সুভাষ প্রসন্ন ঘোষ

৯৯। **গ্রহ বৈগুণ্যে** শিবাশিস মুখোপাধ্যায়

১০৩। **শরৎ** রথীন্দ্রনাথ রায়

১০৫। **ছড়া** বিশ্বপ্রিয়

১০৮। বিনা মেঘে মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু
১১০। ভূতের জামীন প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
১১৫। মেক আপ শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ
১২৪। পুলিস নাকাল ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়
১২৬। বাবুনের চিঠি ও খেলনা মোটর গাড়ি বিশ্বরূপ মণ্ডল
১২৭। লাজুকবর্ণার মেঠো ভালুক গঙ্গেশ বিশ্বাস
১৩২। সাজার মজা সুনির্মল বসু
১৩৩। টুলটুল ফুলফুল আর বুলবুল নবনীতা দেবসেন
১৩৭। বনমুলুকের উলুক ঝুলুক সরল দে
১৩৮। দাদুর বেড়াল সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
১৪৩। ছড়া অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
১৪৮। নরঘাতক চিতা ও অ্যাণ্ডারসন সাহেব মঞ্জিল সেন
১৫২। জয় বাংলা অসিতবরণ হাজরা
১৫৩। বৃষ্টির দিনে মনে মনে বুদ্ধদেব গুহ
১৫৬। ভালো লাগে ধূর্জটিপ্রসাদ দত্ত
১৫৭। বাঘের ওপর টাগ বাণী রায়
১৫৮। একটু মিষ্টির জন্য শিশিরকুমার মজুমদার
১৬৪। চোখের রোগে ভোগেন কেন? ভবানীপ্রসাদ মজুমদার
১৬৫। পূজোর চিঠি সঃ সঃ
১৬৬। পুরস্কার ভবানীপ্রসাদ দে
১৬৯। ছড়া গোবিন্দপ্রসাদ বসু
১৬৯। ছড়া সলিল মিত্র
১৬৯। ছড়া চুনী দাশ
১৭০। দুঃখী এক উষ্ট্র প্রেমেন্দ্র মিত্র
১৭১। একটি ছেলের গল্প মহাশ্বেতা দেবী
১৭৪। শব্দই ব্রহ্ম অভীক বসু
১৭৫। লোকটা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
১৭৬। কোগ্রামের মধুপণ্ডিত শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
১৮০। জানোয়ানি সুনির্মল চক্রবর্তী
১৮১। কলকাতায় গণ্ডার নলিনী দাশ
১৮৭। মারা রবি ভট্টাচার্য
১৯১। বুড়োর আদর কালিদাস ভট্টাচার্য
১৯৩। রূপকথা বিজন গঙ্গোপাধ্যায়
১৯৭। ব্যাপারটা কি? জোড়া প্রতিযোগিতা

বিশেষ পূজা কমিশন

পুরোন সন্দেশ নতুনের মত মিষ্টি—তাড়াতাড়ি কিনে নাও আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বিশেষ সুবিধাদরে পাবে। পরে ফুরিয়ে যাবে।

১৩৮৭ (সম্পূর্ণ বছর) বাঁধানো—১৫.০০, না বাঁধানো—১২.০০
১৩৮৬ (শ্রাবণ সংখ্যা নাই) বাঁধানো—১২.০০
শারদীয়া সংখ্যা ১৩৮৭—৫.০০, ১৩৮৬—৫.০০

দুই বছরেই ছিল ফেলুদার সম্পূর্ণ উপন্যাস। হীরক রাজার দেশের প্রথমাংশ সত্যজিৎ রায়ের নিজের কথা। অনেক ভাল ভাল উপন্যাস গল্প-প্রবন্ধ-ছড়া ও কবিতা। তোমাদের প্রিয় লেখক লেখিকার লেখা।

সন্দেশের নিয়মাবলী

(১) সন্দেশের বার্ষিক সডাক মূল্য ২৪·০০, বৈশাখ-আশ্বিন (ছয় মাস) ১৬·০০, এবং কার্ত্তিক-চৈত্র ৮·০০ শারদীয়া সংখ্যা বেজিঃ ডাকে যাবে। শারদীয়া সংখ্যা হাতে নিলে, যথাক্রমে ২১·০০, ১৩·০০ ও ৮·০০। সব কটি সংখ্যা তে নিলে ২০·০০, ১২·৫০ এবং ৭·৫০।

(২) সাধারণ সংখ্যার দাম ১·৮০, বৃহদায়তন শারদীয়া সংখ্যা (আনুমানিক) ১২·০০। গ্রাহকদের বাড়তি দাম দিতে হবে না।

(৩) যে কোনো সময়ে চাঁদা দিয়ে বৈশাখ বা কার্ত্তিক থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

(৪) প্রতি বাংলা মাসের মাঝামাঝি, ইংরাজি মাসের প্রথমে সন্দেশ প্রকাশিত হয় এবং Under Certificate of Posting পাঠানো হয়।

(৫) ইংরেজি মাসের শেষেও বই না পেলে, এবং Suptt. of Post Offices (যার যার এলাকার) কাছে লিখিত নালিশ জানিয়ে তার কপি দিলে ডুপ্লিকেট দেওয়া হবে।

(৬) সন্দেশের চাঁদা মনিঅর্ডারে, নগদ অথবা 'চেকে' পাঠান যায়। Sandesh নামে চেক লিখবেন **মফঃস্বলের চেক দিলে ভাঙ্গাবার খরচ পাঁচ টাকা লাগবে।**

(৭) গ্রাহক গ্রাহিকারা চিঠিপত্র, ধাঁধার উত্তর, লেখা, ছবি ইত্যাদি পাঠাবার সময়ে গ্রাহক নম্বর, নাম ঠিকানা ও বয়স স্পষ্ট করে লিখবে। **সন্দেশ পাঠাবার সময়ে নামের বাঁপাশে গ্রাহক সংখ্যা লিখে দেওয়া হয়।** গ্রাহক স্কুল, ক্লাব বা লাইব্রেরির প্রতিটি ছাত্র/মেম্বার গ্রাহক। ব্যক্তিগত উত্তর চাইলে জোড়া পোঃ কাঃ লিখলে হবে।

(৮) লেখকেরা স্বনামাঙ্কিত পোঃ কাঃ দিলে ফলাফল জানানো হবে, উপযুক্ত টিকিটযুক্ত খাম দিলে অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হবে। **কোন মাসে পাঠানো হয়েছিল সঠিকভাবে না জানালে** ফলাফল জানানো সম্ভব নয়। আলগা টিকিট পাঠাবেন না।

(৯) হাতে নিলে পাঁচ, ডাকে নিলে কুড়ি কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। আমরা নিজব্যয়ে মফঃস্বল এজেন্টকে পত্রিকা পাঠাব কিন্তু ফেরত দেবার মূল্য এজেন্টকে দিতে হবে। রেলওয়ে পার্শেল নেওয়া হয় না।

সন্দেশ কার্যালয় ১৭২/৩ রাসবিহারী এভিন্যু, কলিকাতা -২৯, ফোন : ৪৬-৪৯১৯

নিউস্ক্রিপ্টের দোকান এ-১৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা-৭

	রসরাজ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-৭	**রুবীন বর্মণ** টাইমস অব ইণ্ডিয়া হাওড়া এলাকায়	**প্রশান্ত নন্দী** গড়িয়াহাট বিপনি গড়িয়াহাট মোড়	**অবনী দেশাই** হাজরা মোড়
নরেন রায় ধর্মতলা	**সুনীল দত্ত** দমদম	**প্রদীপ রায়** শিয়ালদহ	**শ্যামল ভট্টাচার্য** কলেজ স্ট্রিট মোড়	**স্বপন সরকার** শ্যামবাজার

হাওড়া, শিয়ালদহ ও অন্যান্য বড় বড় রেলস্টেশনে হুইলার বুকস্টল

ছোটদের সব সেরা বই

শৈল চক্রবর্তী

সবুজ আয়না	৪·৫০
স্বামী বিবেকানন্দ	৩·০০
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	২·৫০
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু	২·৫০

সরল দে

ল্যাজ কাহিনী	৪·৫০
আঁকন বাঁকন	৩·০০

তারাপদ রাহা

বিজ্ঞানের হাতছানি	৪·৫০
ছোটদের রামায়ণ	৪·০০
মহাভারতের কথা	৪·০০

চিত্ত ঘোষাল

আজব বাঘের তাজ্জব কাণ্ড	৫·০০

মিহির আচার্য

পুতুলের সংসার	৪·০০

অজয় ভট্টাচার্য ও অঞ্জনা ভট্টাচার্য

পুরাণের গল্প কথা ও পুরাণ পরিচয়	৭·৫০

অসীম রাহা

ছড়া শোনো গল্প শোনো	৩·৫০

নিতাই ঘোষ

জয় মিশারই জয়	২·৫০
পড়া নয় ছড়া	১·০০

কার্তিক ঘোষ

চলো চিড়িয়াখানা	৫·০০

দে বুক স্টোর, শৈব্যা পুস্তকালয়,
স্টার বুক হাউসে পাওয়া যায় আমাদের সব বই

উদয় প্রকাশন

১৩, নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার, কলকাতা-৯

তোমাদের মনের মতো

বই

নির্মল বুক এজেন্সি

নির্মল বুক এজেন্সি

১৯, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা-৭০০০০৭

এবার পুজোয় কোনটা নেবে—কিসের এতো ধুম !
এ-বইগুলোই মন কেড়ে নেয়, নেয় যে কেড়ে ঘুম !!

প্রেমেন্দ্র মিত্র
দুনিয়ার ঘনাদা ৭.

শংকর
এক ব্যাগ শংকর ৭.
চিরকালের উপকথা ৮.

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী
অবিশ্বাস্য ৬.

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
সিকোপিকেটিকে ৮. ফয়সলা ৭.
পিন্‌ডিদার গপ্‌পো ৬.

প্রফুল্ল রায়
সেনাপতি নিরুদ্দেশ ৬.

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
অক্ষরে অক্ষরে ৫.

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী
বাংলা সাহিত্যে মা ৪.

গিরিধারী কুণ্ডু
দুষ্টু টুসটুসি ৫. বুলাই ৫.

ফণিভূষণ আচার্য
সোনার সুটকেস ৬.

অরূপরতন ভট্টাচার্য
বিজ্ঞানীর দপ্তর ৫.
পৃথিবীর বাইরে কি
বুদ্ধিমান জীব আছে ? ৮.
কাঠি নিয়ে কঠিন খেলা ৬.
সংখ্যার অসংখ্য খেলা ৬.
বৈঠকী ধাঁধার খেলা ৬.
ধাঁধা নিয়ে মজার খেলা ৬.
আকাশ চেনো ১০. আমরা কেন
আমাদের মত দেখতে ৭. বিজ্ঞান
জিজ্ঞাসুর ডায়েরী ৭ রম্যগণিত ৭.

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
করে দেখ (১, ২, ৩) প্রতি খণ্ড ৬.

অমরনাথ রায়
বিশ্বের বিজ্ঞানী ৮.

সুধাংশু পাত্র
বিজ্ঞানী প্রসঙ্গ ৮.
বিজ্ঞানী চরিতকথা ১০.

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনূঃ
জুল ভের্নের যত ঝক্কি যত ঝামেলা ১০.
জুল ভের্নের শ্রেষ্ঠ গল্প ৮.
পৃথিবী কী করে বাঁচলো ৬.
(স্তানিসোয়াভ লেম)
জেকব দুই দুই আর
ফণাধর দন্তপাটি
মুখোমুখি (মরডেকাই রিচলার) ৬.
মিডনাইট (র‍্যানডলফস্টো) ১০.

শ্রাবন্তী ঘোষ অনূদিত
চিকি আর নদী (চিনুয়া আচিবি) ৬.

সুনীল চৌধুরী
সুন্দর দুর্গমের পথে ৬.
নীলকণ্ঠের ডাকে ৬.

পরিচয় গুপ্ত
ভৌতিক শিকার কাহিনী ৪.
ভূত যখন পূত ৪.
মানুষ যখন ভয়ংকর ৫.

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুন্দরবনের আতঙ্ক ৮.
বাকলার জঙ্গলে ৭.
শিকারের বিচিত্র কাহিনী ১০.

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
সামন্ত বাড়ি ৬. হলুদ আতঙ্ক ৫.

কার্তিক ঘোষ
পাতার বাঁশি ৫.

সুবোধকুমার চক্রবর্তী
শাশ্বত ভারত ঋষির কথা ১৪.
অসুরের কথা ১২.
তীর্থের কথা ১৪.

বুদ্ধদেব গুহ
দূরের দুপুর ৮.
দূরের ভোর ৭.

পূর্ণেন্দু পত্রী
হাসতে হাসতে খুন ৬.

সুনির্মল বসু
ছোটদের বিদ্যাসাগর ৬.

সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ
বনের আসর ৫. ভয়-ভুতুড়ে ৫.
নিঝুম রাতের আতঙ্ক ৬.
টোরাদ্বীপের ভয়ংকর ৬.

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মিঠুয়ার বন্ধু ডলফিন ৫.

এ ছাড়াও তোমাদের জন্যে সবরকম ভালো বই আমাদের কাছেই পাওয়া যায়

দেজ পাবলিশিং C/o **দে বুক স্টোর**

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩; ফোন-৩৪ ৫০৩৫

॥ ছোটদের জন্য সেরা উপহার ॥

সুনীলচন্দ্র সরকার

কালোর বই

পশুপাখি ও মানুষ নিয়ে এমন কাহিনী বাংলায় আর নেই। ৫ টাকা।

অজেয় রায়

মুঙ্গু

আফ্রিকার পটভূমিকায় দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী। ৮ টাকা।

বিমলকুমার ভট্টাচার্য্য

বাঘ হাতি হরিণ

অরণ্যের এই তিন সুন্দর ও ভয়ঙ্কর প্রাণীর কাহিনী। ৬ টাকা।

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

এশিয়ার রূপকথা

অসামান্য সব রূপকথা ও উপকথার সচিত্র সংকলন। ৮'৫০ টাকা।

সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

ইলিয়াড ও অডিসির গল্প

মহাকাব্য দু-খানির সচিত্র কাহিনী। ১০ টাকা।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

বিপ্লবের কথা

ন না দেশে বিপ্লবের রোমাঞ্চকর কাহিনী। ৭ টাকা।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ছোটদের অমনিবাস

উপন্যাস, গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধের সংকলন। ১২ টাকা।

শচীন্দ্রনাথ বসু

বিশ্ব বিচিত্র

জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে সর্বাধুনিক তথ্য-সংকলিত সচিত্র বই। ১২'৫০ টাকা।

এণাক্ষী ও শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়

পরমাণু-জিজ্ঞাসা

সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব গল্পের মতো বলা হয়েছে। ১২ টাকা।

ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড

১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলকাতা ৭২

বম্বে নয়াদিল্লী মাদ্রাজ বাঙ্গালোর হায়দ্রাবাদ পাটনা

প্রকাশিত হয়েছে

নীহাররঞ্জন গুপ্তর

কিশোরসাহিত্য-সমগ্র

চতুর্থ খণ্ড ১৭

চতুর্থ খণ্ড ঃ কায়াহীনের প্রতিশোধ, আতঙ্ক, নিশির ডাক, লালু ভুলু, আলো নেই, রাতের আতঙ্ক,

১ম খণ্ড ঃ ১৫৲ ২য় খণ্ড ঃ ১৬৲

৩য় খণ্ড ঃ ১৪৲

যে সকল সহৃদয় ক্রেতা ৪টি খণ্ড একসঙ্গে সংগ্রহ করবেন তাঁরা ৬২৲ টাকার বই ৫৫৲ টাকায় পাবেন।

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট-৭৩/৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড-৯

পুজায় অন্নপূর্ণার ছোটদের বই !

১।

রেভারেণ্ড লাল বিহারী দে রচিত

বাংলার উপকথা—

ফোক টেলস অব বেঙ্গল

লীলা মজুমদার সম্পাদিত ১০·০০

২।

হীরে মোতি পান্না

অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর, প্রেমেন্দ্র মিত্র,

লীলা মজুমদার ১৫·০০

৩।

গুপী পানুর কীর্ত্তি কলাপ

লীলা মজুমদার ১০·০০

অন্নপূর্ণা প্রকাশণী

৩৬ নং কলেজ রো কলিকাতা ৯

এবার পুজোয় ছোটদের সব সেরা বই

একটি কি দুটি নয়, একেবারে তিনটি। তিন রকমের।

যেমনি মন ভরানো লেখা, তেমনি চোখ জুড়োনো ছবি।

আকাশবাণী শিশুমহলের পরিচালিকা

ইন্দিরা দেবী-র

রাজ্যের রূপকথা ৫·০০

দেশ বিদেশের দশটি গল্প। ছবি এঁকেছেন একালের

দুর্ধর্ষ তরুণ শিল্পী ধীরেন শাসমল।

কিন্তু ছোটরাও যে ছবি আঁকতে ভালবাসে। ভালবাসে

ফেলে দেওয়া জিনিস নিয়ে কত কি গড়তে। আর

তাদের কথা ভেবেই লিখে এঁকে দিয়েছেন ছড়া-ছবির রাজা

নিতাই ঘোষ

এসো ছবি আঁকি ৫·০০

শুধু উপহার কেন, ইস্কুলেও বইটা খুউব দরকার।

কিন্তু শেষ বইটি আরো মজার, আরো ঝলমলে। ছোটরা

যেমনি চায় তেমনি সব আজগুবি গল্প। নিতাই ঘোষের

আঁকায় সাজিয়ে দিয়েছেন লেখায়

কার্তিক ঘোষ

অল্প কথার গল্প ৫·০০

যাঁর লেখা 'চলো চিঁড়িয়াখানা' কাড়াকাড়ি করে পড়ে ছোটরা।

এ ছাড়া আরও দুটি বই শীগ্‌গীরই বের হবে।

লিখেছেন

শিশির মজুমদার

শব্দ-সিঁড়ি রহস্য (যন্ত্রস্থ)

মঞ্জিল সেন

মহারাষ্ট্রে রহস্য "

উদয় প্রকাশন

১৩, নরেন্দ্র সেন স্কোয়ার ॥ কলকাতা-৯

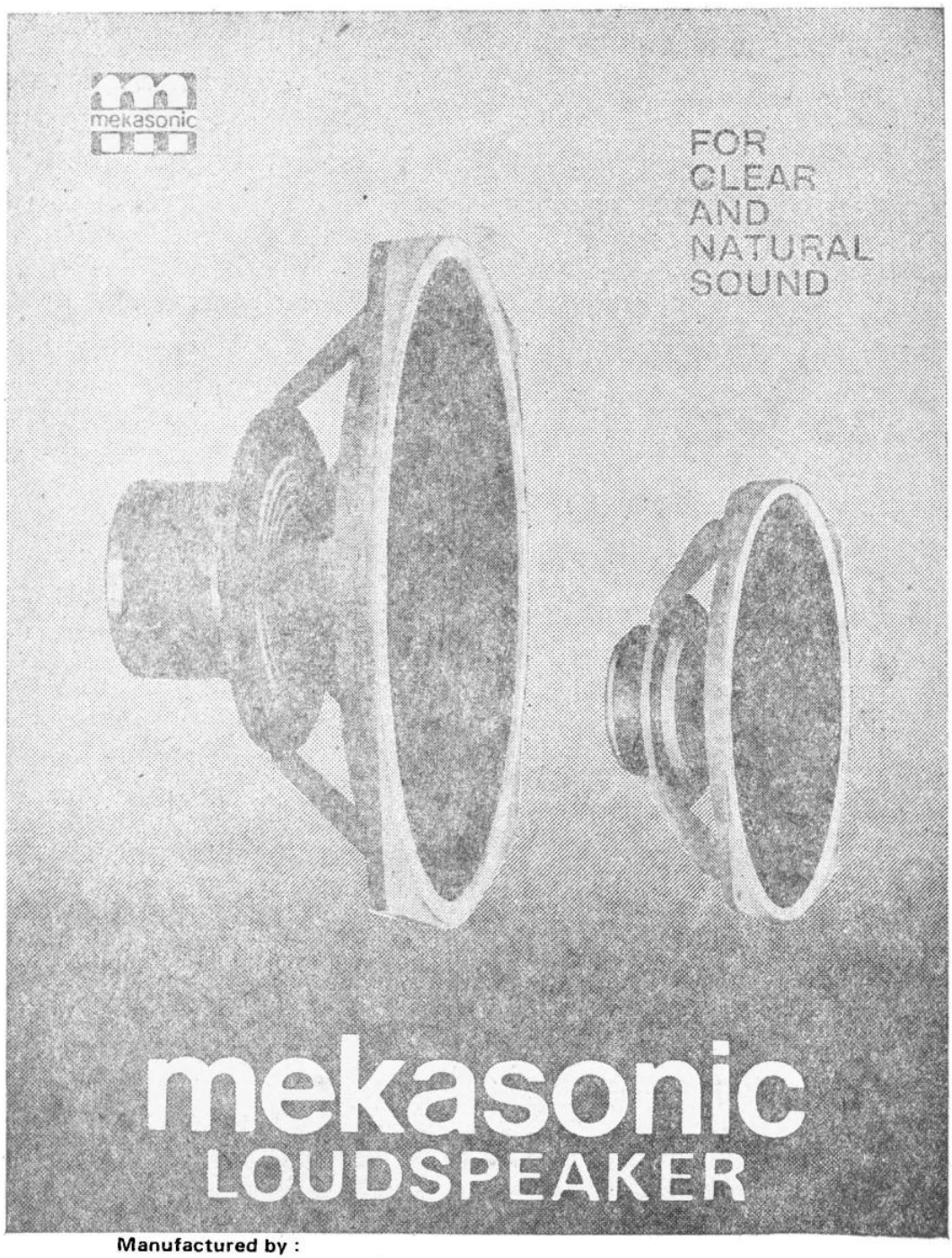

Manufactured by :

MEKASONIC CORPORATION

• Regd Office : 20/1/1L, Ballygunge Station Road, Cal. 700019.

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

DUNICS

113/4, HAZRA ROAD
CALCUTTA-700 026

Phone : 43-1338, 47-9257
CABLE : DUCONICS

DISTRIBUTORS FOR :

Cosmic Stereo Systems, Aplab Equipments, Superior Calculators, Asha Rivets, Buckles, Eyelets & Other Precision Press Parts.

ASSOCIATE COMPANY :

M/s. ELECTROTEKNIK

113/4, HAZRA ROAD
CALCUTTA—700 026

SERVICE CENTER FOR HIGH QUALITY AUDIO EQUIPMENTS.

আমাদের
শারদীয়
অভিনন্দন

★
★★

ক্যাক্সটন এণ্ড কোম্পানী

১বি, আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২০

পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন সমবায় কর্পোরেশন লিমিটেড

আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় সমবায় পদ্ধতিতে নিম্নবর্ণিত অর্থকরী কর্মসূচী রূপায়ণের নিমিত্ত নিগম প্রদত্ত বিবিধ ঋণদানের সুবিধা গ্রহণ করিবার জন্য সাধারণভাবে আদিবাসীগণের সমবায় সমিতিগুলিকে এবং বিশেষভাবে আদিবাসী এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পাধীন বৃহদায়তন বহুমুখী সমবায় সমিতিগুলিকে (LAMPS) আহ্বান জানান যাইতেছে।

* কৃষিকর্মের সহায়ক বীজ, কীটনাশক ঔষধ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ।
* কৃষিজ ও বনজ সম্পদ সংগ্রহ ও বিপণন।
* নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ।
* বিবিধ উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা।
* পশুপালন, কুটীরশিল্প ও বিভিন্ন অর্থকরী প্রকল্প রূপায়ণ।
* সমবায় শস্যভাণ্ডার পরিচালন ইত্যাদি।

এই বিষয়ে উদ্যোগী সমবায় সমিতিগুলিকে কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ৯নং রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৭০০০৭৩ এবং সংশ্লিষ্ট জেলার তপসিলী ও আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকগণের সহিত যোগাযোগ করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

বিমলারঞ্জন প্রকাশনের বই ॥ নিজে পড়ুন বাচ্ছাদের পড়ান।

শিশু সাহিত্যিক লীলা মজুমদারের তিনখানি মনের মতো ছোটদের বই :

হাতি! হাতি! ৬·০০

বুনো হাতি, শিকারে হাতি; পোষা হাতি! প্রায় সব রকম হাতির গল্পগুলোই সত্য ঘটনার ওপর লেখা। কিশোররা, শিশুরা, বড়রা—সবাই রুদ্ধ নিশ্বাসে পড়তে পারবে।

ভূতোর ডায়েরী ৫·০০

পড়তে পড়তে অভিভূত হবে। মনে আনবে চাঞ্চল্য। দারুণ অ্যাডভেঞ্চার। এক নিশ্বাসে পড়ার মতো বই

আরো ভূতের গল্প ৭·০০

নানা ধরনের ভূতের গল্প। কিছু সত্য, কিছু শোনা। শিশুদের মন ভরাবে।

ধীরেন্দ্র লাল ধর ॥ মেঘনার মোহনায় ৮·০০

দুর্দান্ত পর্তুগীজ দস্যু গঞ্জালোর রোমাঞ্চকর কাহিনী

মঞ্জিল সেন ॥ রাতের আতঙ্ক ৬·০০

গা ছমছম করা রোমাঞ্চে ভরা বই! কিশোরদের মনমাতানো বই!

প্রভাতরঞ্জন রায় ॥ তুষার মানবের সন্ধানে ৬·০০

সত্যিই অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী। তুষার মানব বা ইয়েতিকে জানতে হলে বইখানি একান্তই পড়া দরকার।

অজেয় রায় ॥ আমাজনের গহনে ৪·৫০

অ্যাডভেঞ্চার, রহস্য—সব মিলিয়ে বইটি কিশোরদের আকৃষ্ট করবে।

প্রেমেন্দ্রনাথ মিত্র বইখানির সুখ্যাতি করেছেন।

বিমলারঞ্জন প্রকাশন ৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

—তিন বন্ধু—

রমেশ—রহমান, রবার্টের চেহারাটা দেখ। একেবারে হলিউডের হিরো।

রহমান—হবে না কেন? মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ঘি ঠেসে খাচ্ছে।

রবার্ট—সব শুনতে পাচ্ছি। আমি যে ভাবে স্বাস্থ্য তৈরী করেছি, তোমরা শুনলে অবাক হবে। রোজ ব্যায়াম করি ও সকাল সন্ধ্যে জলখাবারের সঙ্গে প্রটীনা পীনাট বাটার খাই।

রমেশ রহমান—(একসঙ্গে) প্রটীনা পীনাট বাটার? মাছ, মাংস, ডিম দুধ ঘি ও দুধের মাখনের চেয়ে খাদ্যগুণ বেশী আছে?

রবার্ট—অবাক হলে? প্রটীনা পীনাট বাটারে প্রোটীন অনেক বেশী পরিমাণে পাবে। তাছাড়া খনিজ, ভিটামিনস্ ও খাদ্য শক্তিতে ভরপুর। দেরী না করে আজ হতেই খাওয়া শুরু কর। পৃথিবীর সব দেশেই পীনাট বাটারের চাহিদা বেশী। যেমন সুস্বাদু তেমনই পুষ্টিকর।

ভারত কার্ণেলস্ প্রাইভেট লিমিটেড কলকাতা

পূজার বাজারে কটা কথা

পুজো মানেই আনন্দ। বিশেষতঃ দুর্গাপূজো।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সকলের কাছেই কি তাই? দুর্গাপুজোয় সব মানুষই কি আনন্দিত কিংবা খুশী হতে পারে।

উত্তর হলো 'না'। যারা সারা বছর খেতে পায় না, গায়ে রাখার মত জামাটুকু পায় না তাদের কাছে দুর্গা পুজোই বা কি, আর পুজো না হওয়াই বা কি। তবে হ্যাঁ পুজো হলে গরীব লোকেরা অবশ্য অনেক রকমের কাজকর্ম পায়। যেমন প্যাণ্ডেল বানানো, ত্রিপল টাঙ্গানো ইত্যাদি। মৃৎশিল্পীরা পায় প্রতিমা বানানোর ঢালাও অর্ডার দর্জিরা পোষাকের। এমনি নানান রকমের কাজ।

তবে একটা দুর্গা পুজোকে ঘিরে যে ভয়ঙ্কর ব্যয় হয় তা দেখলে কিন্তু অপচয় বলেই মনে হয়। যে দেশে মানুষ খেতে পায় না, পরতে পায় না, সে দেশে একশ্রেণীর লোকের জন্য এই খরচ অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার তো মনে হয় জাঁকজমকের ধাঁচটা পাল্টে ফেলা দরকার। যেমন ধর কোন পুজোয় কত টাকার "লাইট" হলো কিংবা প্যাণ্ডেলের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার না করে আমরা যদি অন্য প্রতিযোগিতায় মন দিই? কোন পাড়ার পুজোয় এবার কত বেশী কাঙালীভোজন হলো। কিংবা বলতে পারো আমাদের পুজো কমিটি থেকে ষষ্ঠীর দিন এতজন বস্তীবাসী শিশুকে পোষাক বা বই দেওয়া হয়েছে। তাহলে কেমন হয়? অথবা কোন পুজা কমিটি কটা গাছ লাগালেন?

আনন্দটা ভাগ করে নেওয়ার কথা কি তোমরা ভাবছো? আর দুটো কথা। দেখো চাঁদা নিয়ে জবরদস্তি করতে নেই। মানুষ নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী খুশী মনে যতটুকু দেয় সেটাই নেওয়া ভালো। দ্বিতীয়তঃ রাস্তা বন্ধ করে প্যাণ্ডেল তৈরী করার কথাটাও ভেবে দেখো। রাস্তায় গর্ত খুঁড়তে 'যদি' হয়ই তাহলেও কিন্তু পুজোর শেষে নিজেদেরই ভালভাবে বুঁজিয়ে দেওয়া কর্তব্য বলে মনে করবে। ভুলে যেও না কিন্তু, বড়দেরও মনে করিয়ে দিও।

(জনসংযোগ বিভাগ. সি, এম, ডি, এ, ৩-এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত)

বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম

- ২৩ মিটার (৭৬ ফুট) ব্যাসবিশিষ্ট এই প্ল্যানেটেরিয়ামটি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম।
- প্রতিষ্ঠানটির উনিশ বছর পূর্ণ হল। এই সময়ের মধ্যে প্রায় ৮১ লক্ষ শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধি ও চিত্তবিনোদন করেছে।
- প্রতিদিনই খোলা। রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন অতিরিক্ত প্রদর্শনী থাকে। ধারা-বিবরণী দেওয়া হয় বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজিতে।
- এখানে স্থাপিত দুটি তৌলযন্ত্রের সাহায্যে বৃহস্পতিতে গেলে ওজন বেড়ে, আর চাঁদে গেলে ওজন কমে কি দাঁড়াবে তা জানা যায়।

৯৬, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা - ৭০০০৭১

(ফোন : ৪৪-১৫৫৪)

34
বছরের স্বাধীনতা

সাফল্য ও সম্ভাবনা

☐ আমরা এক আধুনিক স্বনির্ভর অর্থনীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছি

☐ খাদ্যে আমরা স্বনির্ভর হয়েছি শিল্প ক্ষেত্র বহুমুখী ও ব্যাপক করেছি এবং বিজ্ঞান ও প্রয়োগ বিদ্যায় লক্ষ্যণীয় প্রগতি করেছি

1985-এর মধ্যে

আমরা সমগ্র জনসংখ্যার আরও এক ষষ্ঠাংশকে দারিদ্র্য-সীমার ওপরে তুলতে চাই এবং সমস্যা পীড়িত সব গ্রামে পানীয় জল সরবরাহ করতে চাই

2000 খৃষ্টাব্দের মধ্যে

কুষ্ঠ ব্যাধি নির্মূল করা এবং জন্মের হার হাজারে 36 থেকে কমিয়ে 21-এ আনা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য।

"নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘ রাত্রি রব জাগি দীপ নিভিবে না—"

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

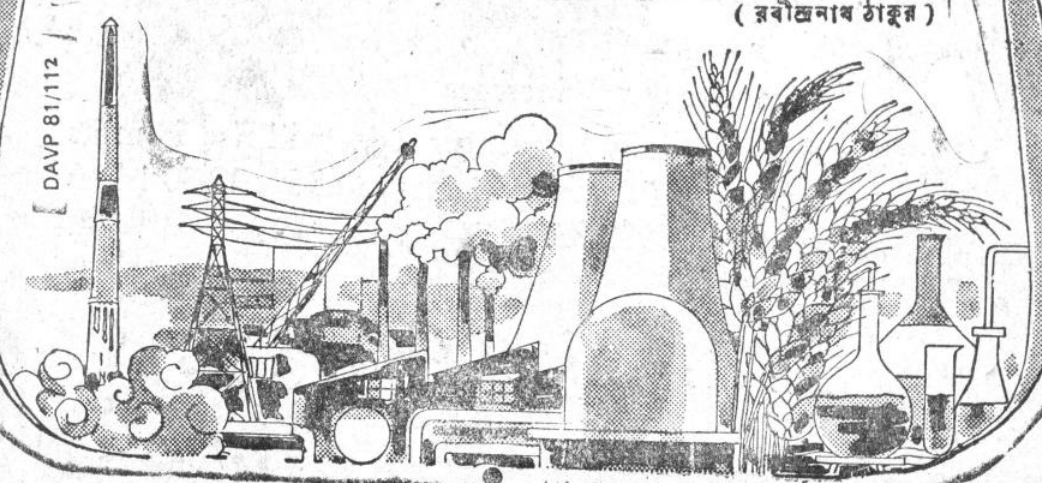

DAVP 81/112

FOR BETTER TRANSPORT SYSTEM

By the end of 1983 the Undertaking of The Calcutta Tramways Company with assistance from the World Bank proposes to :—

Purchase 75 new tramcars

Rebuild 60 of the older cars by processing new sets of trucks, frames, etc.

Take up special renovation of 105 tramcars

Renew part of track system

Modernise the Nonapuker Workshop

Renew part of the overhead and cable system

Upgrade six existing substations and establish two new substations

Upgrade seven existing depots and terminals.

Modernise CTC communication, lighting and illumination system.

As a result—

a) Tram frequency will increase

b) Number of daily passenger trips will rise from its present level of about 7.5 lakhs to about 12.30 lakhs at the end of 1982-83.

In the Service of the People

CALCUTTA TRAMWAYS

নিউস্ক্রিপ্টের ছোটদের বই

হাওয়া, মাটি, হল্লা—প্রণব মুখোপাধ্যায় — ৬.৫০

আশ্চর্য সুন্দর আর মজার সরস কবিতার বই। পাতায় পাতায় ছবি, ছত্রে ছত্রে মজা

সত্যজিৎ রায়ের দুটি অসাধারণ বই

একেই বলে শুটিং দ্বিতীয় মুদ্রণ ১০.০০

ফিল্‌ম তোলার সময়কার দারুন মজাদার সব ঘটনা আর অনেক ছবি
ছোট বড় সবার ভাল লাগবে। শিশু-সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক পুরস্কৃত

প্রোফেসর শঙ্কু সপ্তম মুদ্রণ ১২.০০

একাডেমি পুরস্কার পাওয়া এক আশ্চর্য বই

উপন্যাস ও গল্প

লীলা মজুমদার—মাকু ৪.৫০
—হাস্য ও রহস্যের গল্প (২য় খণ্ড) ৫.০০

পুণ্যলতা চক্রবর্তী—ছোট্ট ছোট্ট গল্প

ভ্রমণ কাহিনী

সবিতা ঘোষ
—পূব হতে কোন পশ্চিমে ৪.০০
(শিশু সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক পুরস্কৃত)

জীবনী ও স্মৃতিকথা

পুণ্যলতা চক্রবর্তী—ছেলেবেলার দিনগুলি ৮.০০

বিখ্যাত বিদেশী কিশোর সাহিত্যের অনুবাদ

লুইসা আলকট—লিটল উইমেন
কিশোরী কন্যা
অনুবাদিকা—বাণী রায়— ৮.০০

জুলভের্ণ দি মিষ্টিরিয়াস আইল্যাণ্ড
আশ্চর্য দ্বীপ
অনুবাদক কুলদারঞ্জন রায়— ৭.০০

স্যার আর্থার কন্যনডয়েল, ম্যারাকট ডীপ
অনুবাদক
জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ার্দার— ৬.০০

সন্দেশের গ্রাহকেরো নিউস্ক্রিপ্ট থেকে বই কিন্‌লে বিশেষ কমিশন পাবে।
জোড়া পোস্টকার্ড লিখে খবর জেনে নাও।

নিউস্ক্রিপ্টের দোকান
এ-১৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭

সন্দেশ কার্যালয়
১৭২/৩, রাসবিহারী এভ্যিনু
কলিকাতা-২৯

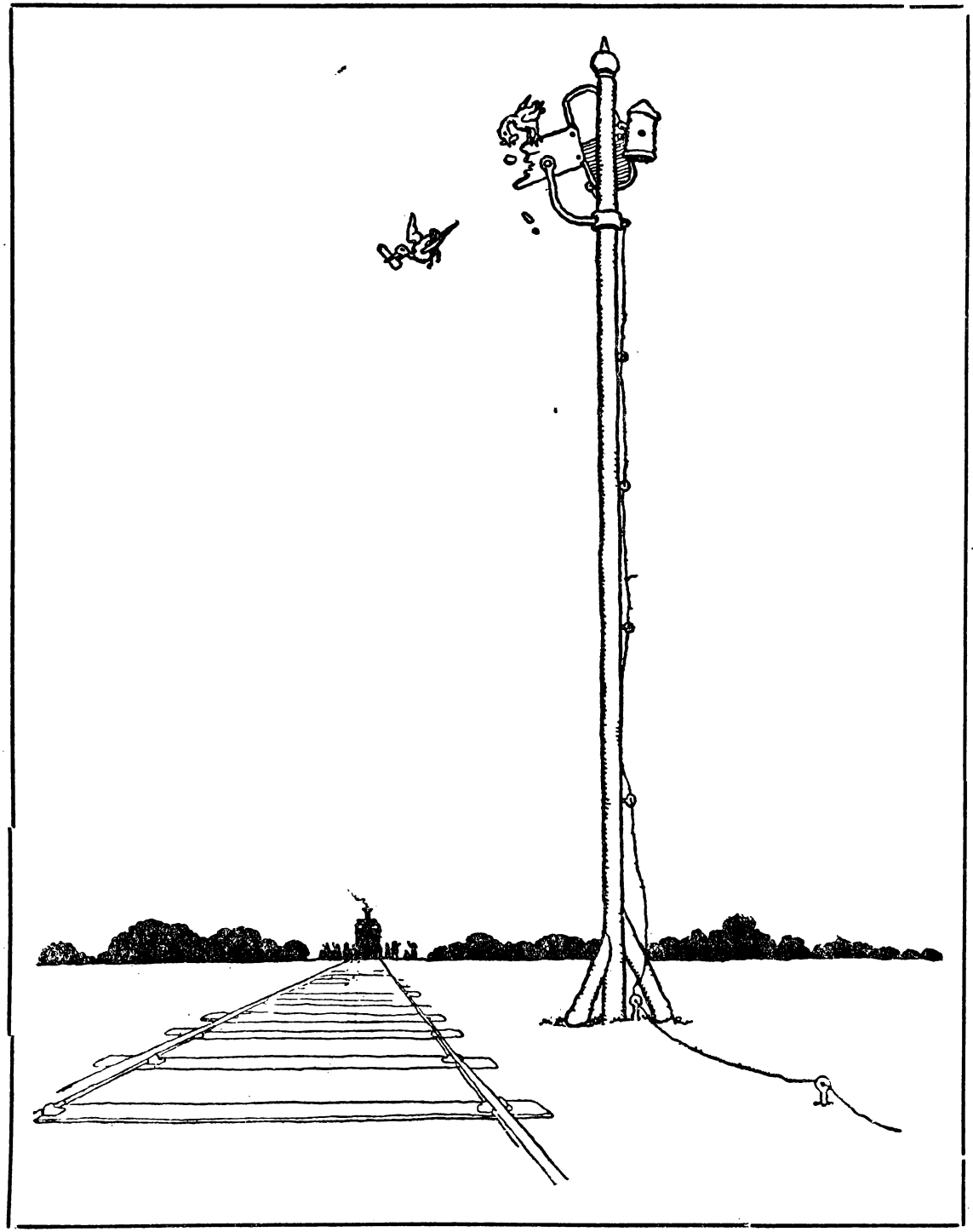

বড় মুশকিল—রেলগাড়ি যাবে বাগডোগরা,
সিগন্যালটার দফারফা করে কাঠঠোকরা।

ভাদ্র-আশ্বিন—১৩৮৮ সন্দেশ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৮১

বাংলার শরৎ

সুলতা সেনগুপ্ত

বর্ষা শেষে ভাদ্র মাসে—
শরৎ আসে শরৎ আসে
মিষ্টি মেয়ের হাসির মতো
সোনালী রোদ গড়ায় ঘাসে।
ঢেউ খেলানো নদীর জলে
টলমলিয়ে নৌকো চলে
'বদর' বোলে সেলাম করে
নায়ের মাঝি বৈঠা ধরে।
গুণ টেনে যায় শক্ত হাত
নইলে পথেই নামবে রাত।
বাপের বাড়ির ঘাটের পাশে
ঘোমটা তুলে বৌটি হাসে,
হ'ক বা না হ'ক নৌকো বাঁধা
ভিজুক শাড়ি, লাগুক কাদা
ওদের কথায় কী যায় আসে?
কন্যাটি নয় ভয় তরাসে
ডাঙ্গায় জলে শরৎ আসে।
দল বেঁধে মেঘ নীল আকাশে
রূপ-রূপোলী ছড়িয়ে ভাসে
কুমুদ, কমল বিলে-ঝিলে
চোখ চেয়ে কয় 'কোথায় ছিলে—
তোমরা ও ভাই কাশের ফুল?'

কাশ হেসে কয় উড়িয়ে চুল,
'ঘুমিয়ে ছিলাম তোমার পাশে
হঠাৎ দেখি শরৎ আসে।
শিউলি ঝরার শব্দে জাগি
পদ্ম বনের সুবাস মাগি
তোমরা সাজাও পূজোর ডালা
দেবীর গলায় পরাও মালা
কেউ আমাদের নেয় না তুলে
উল্লাসে তাই হাওয়ায় ভাসি
সময় হলেই আমরা আসি—
খবর পলাম বাও-বাতাসে
শরৎ আসে-শরৎ আসে।'

* * *

গাছ গাছালির পাতার ফাঁকে
পাখ পাখালী জাগতে থাকে
ঘুম ভেঙে যায় ওদের গানে
পথের পথিক মনকে টানে
প্রবাসী চায় ফিরতে ঘরে
নিবাসী যায় দেশান্তরে
তোমার ছুটি, আমার ছুটি
ছুটির আসা ক্লান্তি নাশে
পথের আলো কে জ্বালালো
বাইরে দূরে নীল আকাশে?
উদাস করা শরৎ আসে

তিনটে তামার পয়সা

মীরা বালসুব্রমনিয়ম

অনেক দিন আগেকার কথা। চীন দেশে একটি অল্প বয়সী ছেলে তামাক বিক্রি করে দিন গুজরান করতো। ছেলেটির নাম ছিল চাং। ওর বাপ দাদাও এই তামাক বিক্রি করেই দিন কাটিয়েছে। চাংএর কিন্তু ইচ্ছে ছিল একটা ছোট্ট দোকান করে—যাতে নতুন ও পুরোনো সৌখিন জিনিসপত্র বিক্রি হবে। কিন্তু দোকান করতে হলে গোড়াতেই চাই কিছু টাকা। তামাক বিক্রি করে বেচারা চাংএর দিন চালানোই ছিল কষ্টকর, কিছু টাকা জমানো তো দূরের কথা। তাই কাঁধে একটা ঝোলা নিয়ে তাতে তামাক ভর্তি করে সারাদিন বাজারে গঞ্জে হেঁটে বেড়াতো আর হাঁক পাড়ত,—'তামাক চাই—তামাক।'

এক সকালে রোজকার মত চাং তামাক নিয়ে বাজারে বেরিয়েছে। সেদিন ছিল হাটবার—তাই বাজারে ভীষণ ভিড়। চাংএর কিন্তু সেদিন বিক্রি খুব খারাপ—কেন না ওর মত আরো ক'জন তামাক ওলাও তামাক বিক্রি করতে চেষ্টা করছিল। বেলা অনেক গড়িয়ে গেল। 'তামাক চাই, তামাক'—বলে চিৎকার করে চাং প্রায় গলা ফাটিয়ে ফেলেছে কিন্তু ওর ঝোলার যেমনকার তামাক প্রায় তেমনি রয়ে গেছে।

বিক্রির আশা যখন ও প্রায় ছেড়ে দিয়েছে তখনই হঠাৎ ওর কাঁধে একজন ছোট্ট টোকা দিয়ে বলল 'ওহে তামাক ওলা আমার এই পাইপটায় একটুখানি তামাক দিতে পার?'

চাং ফিরে দেখলো ছেঁড়া পোষাক পরা এক বুড়ো দাঁড়িয়ে।

'নিশ্চয়—নিশ্চয়—।' চাং ওর ঝোলাটা কাঁধ থেকে নামাল আর ভাবল—যাক্ একেবারে খালি হাতে বাড়ি যেতে হবে না।

ঝোলাটা নামাতে, বুড়োটি বলল,—'আমি নিয়ে নিচ্ছি পাইপ ভর্তি করে। আর এই নাও, দাম হিসেবে তিন পয়সা দিচ্ছি।'

চাং তো মহা খুশি। ও ভাবল একটা পাইপে কতটুকুই বা তামাক ধরবে। তার বদলে তিন পয়সা। অবশ্য এখানে বলে রাখা ভালো যে তখনকার চীন দেশের পয়সাগুলো তামার হলেও ছিল প্রায় আমাদের টাকার মত বড় আর তা দিয়ে অনেক জিনিস কেনা যেতো।

চাংএর আনন্দ কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হলনা। কারণ বুড়োটা ওর পাইপে টিপে টিপে তামাক

ভর্তি করেই চলেছে—অথচ পাইপটা ভর্তি হবার নাম নেই। দেখতে দেখতে চাংএর ঝোলা অর্ধেক খালি হয়ে গেল। চাং বলে উঠল—'কি অত তামাক নিচ্ছ যে?'

বুড়োটা হেসে বলল—'সে কি! কথা হল না, তিন পয়সার বদলে পাইপ ভর্তি করে তামাক নেব, কথা রাখবো নাকি?'

চাং আর কি করে। কথাতো হয়েই ছিল, তা অস্বীকার করা যায় না। তার ওপর বুড়ো মানুষ। তার কথার ওপর কথা বলেই বা কি করে।

এদিকে বুড়ো তামাক নিয়েই চলেছে। ক্রমে চাং এর ঝোলা খালি হয়ে গেল—আর ঠিক তখনই বুড়োর পাইপটাও তামাকে ভর্তি হয়ে গেল। তিনটে পয়সা চাংএর হাতে দিয়ে ভিড়ে মিশে গেল বুড়োটা।

খালি ঝোলাটায় পয়সা তিনটে ফেলে ঝোলা পিঠে নিয়ে চাং বাড়ির পথ ধরল। বেলা অনেক হয়েছিল আর ওর খিদেও পেয়েছিল খুব। তার ওপর এত খানি তামাকের বদলে পেল মাত্র তিনটি পয়সা। 'আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম কে জানে,—দিনটা এত খারাপ গেল—' বিড় বিড় করে নিজের মনেই বকতে লাগল চাং।

কিন্তু অল্পক্ষণ পরই ওর মনে হতে লাগলো যে ওর কাঁধের ঝোলাটা যেন ভারি হয়ে উঠছে। কিন্তু তা কি করে হবে— আছে তো তাতে মাত্র তিনটে পয়সা। বোধ হয় খিদের জন্য খালি ঝোলাটাকেই ভারি মনে হচ্ছে।'

আরো কিছুক্ষণ হাঁটার পর খালি ঝোলাটা যেন আরো ভারি মনে হতে লাগলো—কিছুক্ষণ পর আরো ভারি। চাং এবার বেশ ভয় পেয়ে গেল। তারপর ভাবল—'দেখাই যাক না, কি ব্যাপার।'

ঝোলাটা খুলে তো ওর চোখ ছানাবড়া। শুধু তিনটে পয়সা কেন, ঝোলাটা তামার পয়সায় প্রায় অর্ধেক ভর্তি হয়ে এসেছে। ওর চোখের সামনেই ঝোলাটার পয়সা আরো বাড়তে লাগল।

চাং অমন দু'হাতে ভারি ঝোলাটা ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ির দিকে চলল। বাড়ির দরজায় এসে যখন ও পৌঁছল তখন ঝোলা থেকে পয়সা প্রায় উপচে পড়ার যোগাড়!

বাড়ি এসে পয়সাগুলো পয়সার বাক্সে ভরে এক গ্লাস জল খেয়ে নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে এই আশ্চর্য ব্যাপারটার কথা ভাবতে লাগল চাং। খানিকক্ষণ পর ঘর থেকে টুং টাং শব্দ হতে ও ফিরে দেখে বাক্স ভর্তি হয়ে উপচে মেজেতে গড়াগড়ি যাচ্ছে পয়সা।

ও তখন ঘরের কোন থেকে মাটির দুটো বড় জালা বার করে আনল। ওর বাপ ঠাকুর্দার আমলে এগুলিতে ধান চাল জমিয়ে রাখা হত। জালাগুলোতে বাড়তি পয়সাগুলো ঢাললো চাং। কিন্তু ততক্ষণে ও বুঝে গেছে যে শীগগীরই এই জালাদুটো পয়সায় ভর্তি হয়ে যাবে।

চাং তখন খরচের দিকে মন দিল। বেরিয়ে অনেক খাবার দাবার কিনল—কিনল ভালো জামা কাপড়। তাতে অনেকগুলো পয়সা খরচ হোল বটে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই খরচ হওয়া পয়সাগুলো আবার ফিরে এল চাং এর বাক্সে।

চাং এরপর কি করল জানো? ওর অনেক দিনের সাধ ছিল না একটা ছোট্ট দোকান করা, বাজারের মধ্যে একখানা ছোট্ট দোকান কিনে ফেলল ও। দোকানটায় নানা সৌখীন জিনিস রাখলো ও। মাঝে মাঝে পুরনো ফুলদানী, কাজ করা কাঠের বাক্স—এসব জিনিসও কিনত চাং—কারণ অনেক বড়লোকেরই পুরনো জিনিস সংগ্রহ করার শখ থাকে।

ক্রমে চাং এর দোকানের নামডাক চারদিকে ছড়িয়ে গেল। দোকান থেকে লাভও হোতো বেশ। তাছাড়া চাংএর সেই পয়সার বাক্স তো ছিলই। দিনগুলো ওর সুখেই কাটছিল—যদিও বাক্সের উপচে ওঠা পয়সাগুলো খরচ করার জন্যে নিত্য নতুন উপায় ভাবতে হত। আর ভালো মানুষ চাংএর পক্ষে পয়সা খরচের নিত্য নূতন উপায় বের করা বেশ মুস্কিল হত।

বেশ কিছুদিন এভাবে কাটার পর একদিন চাং দোকানে বসে আছে এমন সময় এক বুড়ো এসে বলল ও কিছু পুরোনো জিনিস বিক্রি করতে চায়। চাং কি কিনবে?

'দেখি কি জিনিস?' চাং জিজ্ঞেস করল।

বুড়ো ওর পোঁটলা খুলে দেখাল। চাং দেখলো ওতে রয়েছে খান কয়েক ফুলদানী। নেড়ে চেড়ে দেখে চাং বুঝলো যে ওগুলো বেশ দামী। তাছাড়া জিনিসগুলো দেখতেও সুন্দর। 'কত দাম চান

এগুলোর জন্যে ?' জিজ্ঞেস করল চাং।

'তিনটে তামার পয়সা।'

চাং একটু অবাক হল। ভাবল বুড়োটার কি মাথা খারাপ ? নয়তো অত দামী জিনিস কি কেউ মাত্র তিন পয়সায় দেয় ? কিন্তু ওর জিনিস ও যদি শস্তায় দেয় তবে চাং এর কেন মাথা ব্যথা হবে ? চাং বলল—'ঠিক আছে, কিনব আমি জিনিসগুলো।'

চাংএর পয়সার বাক্সটা দিনের বেলা থাকত দোকানেই। বাক্সটা খুলে তিনটে তামার পয়সা বার করে বুড়োকে দিল চাং।

বুড়োর জিনিসগুলো ছিল সত্যিই ভালো। বিকেলের মধ্যেই চাং ওগুলো বিক্রি করে ফেলল। বেশ মোটা লাভেই।

কিন্তু সেদিন থেকেই চাং এর পয়সার বাক্সে পয়সা বেড়ে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। চাং তখন বুঝতে পারল যে সেই আগের বুড়োটাই ছদ্মবেশে এসে ওর পয়সা তিনটে ফেরত নিয়ে গেছে। চাং এর অবশ্য মনটা একটু খারাপ হল। কিন্তু বেশি নয়। কারণ যাদু পয়সার দৌলতে চাংএর বেশ টাকা পয়সা হয়েছে। তাছাড়া ওভাবে বেড়ে যাওয়া পয়সা রোজ রোজ খরচ করাও একটা সমস্যা বৈকি !

প্রজাপতি

আভা রায়

প্রজাপতি হঠাৎ কেন চমকে গেলি
একটু আগে দেখছিলাম ওই জানলা দিয়ে
ডানা দুটি কাঁপছিল তোর থরথরিয়ে
উড়ছিলি তুই পাখায় নাচের ছন্দ নিয়ে
কি হল তোর কি দেখে তুই চমকে গেলি ?
শরৎ এল সাদা মেঘের পাল উড়িয়ে
বনে বনে শিউলি ফুলের বাস ছড়িয়ে
ছুটির নেশায় দিল সবার মন ভরিয়ে
সেই কথা তুই কেমন করে শুনতে পেলি ?
প্রজাপতি হঠাৎ কেন থমকে গেলি ?

লীলা মজুমদার

জায়গাটার নাম বলা বারণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যেমন এখনো ঠিক তেমনি সংকটময় অবস্থান। মালিক বদ্‌লায়, জায়গা বদলায় না। এইটুকু বলি যে ভারতের উত্তর-পূর্ব কোণের নাকের ডগা। দুদিকে ভারত, একদিকে বাংলাদেশ, এক দিকে বর্মা। চারদিকে পাহাড়। সেই সব পাহাড়ের চাইতে উঁচু এই পাহাড়। ঠিক যেন ঝাণ্ডা তুলে বলছে এই দেখ, এইখানে আমি! কি করতে পার, কর!

চমৎকার জায়গা। যেমনি অবস্থান, তেমনি আবহাওয়া। মশা নেই, মাছি নেই, আরশুলো নেই। তবে হ্যাঁ, সাপ আছে, শুঁয়োপোকা আছে; গুবরে পোকা মাকড়সা মৌমাছি বোলতা, বনের গহনে ছোট মেটে রঙের ভালুক, বুনো কুকুর যারা নেকড়ের মতো হিংস্র, প্রকাণ্ড বাদুড়, প্যাঁচা, অজস্র পাখি—এ সমস্তই আছে। প্রকৃতির লীলা-ভূমিতে এরা থাকবে না-ই বা কেন? মানুষই বরং পরে এসেছে।

বন-সম্পদের তুলনা হয় না। ঝাউ, সরল, তুঁতফল, বাঁশঝাড়। গাছের ডালে অর্কিড ঝোলে। সেকালে সায়েবরা বিলিতী ফলের গাছ পুঁতেছিল—আপেল, পীচ, এপ্রিকট, ন্যাসপাতি। আরো নিচে আনারস, বাতাবি। তাছাড়া বাজারে বিদেশী জিনিস উপচে পড়ছে, খোদ্দেরে গমগম করছে। বে-আইনী ছাড়া আবার কি! বলিনি স্রেফ নন্দনকানন। অসীমের বড়মামা হলেন বন-বিভাগের কর্তা। ঐখানে সর্বেসর্বা। তিনি লিখলেন, 'চলে আয়। স্বর্গের সঙ্গে কোনো তফাৎ নেই। কখনো যাই নি অবিশ্যি সেখানে। আমার কোয়ার্টারটাও একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার, অল্প দিনের মধ্যেই হয়তো স্বর্গীয় হয়ে যাবে। দেখতে চাস্ তো এই বেলা আয়। তাছাড়া চারদিকটা রহস্যে গজ্‌গজ্ করছে। নেহাৎ আমার সময় নেই। তোর শ্যামরতনদা এলে হাতে চাঁদ পাবেন। তাঁকেও আলাদা লিখছি। মোট কথা দুজনে চলে আয়। ইতি। বড়মামা। পুঃ ছোড়দিকে বলে আমার জন্য আমসত্ত্ব আনিস্। ঐটে পাইনে।'

কাজেই চলে গেল অসীম। একাই গেল। প্রায় ষোল বছর বয়স, ইলেভেনে পড়ে, যাবে না ই বা কেন? শ্যাম-রতনদাদের বাড়ি রং হচ্ছিল। বললেন পরে যাবেন। অসীমের যদি সত্যি ভূ-বিদ্যায় আগ্রহ থাকে তাহলে এমন সুযোগ ছাড়ে না যেন। নাকি প্লেনে গেলে সুবিধা হত। সুবিধার সঙ্গে অসীমের কী? সুবিধার বড্ড খরচ। খানিকটা রেলে; পাহাড়ে পথে বাসে, তাই বা মন্দ কি।

বেশ দেশ দেখতে দেখতে যাওয়া গেল। পথটা খুব ভালো ছিল না, দেড় ঘণ্টা লেট হল। বড়মামা বাস আপিসে জীপ নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। ঐ বাসেই ওঁদের কিছু ওষুধ পত্রও এল।

ঐ জীপে করে পাহাড়ের আরো খানিকটা ওঠা গেল। বন-বিভাগের ঘর-বাড়িগুলো সংরক্ষিত বনের গা ঘেঁষে। সব কিছুর কেমন বিদেশী চেহারা। বড়মামা বিয়ে-থা করেন নি। বিধবা বড়মাসিই বাড়ির গিন্নি। বেশ রেগে ছিলেন। বোধ হয় লেট দেখে ভাবনা হচ্ছিল। অসীম প্রণাম করতেই, চুক করে একটু আদর করে বললেন, 'তাও ভালো। ভাবলাম আরো দু-জন বুঝি নিখোঁজ হল।' অসীমের দু-কান খাড়া। বড়মামা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আঃ, দিদি! কি যে বাজে বক! ছেলেটা রেলেও বিশেষ খাবার-দাবার পায়নি।'

আর বলতে হল না। সঙ্গে সঙ্গে মাঝের ঘরের গোল টেবিলে ভুনি খিচুড়ি, আলু মটরের চচ্চড়ি, বুনো হাঁস ভাজা আর শেষে বড় বাটি করে খোবানি দেওয়া ক্ষীর! বড় মাসি বললেন, 'এই মগের মুলুকের একটা সুবিধা হল সারা বছর শীতের তরকারি পাওয়া যায়।'

খেয়ে দেয়ে উঠতেই পশ্চিমের পাহাড়ের পেছনে সূর্য নেমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার। বড় মামা চিঠিপত্র নিয়ে বসলেন। অসীম সোয়েটার গায়ে দিয়ে ঘুরঘুর করে বাংলোটা দেখতে লাগল। এ ধরনের বাড়ির কথা আগেও শুনেছিল। একতলাটা দোতলার সমান উঁচুতে, বড় বড় গাছের গুঁড়ির ওপর বসানো। এমনি পাকা কাঠ যে শক্ত পাথর. সহজে পেরেক ঢোকে না। চারদিকে জালে ঘেরা চওড়া বারান্দা। নিচের থেকে মজবুত কাঠের সিঁড়ি ঐ বারান্দায় উঠে এসেছে। সেটাকে আবার কপি-কলের সাহায্যে ভাঁজ করে তুলে ফেলা যায়। ইন্টারেস্টিং। বারান্দায় পড়ার টেবিলে বসা বড়মামা শীতের চোটে উঠে পড়লেন। বললেন, 'সেকালে বুনো জানোয়ারের উপদ্রব ছিল, তাই এই ব্যবস্থা। নিচে সায়েবদের টবের ফুলের সংগ্রহ দেখিস কাল সকালে। টবে স্ট্রবেরি করেছিল। মাশরুম্ করেছিল। এখনো হয়। যাই বলিস্ ব্যাটাদের গুণ ছিল। টিনের চালের তলা থেকে ঐ যে সারি সারি অর্কিড ঝুলছে, ওগুলোর বয়স কম করে পঞ্চাশ বছর! লং ডে হয়েছে তোর, এবার শুয়ে পড়া যাক। জানলায় জাল লাগানো, কাজেই বাদুড় ঢুকবে না। তবু বালিশের নিচে টর্চ রাখিস্।'

ব্যস্, এক ঘুমে রাত কাবার। চওড়া বারান্দায় পুবের রোদ। বড়মামা ব্রেকফাস্ট করতে বসেছেন ভুট্টার পরিজ, ঘন লালচে দুধ, বিচি-ওয়ালা মিষ্টি কলা, টোস্ট, মাখন, ডিম সিদ্ধ, মাসির হাতের জ্যাম, বড়মামা বললেন, 'বোস্, খা। সারা রাতের না-খাওয়ার পর, সকালে এই সব পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হয়। সকালে খাটবি। দুপুরে বড়দির ঘণ্ট চচ্চড়ি – সেগুলোও নট ব্যাড, এই আমি বলে দিচ্ছি—বিকেলে স্রেফ্ এক পেয়ালা চা, রাতে আলি ডিনার। তাহলে ৪৭ বছর বয়সেও আমার মতো ইয়ং থাকবি!' এই বলে সত্যি সত্যি নিজের বুকে গুমগুম করে দুটো কিল বসিয়ে দিলেন।

কাজে যাবার আগে বলে গেলেন, 'সকালে বাড়ির চারদিকটা ঘুরে ঘারে দেখিস্। লাঞ্চের পর সংরক্ষিত বনে নিয়ে যাব। আমার টোবি কুকুরটাকে সঙ্গে নিস্, পথ হারালে খুঁজে দেবে।' এই বলে একটা টাট্টু ঘোড়া চেপে পাহাড়ে পথ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দুজন লোক সঙ্গে গেল।

বড়মামা চোখের আড়াল হলেই, মাসি বললেন, 'তাই বলে শেণ্টারের দিকে যাস্ না যেন।' অসীম অবাক হল, 'শেণ্টার? সে আবার কি, বড়মাসি? মামু তো কিছু বললেন না।' 'তা বলবে কেন শুনি? বললেই তো সেখানে ছুটবি। যার কথা জানে না, তাকে তো আর কেউ দেখতে যায় না। কম নাকি ঐ ছেলে! কিন্তু আমিও বলি যাস্ নে বাপু।'

'সব জিনিস দেখা ভালো। যাব না-ই বা কেন?' 'আরে সাপ খোপ। তার চেয়েও খারাপ জিনিস। তাছাড়া পথ-ও চিনিস্ না। কেউ যায়-ও না ওদিকে। একা তো নয় ই।'

'একা তো যাচ্ছি না, টোবি সঙ্গে যাচ্ছে।' মাসি

চটে গেলেন, 'পুরুষমানুষদের ভালো কথা বলা কেন! যা খুশি কর গে যা। খালি, মোজা পায়ে দিস্ আর ঐ সেঁপো লাঠিটা নিস্।'

সেঁপো-লাঠিটা কোনো মজবুত লতার শেকড় দিয়ে তৈরি মনে হল। মুণ্ডুটা অসম্ভব সাপের মতো দেখতে। ওটা নেওয়া মন্দ হবে না। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নিচে আসতেই দেখে লালবেহারী চৌকিদার ঝাঁকড়া চুল লামা টেরিয়ার টোবিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকেও বড়মাসি কিছু বলে থাকবেন।

টোবির বকলস থেকে চেন খুলে অসীমের হাতে দিয়ে লালবেহারী বলল, 'একতলার টবের বাগান, অর্কিড, সামনের বাগানের বিলিতী ফুলগাছ দেখে যান। গোড়ায় সায়েবরা লাগিয়েছিল। বছরে বছরে তার বিচি থেকে মালি নতুন চারা তোলে। ঐ মালিকেও সায়েবরা ট্রেনিং দিয়ে গেছে। তখন গাছে জল দেনে-ওয়ালা ছোকরা ছিল। এখন গোঁপ পেকেছে। তবে ফুল বাগানে কারো ঘোরা পছন্দ করে না।'

বাস্তবিকই তাই। মাথায় সাড়ে চার ফুট, পাকা দড়ির মতো চেহারা মালির। বাগান থেকে অসীমকে নড়াতে পারলে বাঁচে। ওরি মতো চেহারা আরেকটা লোক-ও ছিল। সে বলল, 'এখানে কেন? যাও না ওপরে শেল্টার দেখে এসো। জব্বর জিনিস। ঐখানে সায়েবরা শেষ ঘাঁটি করেছিল। সবাই বলত নেতাজি পল্টন নিয়ে এই এল বলে! বোমা পড়বে। সব তচনচ হবে। সায়েবরা তখন জিনিসপত্র নিয়ে ঐ শেলটারে গিয়ে উঠল।'

অসীমের বেজায় কৌতূহল, 'গেছ নাকি তোমরাও ওখানে? বল না কি ব্যাপার।' বুড়ো তো তাই চায়। তড়বড় করে এগিয়ে এসে বলল, 'চল তোমায় এগিয়ে দিই। যাইনি আবার ওখানে! দিনে চল্লিশ বার যাওয়া-আসা করে জান বেরিয়ে যেত। ঘড়ি ঘড়ি বোতল লাও, সোডা লাও, মুরগি রোস্ট লাও। ক্লাস সিক্স অবধি পড়েছিলাম তো, ইংজিরি সরগড় ছিল। আমাকেই সব বলত। হরকু মালির পিঠে জিনিস চাপিয়ে নিয়ে আসতাম।'

'তুমি এখানে কি করতে? পল্টনে ছিলে নাকি?' মংলু লোকটার কি হাসি। 'আমি লিখতে পড়তে জানি, আমি পল্টনে যাব কেন। তাছাড়া ঐ গোলাগুলির মধ্যে যেতে লামা মানাও করেছিলেন। আমি এখানে মসদ জোগাতাম। নিচে বাবার দোকান ছিল। হিসাব-ও রাখতাম। এখনো পেন্‌শন পাই মিলিংটারি থেকে। নিচে দোকানদারিও করি। কিন্তু কথা বলবার লোক পাই না, তাই ওপরে আসি। আরো উঠবে নাকি?'

অসীম অবাক হল। 'সে কি! শেল্টারে যাব না আমরা?' বুড়ো থমকে দাঁড়াল, 'ও বাবা! আমি যাচ্ছিনে, আমার পায়ে গুপো আছে। শেল্টারে দেখবার আছেই বা কি? পাহাড়ের গায়ে একটা গুহা। তার ধারে ধারে পাথর কেটে তাক করা। লোহার কড়ি-বর্গা দিয়ে ছাদে ঠেকো দেওয়া। এই যে খুদে নালাটা দেখছ, ওটাও ঐখান থেকে উঠেছে। ঝোপে-ঝাড়ে গুহার মুখ এমনি আড়াল করা যে উড়োজাহাজ থেকেও কিচ্ছু মালুম দেয়, না।

'সবার কি ভয়! ঐ নেতাজি আসছে! লক্ষ লক্ষ জাপানী আর বন্দুক বোমা নিয়ে! ওপরে উড়োজাহাজ, ড্যাঙায় সেপাই আর স্নাইপার। ওরা জাদু জানত তা জান? বনের মধ্যে একবার ঢুকলে বেমালুম নিখোঁজ হয়ে যেত। এখানকার গ্রামবাসীরা সবাই ওদের দলে ছিল। নানাভাবে সংকেত, দিত।'

অসীম বলল, 'কি করে? দাঁড়াও, একটু টুকে নিই।'

মংলু বিগড়ে গেল, 'কিছু টুকেছ তো এই আমি চললাম। ও-সব চালাকি আমার জানা আছে। আমি কিছু সায়েবদের মিলিংটারি গোপন কথা বলিনি, বাবু।'

অসীম বলল, 'অত ভয় কিসের? ও-সব ১৯৪৭ সালে চুকেবুকে গেছে। এখন আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে, আমাদের নিজেদের মিলিটারি, নেতাজির নামে পথঘাট হয়েছে, ওঁর মূর্তি আছে নানা জায়গায়—এখন সায়েবদের সে মিলিংটারি আর নেই।'

মংলু বলল, 'শুনেছি। হতেও পারে তাই। সায়েবরা তো আর আসে না এদিকে। জিনিসপত্রের দামও বড্ড বেশি। মোট কথা আমি আর ওপরে যাচ্ছি না। তুমিও

যেও না। কেউ যায় না! জায়গাটা খারাপ!' এই বলে দে দৌড়! খারাপ! এমন ভাল জায়গায় কেউ যায় না?

বাইনকুলার লাগালে একশো কিলোমিটার দেখা যাবে। এইখান থেকে বন শুরু। এটা বড়মামার সংরক্ষিত বন নয়। সেটা অনেক নিচে। আসবার সময় জীপে তার মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে। অদ্ভুত সুন্দর। নানা জন্তু দেখা যায়। দেখেনি ওরা কিছু, অবিশ্যি।

তবে কি যাবে না একা একা? একা মোটেই নয়। টোবি ছুটতে ছুটতে বনের মধ্যে ঢুকে গেল। অগত্যা অসীমও চলল। গাছে ছাওয়া পথ, নিচের মাটি স্যাঁৎ-সেঁতে। গাছের গায়ে বুড়োদের দাড়ির মতো লাইকেন এক-হাত চওড়া আধখানা থালার মতো ব্যাঙের ছাতা। আড়ালে খুদে ঝরণা লাফিয়ে নামছে, সব সময় কানে আসছে একটা ঝরঝর শব্দ। দেখা যাচ্ছে না।

পায়ে চলা পথে আগাছা হয়েছে। কেউ যায় নি এ পথে হয়তো ৪০ বছরের বেশি। খোলাখুলি না বললেও, মনে হয় এদের সব অশরীরীদের ভয়, স্রেফ্ ভূতের ভয়। তা এখানে কেন? এখানে তো আর ঝাঁকে ঝাঁকে নির্দোষ লোকদের কেউ মারে নি যে ছায়া হয়ে ফিরে আসবে! কিন্তু টোবিও একটু রোদ দেখে শুয়ে পড়ল।

শ্যামরতনদা এ রকম কথা শুনলে চটে যান। বলেন, 'তাই যদি বল, কোন জায়গাটাতে ভূত নেই শুনি? ভূত অর্থাৎ মরা মানুষের আত্মা। তাদের শরীরগুলো তো পঞ্চভূতে মিশে যায়, তা সে পোড়াও আর পোঁত আর যাই কর। জান নিশ্চয় বস্তুর এক কণাও নষ্ট হয় না। আগেও যতখানি ছিল, পরেও ততখানিই থাকে। বরং বাড়ে বলতে পার, কারণ মহাকাশ থেকে সারাক্ষণ ঝুরঝুর করে মিহি বস্তুর গুঁড়ো অদৃশ্যভাবে পড়ছে তো পড়ছেই! শরীরের ধ্বংসাবশেষ নষ্ট হয় না আর শরীরটাকে বাঁচিয়ে রাখত যে শক্তি—তাকে আত্মাই বল কি যাই বল—সে ফুরিয়ে যায়!! এ কি একটা কথা হল? থাকবেই তো। চারদিকে গিজগিজ করে থাকবে। হয়তো মিলে গিয়ে একটাই বিরাট আত্মা হয়ে থাকবে। তাই বলে তাকে ভয় পাবি? তুই তাকে না ঘাঁটালে সে কিছু বলেও না, করেও না। তোর সহযোগিতা ছাড়া কিছু, হয় না। খনিজ সম্পদ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করি, এর বেশি জানিনা।

অসীমেরো তাই মনে হয়। এবার সে শেল্টারের ছায়ায় ঢাকা পথ ধরল। থাক পড়ে টোবি। ভূতের ভয় না আর কিছু! স্রেফ কুঁড়েমি! সাবধানে উঠতে হচ্ছিল। পথের ওপর গোলগোল নুড়ি ছড়ানো। পা হড়কাবার ভয়। হয়তো কোনো কালে ছোট ঝরণাটা এই খাতে বইত, তারি নুড়ি। নয়তো মিলিটারি সায়েবরা ইচ্ছা করে ছড়িয়েছিল। যাতে কেউ এলে জানান দেয়। শত্রুরা যদি সত্যিই পাহাড় ভেদ করে বর্মা থেকে এসে হাজির হয়, এই শেল্টারটি হবে সায়েবদের শেষ আশ্রয়। কে জানে এর মুখটা বন্ধ করার কোনো উপায় থাকাও অসম্ভব নয়।

এইসব ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক ভাবে কখন পথের শেষে পৌঁছে গেছে অসীম, নিজেই টের পায়নি। সামনে একটা স্বাভাবিক পাথরের দেয়াল। সেইখানেই পথ শেষ। তা হলে শেল্টারটা কোথায় গেল? অসীম হলে পাথরের দেয়ালের আড়ালে, একটু উঁচুতে ঢুকবার রাস্তা করত। পাথরের খাঁজে দূরে দেখবার জন্য লুক্-আউট্ রাখত। এই কথা ভাবতে ভাবতে ক্যাম্বিসের জুতোপরা পা পাথরের খোঁচ-খাঁচে রেখে অসীম উঠে পড়ল। বেঁচে থাক অযোধ্যা পাহাড়ের ট্রেনিং।

ঐ উঁচু পাথরটা একটা স্বাভাবিক দেয়ালের মতো, ঠিক যা অসীম মনে করেছিল। ওতে ছোট ছোট ফাঁক আছে, অনেক দূরে চোখ যায়। বন্দুকের নলও যায়। ওপরের লতাগাছ একটা ছাদ তৈরি করে রেখেছে। জংগুলে ছাদ। প্রায় চল্লিশ বছরে যতটা হয়। পাথরের আড়ালে শেল্টারের মুখ। দেখলে মনে হবে স্বাভাবিক, সম্ভবতঃ সত্যিই তাই। তবে তার ওপর যে কারিগরি করা হয়েছে, ভেতরে ঢুকতেই সেটা বোঝা গেল। শক্ত পাথর কংক্রিটের থাম্বা দিয়ে ছাদ ঠেকানো। মেঝেটা পাথরের চ্যাপটা চাঁই দিয়ে বাঁধানো, দেয়ালের কাছে জল বেরোবার নালি। ভেতর থেকে বাইরের দিকে ঢালু। বোমা ঠেকাবার ব্যবস্থা, তাই বলা বাহুল্য জানলা নেই। ঢুকবার দরজাতেও লোহার

পাতের গেট বসানো। এখন অবিশ্যি খোলা। সব খালি ভোঁ—ভাঁ করছে।

ভেতর দিকে দরজার মাথায়, পাথরের মাচার মতো। ব্যাল্‌কনিও বলা যায়। তাতে দুটি জানলা কাটা। তার লোহার পাল্লা খোলা। আলো আসছে। অসীম পাথরের গায়ে কাটা সিঁড়ি দিয়ে ব্যালকনিতে উঠে, জানলার কাছে গেল। পাথরের কাটা বসবার জায়গা। পাথরের তাক, পাথরের টেবিলের মতো।

জানলা বেশি উঁচু না। খুব চওড়া। দাঁড়ালে অসীমের মুণ্ডুটা তার ওপরে থাকে, কিছু দেখতে পায় না। পাথরের সীটে বসলে, গুহার সামনের পাথরের দেয়ালের ওপর দিয়ে দূর, দিগন্ত অবধি চোখে পড়ে মাথার ওপরের পাথর একটু ঝুঁকে পড়েছে, তাই জানলাটা বাইরে থেকে চোখে পড়ে না।

এমন চমৎকার কারিগরি দেখে অসীম মুগ্ধ। সাধে আর ইংরেজরা অর্ধেক পৃথিবীর ওপর রাজত্ব করেছে। কি রকম কার্যকরী মাথা ওদের!

হঠাৎ নাকে একটা চেনা সুগন্ধ এল। অসীম চমকে উঠে এদিক ওদিক তাকাল। অন্য জানলার সীটে খাকি শার্ট প্যান্ট পরা কাঁচা-পাকা চুলওয়ালা একটা লোক। বছর ৬৫ বয়স হবে, পাকানো দড়ির মতো মজবুত শরীর। পাটকিলে চোখ, ঠোঁটে মৃদু হাসি। এখানে লোকের আনাগোনা আছে তা হলে। বনবিভাগের এলাকা ছাড়াও অন্য পথ আছে নিশ্চয়। বেশ লাগল মানুষটিকে। বললেন, 'সমস্ত সমতলটা একটা মস্ত খাতার খোলা পাতার মতো। ঐখানে গাঁয়ের লোকেরা সুভাষের জাপানী উড়োজাহাজের ঝাঁককে পথের নিশানা দিত।' 'কেমন করে দিত?' 'সে এক মজা। চারদিকে মিলিটারি। গিজগিজ করছে। তারি মধ্যিখানে কাপড় কেচে ধোপারা একটা তীরের আকারে কাচা কাপড় শুকোতে দিত। যেদিকে ব্রিটিশ সৈন্য গেছে, সেদিকে তীরের ফলা! তবে এই শেল্টারের কথা কেউ জানত না, এ বড় গুহ্য ব্যাপার ছিল। ছাদ অবধি বোমা বারুদ গোলাগুলি ঠাঁই করা থাকত, এ আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

অসীম অবাক হল। তবে হতেও পারে। লোকটির হয়তো তখন ২৫ বছর বয়স ছিল। পাইপে দু-চারটে টান দিয়ে, ভক্‌ভক্‌ করে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'অবিশ্যি এ-ভাবে পারেনি সুভাষ। অন্যভাবে, জিতেছিল। ব্রিটিশ রাজ পাততাড়ি গুটিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। আমাকেও গা-ঢাকা দিতে হয়েছে, সেই ইস্তক।'

অসীম বলল, 'কেন?' লোকটি হাসলেন, 'ওদের নুন খেইছি বিশ্বাসঘাতকতা করতো তো আর পারা যায় না! খবর সরবরাহ করতাম। সবাই জানত খ্যাপা বিশুবাবু ওষুধ বিক্রি করে। লোকের মন ভাঙাবার জন্য মেলা টাকা দিয়েছিলেন স্টিলওয়েল সায়েব। তার নাম শুনেছ বোধ হয়? বীরত্বের আদর্শ ছিলেন। এ-কথা একশোবার বলব। অকালে মরেও গেলেন। বীররা বাঁচে না বেশি দিন। আমারো মাজা ভেঙে গেল। লড়াই শেষ হলে দেখি লক্ষ লক্ষ টাকা আমার হাতে রয়ে গেছে।

অসীম তো হাঁ! 'টাকা? কোথায়?' 'ঐ তো তোমার মাথার ওপর পাথরের ঐ কুলুঙ্গিটার একেবারে ভিতরে। কেউ ওর খোঁজ পায়নি।'

'আপনি নিয়ে নিলেন না কেন? ওর তো দরকার ছিল না।' মানুষটি যেন আকাশ থেকে পড়লেন, 'যুদ্ধে যে জয়ী হয়, এ-সব তার প্রাপ্য। দেশের প্রাপ্য। তা আমাকে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলতে পার, কিন্তু একটু আদর্শবাদীও আছি। খোলা-খুলি মুখ দেখাবার উপায় নেই আমার। তুমি-ই এই কাজটি করে দাও। আছ কোথায়?'

অসীম বড়মামার কথা বলতেই তিনি খুশি হয়ে গেলেন, 'তবে তো ভালো কথা। খ্যাপা বিশুদা বললেই সে আমাকে চিনতে পারবে। বলবে তো?'

অসীম বলল, 'নিশ্চয়।' ভারি ভালো ভদ্রলোক। কোথায় থাকেন, কি খান কিছু জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা হল। কথা দেওয়াতে ভারি নিশ্চিন্ত হলেন। ওকে নিয়ে সমস্ত শেলটারটা ঘুরিয়ে দেখালেন। কোথায় মসজিদ থাকত,

বিছানাপত্র কাপড় চোপড়, ওষুধ, অস্ত্র, সব দেখালেন। শূন্য খাঁ খাঁ করছে। যুদ্ধ থামতেই যত রাজ্যের লুটেরা এসে চেঁচেপুঁছে সব নিয়ে গেছে। কুলুঙ্গির অন্ধকার মুখটা পাথর দিয়ে বন্ধ থাকাতে কারো চোখে পড়ে নি। টাকাগুলো বেঁচে গেছে।

ততক্ষণে বেলা বেড়েছে, অসীমকে যেতে হয়। ওকে গুহার মুখ অবধি এগিয়ে দিলেন ভদ্রলোক! এবার অসীম বলেই ফেলল, 'চলুন আমার সঙ্গে নিচে। মাসিমার রান্না খেলে খুশি হবেন।' মাথা নাড়লেন 'ওর একটা বিহিত না করে আমার ছুটি নেই।' খাকি রুমাল নেড়ে বাই বাই করে দিলেন।

শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও নেমে এল অসীম। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেই যেমনি অবাক, তেমনি খুশি! শ্যামরতনদা বেতের চেয়ারে বসে বড় মামার সঙ্গে গল্প করছেন। তাড়া খেয়ে চানের ঘরে গিয়ে গায়ে মাথায় দু-মগ গরম জল ঢেলে, খাবার টেবিলে অন্যদের সঙ্গে জমায়েত।

বড় মামার আপিসের এক ভদ্রলোক এসেছিলেন।

তাই বুদ্ধি করে খাবার টেবিলে কিছু বলেনি অসীম। লোকটি এতকাল পালিয়ে বেড়িয়েছেন, এখন তাঁর অনিষ্ট করা অসীমের পক্ষে সম্ভব নয়। বড় ভালো লেগেছিল, তা হতে পারেন স্ট্রিল্‌ওয়েলের ভক্ত। কিন্তু খাবার পর, বড় মাসি যখন কাজ সেরে নিজে খাওয়া দাওয়া করতে চলে গেলেন, অসীম মুখে একটু ভাজা-মশলা ফেলে বলল, 'খ্যাপা-বিশুদা বলে একজনের সঙ্গে দেখা হল।' বড় মামার হাত থেকে পান পড়ে গেল।

'কি যা-তা বলছিস্! কোথায় দেখা হল?' তখন অসীম সব কথা খুলে বলল। একটা পিন্ পড়লে শোনা যায়। অসীম আরো বলল, 'উনি চান ঐ টাকা এনে দেশের কোনো কল্যাণ তহবিলে জমা দেওয়া হক। নইলে ওঁর ছুটি নেই।'

বড় মামার মুখে কিছুক্ষণ কথা নেই। 'কিন্তু—কিন্তু উনি তো যুদ্ধের পর থেকেই নিখোঁজ!' 'চিনতে তাহলে?' কাষ্ঠ হাসলেন বড় মামা, 'বাঃ, বিশুকাকাকে চিনব না? বাবার নিজের কাকা, যদিও সমবয়সী। সায়েবদের সঙ্গে ভিড়লেন। দেশের লোক ছি-ছি করত, এ আমার পষ্ট মনে আছে, যদিও তখন নিচের ক্লাসে পড়তাম। আছেন তাহলে এখনো! কি করা যায় বলুন দিখি শ্যামরতনদা?'

শ্যামরতনদা মুচকি হাসলেন, 'করবে আবার কি? চল, দুপুরে কাজকম্ম নেই, এই সময়ে টাকাগুলো নিয়ে আসি। ঐ খ্যাপা বিশুর সঙ্গে আলাপ করলে নিশ্চয় অনেক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী পাওয়া যাবে।'

গেলেন ওঁরা দুজন আর অসীম! বারণ সত্ত্বেও ওখানে গেছিল বলে কেউ অসীমকে বকলেন না। কিন্তু খ্যাপা বিশুর সঙ্গে দেখা হল না। কেউ ছিল না ওখানে। তবে অসীম ছোট একটা সাবল নিয়ে গেছিল। জানালার ওপরে যেখানটা ভদ্রলোক দেখিয়েছিলেন, জোরসে দুটো খোঁচা দিতেই, ঝুরঝুর করে এক রাশি নুড়ি, পাথরের কুচি, ভাঙা সিমেন্ট বেরিয়ে এল। তার পেছনের কুলুঙ্গিতে হাত গলাতেই একটা ভারি ওয়াটার প্রুফ্ থলিও বেরোল। সোনার মোহরে ঠাসা। ঐ সময় ঘুস নিতে হলে কাগজের টাকা কেউ ছুঁত না! শ্যামরতনদা বললেন।

আর বেরোল বাঁকা একটা বিলিতী পাইপ। পাইপটার মুখের কাছে একটা শাদা দাগ। সকালেও অসীম সেটা লক্ষ্য করেছিল। আস্তে আস্তে সে পাথরের সীটে বসে পড়ল। পা কাঁপছিল।

অনেকক্ষণ পরে বড় মামা বললেন, 'তাই বলি ১৯৪৩ সালে বিশুদাদার ৬৫ বছর বয়স ছিল। পাকা দড়ির মতো শরীর, খাকি শার্ট পেণ্টেলুন পরে ঘুরে বেড়াতেন, গুপ্তচর বলে কেউ সন্দেহও করত না। ছোটবেলায় দেখেছি।'

তারপর অসীমের দিকে ফিরে বললেন, 'তাহলে এখন তাঁর বয়স কত হয়? ১১২ না?'

অসীমের সব গুলিয়ে যাচ্ছিল। শ্যামরতনদার মুখের দিকে তাকাতেই তিনি ওর পিঠে একটা হাত রেখে বললেন, 'কি হল?' অসীম বলল, 'তবে কি উনি সত্যি নন? শুধু ছায়া? পষ্ট দেখলাম, থুতনিতে কাটার দাগ, আইডিন লাগানো! আর এই টাকাগুলো, ঐ পাইপ, এ সব তো বাস্তব।'

শ্যামরতনদা হাসলেন, 'কাকে ছায়া, কাকে বাস্তব বলবি

জানিনে। বালিগঞ্জে আমাদের বাড়িতে সারি সারি কাচের জানলা। তার ভেতর দিয়ে মাঠের ওপারের সত্যিকার নতুন বাড়ি দেখা যায়। তৈরি শেষ হয়নি, খালি, রাতে ভুষো অন্ধকার। ঐ জানলার কাচেই দেখতে পাই দূরে মোড়ের মাথার আলো-জ্বালা লোক-গমগম বাড়ির ছায়া। ভুষো অন্ধকার খালি বাড়ি আর লোকজন ভরতি আলো-জ্বালা বাড়ি মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। কোনটা সত্যি কোনটা ছায়া চিনতে পারি না। কাচের জানলা খুলে তবে বুঝতে পারি কোনটা কি। এবার ওঠ, ওঠ শিবু, উনি যা যা বলেছেন সেই মতো কাজটা তো করে ফেল।'

হঠাৎ অসীমের মনটা ভালো হয়ে গেল। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলা-যাক, মাসি দুধপুলি করেছে।'

দাদা গো দাদা

সুব্রত সেন

দাদাগো দাদা, দেখছি ভেবে অনেকদিন—
এই দুনিয়ায় সকল খারাপ,
পরীক্ষাতে নকল খারাপ,
ঝাঁকড়া চুলে জুলপী খারাপ,
শীতকালেতে কুলপি খারাপ,
তাগড়া লোকের ভিক্ষা খারাপ,
বোমবাজিতে দীক্ষা খারাপ,
চাকুও খারাপ, ছুরিও খারাপ,
মিইয়ে যাওয়া মুড়িও খারাপ,
মাইক খারাপ, চাঁদাও খারাপ,
পাড়ার লোকাল দাদাও খারাপ,
হাল ফ্যাশানের ম্যাক্সি খারাপ,
রিক্‌শা খারাপ, ট্যাক্সি খারাপ,
রকের পরে বেকার খারাপ,
চোখ রাঙানো চেকার খারাপ,
বেদম-ছোটা মিনিও খারাপ,
ডবল ডেকার ? তিনিও খারাপ,
রাস্তা ভরা গাড্ডা খারাপ,
সকাল সন্ধে আড্ডা খারাপ,
গ্রীষ্মে ঘামে নাইতে খারাপ,
কিন্তু সবার চাইতে খারাপ
—আঁধার ভরা লোড শেডিং।

এজেয় রায়

ছিরু হরবোলার ডাক

ছিরুকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল আট-দশটি ছোট ছোট ছেলে। বাচ্চা ছেলেগুলোর চোখ গোল গোল, কান খাড়া। ছিরু মুখে হাত ঢাকা দিয়ে ডাক শুরু করল—'কা কা কা কাঃ'—কাকের ডাক। একেবারে অবিকল।

অমনি মাথার ওপর ঘন পাতা-ছাওয়া বটের ডালের কাকের দল সচকিত হয়ে ডাকতে ডাকতে আকাশে উড়ল। ছেলেরা হাততালি দিয়ে উঠল আনন্দে।—'হাঁ ছিরুকাকা, হয়েছে হয়েছে, ঠিক।'

'ছিরুকাকা আর একটা—আর একটা।'

'নারে আজ থাক,' বলল ছিরু।

'একবার কোকিল ডাকো।'

'না না হাঁসের ডাক। হুইযে আকাশে যেতে যেতে ডাকে।'—ছেলেরা আবদার জানায়।

'বেশ আর নয় কিন্তু।'

ছিরু একটু দম নেয়। একবার খাঁকরি দিয়ে সাফ করে নেয় গলা। তারপর আবার মুখে হাত চাপা দিয়ে ডাক শুরু করে। আকাশ পথে উড়ে যেতে যেতে হাঁসেরা যেমন করে কথা বলে নিজেদের ভিতর—'ওঁক ওঁক্, কক্ কক্'—তাদের নানান সুরে ডাকাডাকি। মিনিটখানেক সেই ডাকের নকল শুনিয়ে ছিরু থামে।

'আহা থামলে কেন? বেশ হচ্ছিল। চালিয়ে যাও।'

ছিরু চমকে ফিরে দেখে কখন তিন-চারটি লোক এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে। তাদের মধ্যে রয়েছে বদন ঘোষ। দাঁত বের করে হাসছে বদন। সেই কথাগুলি বলেছিল। অন্যকজনার মুখেও চাপা হাসি। বদনের গায়ে পাট ভাঙা জামা ধুতি। হাতে একটি থলি। হাট থেকে ফিরছে। সঙ্গের লোকগুলি বদনের চেলা—ওর জমি চষে কেউ। কেউ ওর কাছে হাত পাতে দরকারে।

ছিরু ভারি লজ্জা পেল। হাট থেকে ফেরার পথে সে বসেছিল এই গাছের নিচে। জিরিয়ে নিচ্ছিল খানিক। পাশের গাঁয়ের ছেলেগুলো এসে ধরল ডাক শোনাতে হবে। লোভ সামলাতে পারে নি ছিরু। একদা নামকরা হরবোলা ছিরু পাল আজ এমনি লুকিয়ে চুরিয়ে বাচ্চাদের ডাক শুনিয়ে শখ মেটায়। দু-একটা সোজা সোজা ডাক। শক্ত ডাক ডাকবার জো নেই যে এখন।

বদনের মুখ থেকে চোখ সরিয়ে কুণ্ঠিতভাবে বলল ছিরু, 'ছেলেগুলো ধরল বড্ড। নইলে—'

'তা ভালই তো হচ্ছে। গতবার মেলায় ডাকলে না কেন?'

ছিরু মনে মনে তেতে উঠল। গতবার নবগঞ্জের মেলায় বিচিত্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল।—লাঠি খেলা হা-ডু-ডু ম্যাচ, ঢাকের বাজনা, পটুয়ার গান—এমনি সব আর ছিল হরবোলার ডাক। অর্থাৎ পশু পাখির ডাকের নকল। বদন ঘোষ সেরা হরবোলা হিসেবে মেডেল পেয়েছিল। ছিরু ডাক দেয় নি। বদন খুব ভাল ভাবে জানে ছিরু কেন নাম দেয় নি। প্রতিযোগিতায় এ সব কাকের ডাক বকের ডাক ডেকে পুরস্কার পাওয়া যায় না। আর ছিরুর পক্ষে এমন ছেলেমানুষী ডাক

ডাকাও শোভা পায় না। জেনে শুনেই খোঁচাটা দিল বদন। যেন ছিরুর এর বেশি করার সাধ্যি নেই। অথচ ছিরুর ক্ষমতা কি ওর চেয়ে কেউ বেশি জানে না।

একটু চুপ করে থেকে বলল ছিরু, 'ডাকে নামলে ভাল ডাকই দিতাম। কিন্তু তা সম্ভব নয়। তুমি তো জানই।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ নষ্ট করলে গলাটা। সাধনা চাই। সাধনা,' বদন মাতব্বরী ঢঙে বলল।

'ইচ্ছে করে কি আর করেছি। অসুখ হল। বরাত' ছিরু নত মুখে মাথা নাড়ে।

'ও কিছু নয়। নেশাভাঙ ছাড়। তামাকটা একদম বাদ। গলা ঠিক হয়ে যাবে,' বদন গম্ভীর চালে বলল।

'নেশা ভাঙ আমি করি না। আর তামাক তুমিও তো খাও,' চটে গিয়ে জানাল ছিরু।

'কক্ষনো না। বড় জোর কালে ভদ্রে,' বেবাক মিথ্যে কথা চালিয়ে দিল বদন, 'কি বল?' চেলাদের দিকে চাইল সে। তারাও তৎক্ষণাৎ সায় দিল—

'তা বটে, তা বটে। ঠিক।'

'সংযম চাই হে। সংযম। এই চল চল'—ছিরুকে ফোঁস করতে দেখে বদন বিরক্ত। সঙ্গীরাও বোঝে তার মনের ভাব। উসকে দেয়'—হুঁ হুঁ চলা যাক। সময় নষ্ট। যত ছেলেমানুষী ব্যাপার। তা ঘোষ মশায় একদিন আসর বসান। নতুন ডাক কি কি তুলেছেন? বলেছিলেন শোনাব একদিন।'

'শোনাব শোনাব,' বদনের গলা শোনা যায়, 'ভড়ংটা দেখছো ওনার। যেন কত বড় কেউ-কেটা ছিলেন। আমি তো জানি ওর মুরোদ। হুঁঃ।' শেষ কথাগুলো ছিরুকে শুনিয়েই বলে।

বদনের দল চলে যেতে রাগে গুম মেয়ে বসে রইল ছিরু। গায়ে পড়ে খোঁচা দিয়ে গেল বদন। অল্প বয়সে একই গুরুর কাছে হরবোলার ডাক শিখেছিল দু'জনা। বদনের বাড়ি পাশের গাঁ পারুলডাঙায়। বন্ধু ছিল তারা। ছিরুর প্রতিভা ছিল বেশি। গুরু অনাথ মালের ভারি পেয়ারের ছাত্র ছিল সে। মনে মনে তাকে তাই হিংসে করত বদন। বদনের ছিল টাকার জোর কিন্তু তা দিয়ে তো আর ডাক তোলা যায় না। তারপর ছিরুর হল গলার দোষ। দুর্ভাগ্য তার। কাশতে কাশতে গলা যেন চিরে যেত। ডাক্তার বারণ করে দিল—হরবোলাগিরি চলবে না। তাহলে গুরুতর অসুখে পড়বে। জীবন-সংশয় হতে পারে। চেঁচানো নিষেধ। হরবোলার ডাক ছেড়ে দিল ছিরু। বহুদিন একটিও পশুপাখির ডাক সে দেয় নি। আট দশ বছর পরে এখন মাঝে মাঝে দু-একটা সোজা ডাক ছেলে পুলেদের শোনায়। তবে শক্ত ডাক চেষ্টা করে না ভয়ে—পাছে গলায় জোর লাগে।

ছিরু সরে আসতে বদনের হয়েছে পোয়াবারো। নানা জায়গা থেকে তার আমন্ত্রণ আসে হরবোলার ডাক শোনাতে। আর এখন বদন সুযোগ পেলেই একটু খোঁচা দেয় ছিরুকে। তাচ্ছিল্যের ভাব দেখায়। পুরনো রাগের শোধ তোলে। জানে ছিরু এখন অসহায়। টক্কর দিয়ে হারাতে পারবে না বদনকে। ছিরু মুখ বুজে সয়। তবে আজকের অপমানটা বড় মনে বিঁধেছে। একটা বিহিত করতে হবে। বদনের মুখ চিরকালের মতো সে বন্ধ করে দেবে।

ক'দিন ধরেই ভাবছে ছিরু। হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল। —বাঘ। বাঘের ডাক। সার্কাসের কথাতেই মনে এল। নবগঞ্জে এক সার্কাস এসেছে। একটা দুর্দান্ত বাঘ আছে সার্কাসে। খাঁটি রয়েল বেংগল টাইগার। সারাদিন গজরাচ্ছে। প্রায় তিন মাইল দূরে তাদের গাঁ থেকেও মাঝে মাঝে শোনা যায় তার গর্জন। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে বাতাসে ভেসে আসে বন্দী পশুর হুংকার।

একদা বাঘের ডাক তার গলায় খুলত দারুন। শুনে আঁতকে উঠত লোকে। গুরু অনাথ মাল বড় যত্নে শিখিয়েছিল। ওই ডাক ঠিক মতো তুলতে পারে নি বদন। বারবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। গুরু হেসে বলেছিল, 'হচ্ছে না বাপ। কান চাই। দম চাই। যে ডাক শুনলে স্বয়ং বাঘ ভুল করবে, তবেই না সার্থক।' মুখ কালো হয়ে গিছল বদনের।

ওই বাঘের ডাকই ফেয় তুলবে গলায়। যদি তাতে অসুখে পড়ে তাও সই। আসছে মেলায় বদনের বেড়ালের ঝগড়া আর শিয়াল কুকুরের ডাক শুনে লোকে যখন বাহবা দেবে তখন সে উঠবে স্টেজে। ব্যাঘ্র গর্জনে পিলে চমকে দেবে লোকের।

ছিরু নিয়মিত নবগঞ্জে যাওয়া-আসা করতে লাগল। প্রতিদিন সে বাঘের খাঁচার পাশে বসে থাকে অনেকক্ষণ। কান তৈরি করে। ভুলে যাওয়া ডাককে ঝালিয়ে নেয় মনে। তারপর নির্জন নদীর তীরে গিয়ে অভ্যেস করে ডাক। খুব সাবধানে সাবধানে। যেন কেউ টের না পায়। তাহলে—বদন নামবে না প্রতিযোগিতায় বেইজ্জতের ভয়ে। বিখ্যাত জগৎ কবিরাজকে গিয়ে ধরল ছিরু—'কবিরাজ মশাই, আমার গলাটা এট্টু আরাম করে দিন। অন্তত কিছু দিনের জন্য।'

মেলা অবধি অপেক্ষা করার মতলবটা পালটে ফেলল ছিরু।

বদন একদিন ডেকে বলল, 'ছিরু, পারুলডাঙায় যাত্রা শুনতে এস আসছে রোববার। পালা—হরিশচন্দ্র।'

'তুমি পার্ট করছ নাকি?' ছিরু জিজ্ঞাসা করেছিল।

'নাঃ। তবে আছি পালায়। শ্মশানের সীনে শৃগালের ডাক দেব। সেই যে মেলায় ডেকেছিলেম সেইটে। ভেবেছিলেম কুটুমবাড়ি যাব এই সময়ে। গাঁয়ের ছেলেরা ছাড়ছে না। বলছে, আমি ডাক না দিলে জমবে না সীনটা। সত্যি, আর কেই বা আছে উদ্ধার করার।'

এরপরই ছিরুর মাথায় গজিয়ে উঠল মতলবটা। উনি ছাড়া এমন এলেম বুঝি কারও নেই। বটে! নিজের মুখে এমন নিজের বড়াই করতে চক্ষুলজ্জাও হয় না! দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা।

যাত্রার দিন ছিরু বিকেলে পারুলডাঙায় গিয়ে খুঁজে পেতে ধরল পারুলডাঙা যাত্রা পার্টির প্রম্টারকে। আড়ালে ডেকে বলল, 'হ্যাঁ গো নসুজ্যাঠা কি শুনছি। সার্কাসের বাঘটা নাকি খাঁচা ভেঙে পালিয়েছে?'

নসুজ্যাঠা চমকে বলল,' কে বললে?'

'ক'জন একটু আগে যাচ্ছিল বড় রাস্তায়। বলাবলি করছিল ওই রকম কি একটা। পালিয়েছে—বাঘ—এই রকম কটা কথা এল কানে। লোকগুলো সাইকেলে

যাচ্ছিল। ডেকে জিজ্ঞেস করি ভাবতে ভাবতে অনেকটা পেরিয়ে গেল। আর ডাকা হল না।'

নসুজ্যাঠা বলল, 'কৈ কেষ্টা তো গিছল সকালে নবগঞ্জে। কিছু বলল না খবর। অবশ্য দুপুরে যদি কিছু হয়?' নসুজ্যাঠা নিজের মনে বিড়বিড় করে।

'যা ভয়ংকর জানোয়ার একখান। একবার নাকি পালিয়েছিল মাস দুই আগে। জখম করেছিল একটা লোককে। যাই—' মনে উদ্বেগ নিয়ে চলল নসুজ্যাঠা।

'তুমি আবার বল না কাউকে,' ছিরু সাবধান করল নসুজ্যাঠাকে, 'আজ পালা। লোকে অকারণে ভয় পেয়ে শেষে যাত্রা শুনতে আসবে না। বেরতে চাইবে না ঘর থেকে। খবর সত্যি হলে ঠিকই রটে যেত। লোকগুলো রগড় করছিল মনে হয়।'

রাত দশটা নাগাদ নিঃসাড়ে ঘর থেকে বেরুল ছিরু।

গ্রাম তখন নিঝুম। গ্রাম ছাড়িয়ে সে মাঠে নামল। তাদের গাঁ রবিপুর থেকে পারুলডাঙা মাইল দেড় দূর মাঝে বিরাট চাষের জমি। ফাল্গুন মাস। ধানের মাঠ ফাঁকা। শীত শীত করছে। আকাশে ফালি চাঁদ। ওই জ্যোৎস্না-টুকু এবং তারার আলোয় ঘন আঁধার কিছু ফিকে। দূরে পারুলডাঙা গ্রামের মাথায় বহু হ্যাজাক বাতির লালচে আভা। অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসছে। যাত্রার অভিনেতাদের কণ্ঠস্বর। আলে আলে হেঁটে মাঠ আধা আধি পেরতে কথা স্পষ্ট হয়ে এল। শোনা গেল বিবেকের ভীষণ সুরে গান। ছোট এক ঝোপের পাশে গুছিয়ে বসল ছিরু। আরও খানিক সময় যাক। এখনো মহানুভব রাজা হরিশচন্দ্র রাজ্যপাট হারিয়ে চণ্ডাল বৃত্তি গ্রহণ করেন নি। শ্মশানের সীন আসার একটু আগে সে এগিয়ে যাবে পারুল ডাঙার সীমানায়। তারপর ডাক ছাড়বে বঘের। অতঃপর দেখা যাক কি ঘটে। মেলা কমিটির প্রেসিডেন্ট হবিবুল্লা সাহেব এসেছেন যাত্রা দেখতে। তার সামনেই বিচার হয়ে যাবে কে বড় হরবোলা। তার গর্জন শোনার পর দর্শকের বদন ঘোষের শিয়ালের ডাক শোনার অবস্থা থাকবে কিনা সন্দেহ। আর যদি কোনও ফল না হয় তার ডাকে, সে সুড়সুড় করে পালিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়বে নিজের বাড়িতে। কেউ টেরটি পাবে না, এই বাঘের ডাক কার কীর্তি।

ছিরু একদিন গিয়ে রিহারসাল দেখে এসেছে। কাজেই দূরে বসে কানে শুনে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না কোন সীন চলছে। আর একখানা বিবেকের গান। তারপরই শ্মশানের দৃশ্য অর্থাৎ বদনের শিয়ালের ডাক।

হঠাৎ ফস্ করে একটা দেশলাই জ্বলে উঠল মাঠের মাঝে। কে? খুব নজর করে দেখল ছিরু অন্ধকার জনহীন মাঠের ভিতর এক জায়গায় কটা মাথা এবং দু-তিনটে আগুনের বিন্দু। লাল আলোর ফুটকিগুলো মাঝে মাঝে চোখে পড়ছে—নড়াচড়া করছে। ওখানে বসে হাতের আড়াল দিয়ে কারা বিড়ি বা সিগারেট টানছে। চাপা ফিসফাস কথা কানে এল। ভীত সন্দিগ্ধ ছিরু লক্ষ্য করতে থাকে। চোর-ডাকাত নিশ্চয়। রকম-সকম দেখে তাই ঠাওর হচ্ছে। আর একটু রাত হবার অপেক্ষায় আছে। ওদের লক্ষ্যটা কি? পারুলডাঙা না তাদের গাঁ? রবিপুর হওয়াই সম্ভব। তাঁদের গাঁয়ের বেশির ভাগ জোয়ান পুরুষ গেছে পারুলডাঙায় যাত্রা দেখতে। অরক্ষিত গ্রামে ডাকাতির এই উপযুক্ত সময়।

ছিরু মহা দুশ্চিন্তায় পড়ল। কি করবে সে? ছুটে গিয়ে পারুলডাঙায় খবর দেবে? যেতে যেতে যদি ডাকাতদের নজরে পড়ে যায়, গুলি খেয়ে মরবে। তার কথা যাত্রার দর্শক যদি বিশ্বাস না করে? লোকজন সজাগ হলে ডাকাত পালাবে। তাদের দেখা না পেলে লোকে ভাববে এ তার যাত্রা ভণ্ডুল করার তাল। অন্তত বদন তাই ভাববে।

হরিপুরে ঢুকেই তাদের বাড়ি। বৃদ্ধ ঠাকুর্দা, মা, স্ত্রী, মেয়ে রয়েছে। সব লুটে নিয়ে যায় যদি ডাকাতে মার ধোর করে যদি? কাঠের মতো বসে থাকে ছিরু আর ভাবে।

বিবেকের গলা ভেসে এল। কর্তব্য স্থির করে ফেলে ছিরু। আলের আড়ালে নেমে গিয়ে লুকিয়ে বসে। তারপর ঝোলার ভিতর থেকে বের করে মাটির

হাঁড়িটা। দুহাতে হাঁড়িটা ধরে তাতে নিজের মাথার গোটাটা প্রায় ঢুকিয়ে দিয়ে বুক ভরে দম টেনে সে হাঁক পাড়ল—'আ উ উ ম ম্। উঁ ম-ম্!'

নিস্তব্ধ ধু ধু মাঠে সেই বিকট গমগমে আওয়াজ অতি ভয়ানক শোনাল। পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠল যেন। ফের এক গর্জন—ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের দীর্ঘ লয়ে হুংকারের অবিকল নকল।

'বাপরে'—সমবেত কণ্ঠে আর্তনাদ এবং তারপরই দ্রুত পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল দূরে।

উঁকি মেরে দেখল ছিরু, অনেকগুলি ছায়া মূর্তি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে মাঠ দিয়ে। কয়েকজন দৌড়চ্ছে পারুল ডাঙার দিকে।

ওদিকে যাত্রার আসর চুপ। টুঁ শব্দটি নেই। এমনি রইল আধমিনিটটাক। এর পর শোনা গেল তুমুল কলরব। বহু কণ্ঠের ভয়ার্ত চিৎকার। যেন তাণ্ডব শুরু হয়েছে। হতভম্ব হয়ে গেল ছিরু। পারুল ডাঙা থেকে শোনা গেল টিন পেটানোর প্রচণ্ড শব্দ। একটা বন্দুকের আওয়াজ হল। আসর ভেঙে গেছে। অনেক টর্চের আলো ছোটাছুটি করছে। হরিপুরের দিক থেকেও চিৎকার উঠল।

ছিরু বুঝল এখন পারুল ডাঙায় যাওয়া নিরাপদ নয়। বাঘ ভেবে তাকে না গুলি করে বসে। সে চুপিচুপি রওনা দিল নিজের বাড়ির দিকে। যেতে যেতে আর একখানা প্রাণভরে বাঘের গর্জন ছাড়ল পারুল ডাঙা লক্ষ্য করে।

পরদিন খুব ভোরে বদন ঘোষের বাড়ির দরজায় ঘা দিল ছিরু। ডাকল—'ওহে বদন, দোর খোল। আমি ছিরু।'

বদন সাবধানে দরজা খুলে উঁকি দিল। চকিতে দেখে নিল রাস্তার এমুড়ো থেকে ওমুড়ো। নাঃ, বাঘ নেই। ছিরু ছাড়া বাইরে লোকও নেই একটিও। বাঘের ভয়ে কেউ ঘরের বাইরে পা দেয় নি তখনো।

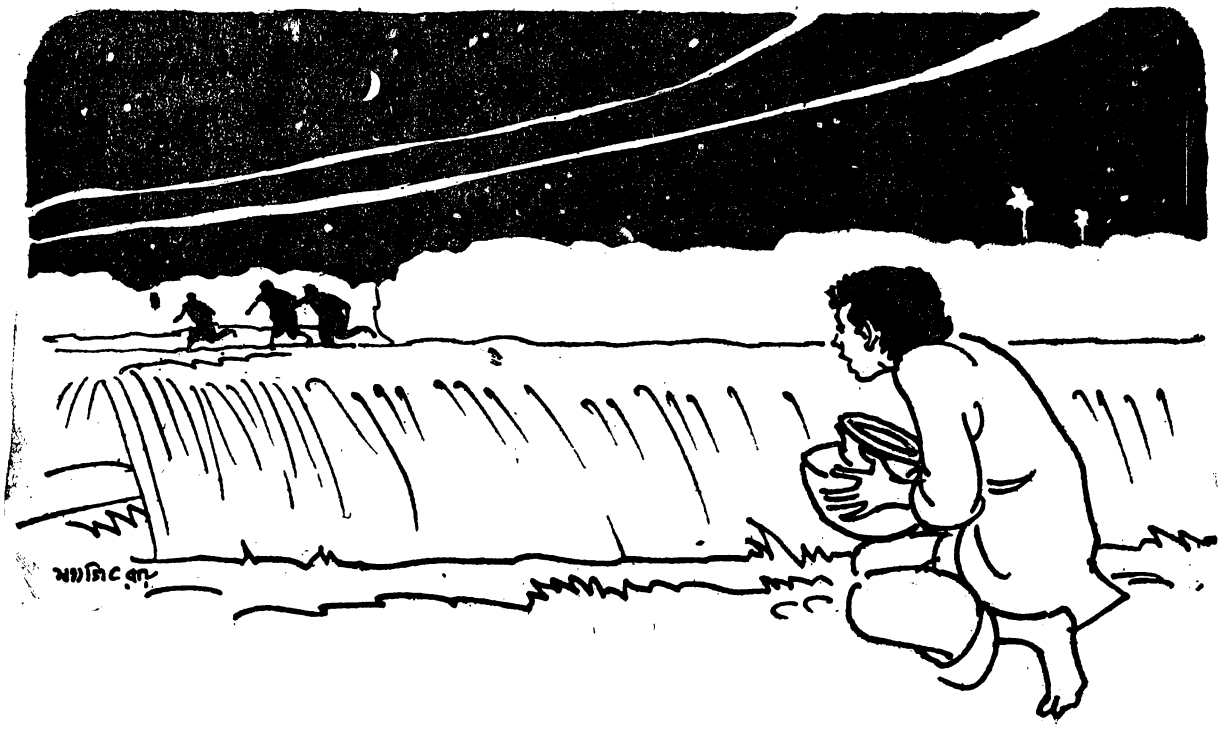

বদন বেরিয়ে এল। দেখাদেখি আরও দু-চার জন। সবার রাত জাগা শুকনো মুখ।

'কোথায় ছিলে রাতে?' ছিরুকে জিজ্ঞেস করল বদন।

'নিজের ঘরে বিছানায়।'—'যাত্রা শুনতে যাওনি?'—'না'।

'বাঘের ডাক শোন নি?'

'শুনেছি বৈকি! নিজের ডাক নিজের কানে যাবে না? আমি কি কালা?'

'মানে!'

'মানেটা পরে বলছি, আগে শুনি ডাকাতগুলোর কি হল?'

'কে কেতু মণ্ডল আর গোলাম আলি? বাঘ ডাকতেই কোত্থেকে এসে ওরা ছুটে ঢুকল গাঁয়ে। একজনের ঘরে ঢুকে পড়তে আটক করে রেখেছি। তা তুমি জানলে কি করে? এই যে বললে নিজের বাড়িতে ছিলে রাতে।'

'সে তো পরে গেলাম। হাঁক ছেড়ে ডাকাত তাড়িয়ে—আসর ভেঙে দিয়ে তাপ্পর। যাক ওদের জমা দাও। দারোগাবাবুকে বল গিয়ে মাঠে অনেক অস্ত্রশস্ত্র পড়ে আছে ওদের। আরও ছ-সাতটা ছিল দলে। ডাকাতি করতে এসেছিল এখানে।'

'কি বলছো যা তা,' বদনের চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে। 'হেঁয়ালি রাখ। ঠিকঠাক্ খুলে বল!'

ছিরু হেসে বলল, 'খোঁজ নিও গিয়ে, সার্কাসের বাঘ বেরয় নি। ওটা আমারই ডাক। শুনবে নাকি আর একবার? সেই যে ওস্তাদ শিখিয়েছিল। মনে পড়ে?'

সে হাঁড়িটা বের করে, তার ভিতর মুখ ঢুকিয়ে টেনে এক হুংকার ছাড়ল—'আ উ উ ম ম্—উ ম ম্।'

তার পরেই ছিরু ভীষণ কাশতে শুরু করল।

ডাক-নাম

সন্তোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

গন্ধ-মূষিক যার ভালো নাম,
ডাক-নাম তার ছুঁচো;
বিল্বফল তো কেউ চেনে না,
চিনবে—তেলাকুচো।
মাকড়সা যে উর্ণনাভ,
সবাই কি আর জানে?
জোনাকির নাম—খদ্যোত, তা
পাই যে অভিধানে।
ব্যাঙ-বাবাজী ডোবায় থাকেন,
তিনিই নাকি দাদুরী!
খেঁদি বলেই ডাকছি যাকে,
তার নামই কি মাধুরী?
সূয্যিমামার আদ্যিকালের
নাম ছিল কি পূষণ?
সেঁকরা যে-সব গয়না গড়ে—
সে-সব নাকি ভূষণ!
পনস বললে চিনবে কি কেউ
কাঁঠাল বলি যাকে?
আঙুর নাকি দ্রাক্ষাফল—
মাচায় ঝুলে থাকে।
দেবজ্যোতি যার ভালো নাম,
ডাক নাম তার হাঁদু;
ভাগনে আমার চন্দ্রশেখর,
সবাই ডাকে—চাঁদু॥

রেবন্ত গোস্বামী

রবিদাস কাহিনী

পনের বছর আগে যখন মোহনগড় হাসপাতালের ডাক্তার হয়ে আসি তখনই কোয়ার্টারের মালী রাখোয়াল কুজুরের মুখে শুনেছিলাম রূপ ঠাকুরের গল্প। এরকম গল্প আমি অনেক জায়গায় শুনেছি। লোনাজলা গাঁয়ের রামপদ মণ্ডল একবার আমাকে বলেছিল বনবিবির কথা। সে নাকি নিজের চোখে দেখেছিল, বাঘের পিঠে চড়ে জগদ্ধাত্রী ঠাকুরের মতন বনবিবি মাঠ পার হয়ে বনের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। অমাবস্যার রাতে রাবণ রাজার সিংহদরজা খোলার শব্দও তাদের গাঁয়ের লোকে নাকি প্রায়ই শুনত। এসব গপ্পো শুনে বেশ মজা পাওয়া যায়, যদিও জানি এসব আজগুবী কাহিনী-গুলো গাঁয়ের লোকের বানানো। তারা বনে বাদাড়ে ভূত দেখে। তাদের আবার নানারকম চেহারা।

রাখোয়ালের গল্প আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। পনের নম্বর বেডের রোগী মারা যাবার আগে আমাকে যে চিঠি দিয়ে গেল তাতে আবার নতুন ক'রে সব মনে পড়ল। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মধ্যে একটা হতভম্ব ভাব আমাকে অনেকদিন ধরে চেপে রেখেছিল। আজও যখন ভাবি তখন মনে হয় সত্যিই কি হর্ষ ডাক্তার সত্যি কথা বলেছিলেন? নাকি তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতিই হয়েছিল। রাখোয়ালের গল্পের সঙ্গে তাঁর কাহিনীর অবিশ্বাস্যরকম যোগটা কি কাকতালীয়! কিন্তু গল্পটা পরে আমি অনেক শিক্ষিত লোকের কাছেও শুনেছি। চুনের খনির ম্যানেজার মিঃ চক্রবর্তীও বলেছিলেন ঘটনাটি সত্যি।

মোহনগড় হাসপাতালের বাঙালী ডাক্তারের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা কাগজেও বেরিয়েছিল। নামটা ছিল অদ্ভুত। হর্ষবর্ধন সাধ্য। আমি জানতাম না, ওরকম নাম পদবী বাঙালীদের থাকে কিনা। তাঁর খালি জায়গাতেই আমি চাকরি নিয়ে এখানে আসি। এসে হর্ষ ডাক্তারের সুনাম আর প্রশংসা অনেকের কাছেই শুনেছি। রোগীদের কাছে তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। পুরনো ডাক্তাররা বলেন, তিনি ছিলেন এক অসাধারণ সার্জন। ভালুকে ফালা ফালা করে চিরেছে এমন একাধিক রোগীকে তিনি শুধু বাঁচিয়েছেন তাই নয়, অদ্ভুত নিখুঁতভাবে তাদের চেহারা সারিয়ে তুলেছিলেন। এরকম একজন ডাক্তারের নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা সকলকে হতবাক করেছিল। কেউ তাঁর শত্রু ছিল না। সেই জন্যে ঘটনাটা আরো বিস্ময়কর, আরো রহস্যময়।

রাখোয়াল মালী হর্ষ ডাক্তারের কথার সঙ্গে সঙ্গে আরো নানারকম গল্প করত। রূপঠাকুরের গল্পও সে রকম একটা।

মোহনগড়ের লোকে অনেকেই দেখেছে রূপঠাকুরকে।

রূপোর মতন দেহ থেকে জ্যোতি বেরোচ্ছে। দেবতার মতন সুন্দর চোখমুখও যেন রূপো দিয়ে তৈরি। গাঁয়ের লোকের যখনই কোনো বিপদ হয়েছে, রূপঠাকুর মুহূর্তের মধ্যে এসে বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। তারপর হরিণের মতো দ্রুত পায়ে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছেন।

বিষ্ণু মোহান্তির মেয়ে যেবার নদীতে ডুবে গেল, গাঁয়ের লোকে শুধু নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে হায় হায় করছিল। কোথা থেকে দেবতার মতন ছুটে এলেন রূপঠাকুর। নদীতে ডুব দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে তুলে আনলেন অজ্ঞান মেয়েটিকে। তারপর তাকে পাড়ে শুইয়ে রেখেই চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই অদৃশ্য। সেই গতির সঙ্গে মোটর গাড়িও পাল্লা দিয়ে পারবে না।

জালিয়া নায়ক যেবার বনের মধ্যে মহুয়া আনতে গিয়ে ভালুকের হাতে পড়ে, ওই রূপঠাকুরই তখন ভালুককে ঘুষি মেরে তাকে বাঁচিয়েছিলেন। বাঘে ভালুকে তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারত না। শুধু বিপদত্রাতাই নন, আরো কতরকম উপকার করতেন তিনি। আবদুল গনির বলদজোড়া মরে গেলে সে হায় হায় করছিল, কি দিয়ে জমি চষবে তার চিন্তায়। পর দিন সকালে ক্ষেতে গিয়ে সে অবাক। রাত্তিরেই কে তার জমি চষে রেখেছে। এত সুন্দর চাষ সে বলদ দিয়ে করতে পারত না। সেলিম মিয়ার ঘরের চালের খড় খসে পড়েছিল।

মাঝ রাতে চালে খড় খড় আওয়াজ শুনে হৈ হৈ করে উঠে পড়েছিল সে। রাত্তিরে ভাম নামে একরকম জন্তু আসে পায়রা মুরগী খেতে। কিন্তু কী দেখল করিম? জোছনার আলোয় পরিষ্কার দেখল একটা রূপোর মূর্তি চাল থেকে নেমে বিদ্যুতের মতন দূরে মিলিয়ে গেল। চালের দিকে তাকিয়ে সে অবাক। নতুন খড় দিয়ে তার চাল ছাওয়া। আনন্দে ভক্তিতে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলেছিল সেলিম মিয়া।

সেই রূপঠাকুরই পরে হয়ে উঠেছিলেন আশে-পাশের সমস্ত গাঁয়ের বিভীষিকা। পাশের গাঁয়ের বড়লোক লক্ষ্মণ মহাপাত্রকে গলা টিপে মেরে তার সিন্দুক থেকে সব টাকাকড়ি গয়নাগাটি নিয়ে চলে যান। এর পরে কত খুন, কত ডাকাতি। ঘরের মধ্যে রূপঠাকুরকে বাক্স ভাঙতে দেখেও কেউ বাধা দেয় নি। ইষ্টনাম জপ করেছে। পুলিস এসেও কিছু করতে পারে নি এসব খুন ডাকাতির। রূপঠাকুরের কথা বললে তারা অবিশ্বাসের হাসি হেসেছে। কিছু নিরীহ লোককে ধরে হেনস্থা করেছে। পরে গাঁয়ের হিন্দু মুসলমান সবাই মিলে রূপঠাকুরের পুজো দিলে রূপঠাকুরের দৃষ্টি চলে যায় গাঁ থেকে। আর কোনদিন তিনি আসেন নি।

রাখোয়াল হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলেছিল. 'জানি না, রূপঠাকুর হঠাৎ কেন ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছিলেন। হয়ত গাঁয়ের লোকদের ত্রুটি হয়েছিল কিছু। আজও মোহনগড়ের আদিবাসী হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টানরা মিলে শ্রাবণ পূর্ণিমায় রূপঠাকুরের পুজো দেয় থৈরি নদীর ধারে, যেখানে বিষ্ণু মোহান্তির মেয়েকে তিনি তুলেছিলেন।'

পনের বছর আগেকার শোনা এই রূপঠাকুরের গল্প যে আরেক শিক্ষিত বিজ্ঞানবিদের গল্পের সঙ্গে মিশে গিয়ে আমাকে এভাবে হতভম্ব করবে, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি।

সকালে হাসপাতালে আসতেই নার্স বলল, 'ডক্টর মিত্র, পনের নম্বর বেডের পেশেন্টের জ্ঞান ফিরেছে এখুনি। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

পনের নম্বর বেডের কাছে এলাম। বেডের পাশে চার্টে নাম দেখলাম—সাধু বাবা। রোগ—সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস। সাধুবাবা মোহনদেবের মন্দিরে কিছুদিন হল ডেরা বেঁধেছিল। ক দিনের মধ্যে ভক্তটক্ত জুটিয়ে নিয়ে দিন কাটাচ্ছিল বেশ। অসুস্থ হয়ে পড়তে ভক্তরাই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়। বড় বড় চুল আর গোঁফ দাড়ি ভর্তি মুখটার মধ্যে চোখ দুটো যেন বেমানান আমি যেতেই ইসারায় কাছে ডেকে সাধুবাবা বলল, 'ডাক্তার, যাওয়ার আগে একটা কথা বলে যাই। মোহনদেবের মন্দিরে আমার বাক্সের মধ্যে একটা কাগজ আছে। ওটা নিয়ে পড়বে। একটা জিনিস তোমাকেই

জানিয়ে যেতে চাই। পড়ার পরে ছিঁড়ে ফেলতে পার কাগজটা।'

আমি সাধুবাবাকে আশ্বাস দিয়ে বলি, 'তুমি নিশ্চয় সেরে উঠবে সাধু। কদিনের মধ্যেই তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।'

সাধুবাবা মৃদু হেসে বলল, 'ডাক্তার, সেরিব্রাল হেমারেজের মধ্যে মাঝে মাঝে সাময়িক একটা জ্ঞান ফিরে আসে। আমার তাই হয়েছে। এর পরে আসবে বড় ঢেউটা। তারপরেই শেষ। হর্ষ ডাক্তার ভুল বলে না।'

ভয়ানক রকম চমকে উঠলাম। সেদিনই রাত্রে মারা গেলেন সাধুবাবা ওরফে ডাঃ হর্ষবর্ধন সাধ্য। হাসপাতালের অন্য ডাক্তার নার্স কর্মচারীরা চিনতে পারল গোঁফদাড়ির মধ্যে হর্ষ ডাক্তারের মুখটাকে। কিন্তু তার এই পরিণতির কারণ কিছুই জানতে পারল না। বিশ্বাস করল, হর্ষ ডাক্তারের হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

কারণটা জেনেছিলাম আমি, কাউকে বলি নি। বলতে সাহস পাই নি আজো। কারণ নিজেই বুঝতে পারছি না, আমি কি সত্যিই তাঁর কথা বিশ্বাস করেছি।

সাধুচরণের ভক্তদের মধ্যে রাখোয়ালও ছিল। সেই বাক্সটা নিয়ে এসে আমাকে দিয়েছিল। সহকর্মীরা হেসেছিল আমার খেয়াল দেখে। কেউ বলল, 'দেখুন, যদি কিছু মেডিকাল পেপার থেকে থাকে।'

ডাক্তারির কোনো বইপত্র ছিল না। তার বদলে ছিল জগদীশ ঘোষের গীতা, রাজশেখর বসুর রামায়ণ-মহাভারত। আর ছিল সেই চিঠি। কাউকে উদ্দেশ্য করে নয়। জানি না কার জন্যে হর্ষ ডাক্তার লিখেছিলেন এই অকথিত কাহিনী। দারুণ বিস্ময়ের সঙ্গে পড়তে সুরু করলাম সেই আত্মকথা—

'আমি হর্ষবর্ধন সাধ্য। জীবনে কোনো পরীক্ষায় প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হইনি কখনো। ইচ্ছে ছিল, বিজ্ঞানে গবেষণা করে বৈজ্ঞানিক হব। ইলেক্‌ট্রনিক্‌স্ আমার প্রিয় সাবজেক্ট ছিল। কিন্তু মামাবাড়ির চাপে ডাক্তারিতে ভর্তি হতে হল। ছোটবেলাতেই আমার বাবা-মা মারা যাওয়াতে মামাবাড়িতেই আমি মানুষ।

ডাক্তারি পরীক্ষাতেও চরম সাফল্যের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। আমার ডিসেকশন অধ্যাপক আর ছাত্রদের মধ্যে একটা কিংবদন্তীর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ডাক্তার হয়ে মামাদের ইচ্ছেমতো বিলেত না গিয়ে যখন মোহনগড় হাসপাতালের চাকরি নিলাম, তখন ভয়ানক রেগে গেলেন তাঁরা। সহপাঠীরাও অবাক হয়ে নাম দিল, ডাক্তার হর্স।

মোহনগড় অঞ্চলে আমার সুনাম ছড়িয়ে পড়ল অল্প কালের মধ্যেই। স্থানীয় লোকের কাছে আমার নাম বদলে গিয়ে অন্যরূপ নিল—সাধু ডাক্তার।

এর পরে গোপনে একটা ভয়ানক কাজে হাত দিলাম আমি, যা এদেশে এখনো কেউ করেনি। একটা রোবট তৈরির কাজ। ডাক্তারি আর পদার্থ বিদ্যার সংমিশ্রণে তৈরি করতে আরম্ভ করলাম এই রোবট। আমার তৈরি এই রোবটের শরীর হবে না যান্ত্রিক। প্রকৃতি স্বয়ং যে নিখুঁত দেহযন্ত্রটি গড়েছেন, সেটাকেই কাজে লাগাব ঠিক করলাম। তার জন্য দরকার একটা সদ্যমৃত মনুষ্যশরীর। সেই দিনটা এল। গাঁয়ের একজন লোক সাপের কামড়ে মারা গেলে আত্মীয়স্বজনরা তার দেহ নদীতে ভাসিয়ে দিল। সাপের কামড়ে মৃত ব্যক্তির দেহ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়াই এখানকার রীতি। রাতের অন্ধকারে নদীর বুক থেকে চুরি করলাম সেই শবদেহ। একাজে আমার সহকারী ছিল আমার বিশ্বস্ত ভৃত্য ত্রিনাথ! ব্যাপারটা ফ্র্যাংকেনস্টাইনের গল্পের মতো মতো মনে হচ্ছে, তাই না? না। ফ্র্যাকেনস্টাইনের দানবের ছিল নিজস্ব মস্তিষ্ক কিন্তু আমার সৃষ্টি রোবটের নিজস্ব কোন মস্তিষ্ক থাকবে না। একটা ইলেকট্রনিক ব্রেন থাকবে। সুইচ্ অন্ করলেই ব্রেনটা চালু হয়ে যাবে। একটা ট্রান্সমিটারে আমি তাকে কোনো আদেশ করলেই তার ইলেকট্রনিক ব্রেন সেটা গ্রহণ করবে আর সঙ্গে সঙ্গে সেই আদেশ মতো কাজ করতে এগোবে আমার তৈরি বেতাল এই রোবটা। কাজ

হয়ে গেলেই তার মাথায় পেছনে অবস্থিত কম্যাণ্ড মডিউল তাকে আমার কাছে অর্থাৎ ট্র্যান্সমিটারের কাছে ফিরিয়ে আনবে। তখন আবার সুইচ্ অফ্ করে তাকে শুইয়ে রাখব।

অনেকদিনের অক্লান্ত সাধনায় একদিন মনুষ্য দেহধারী রোবট প্রাণ পেল। তার মুখ বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। আমি অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি একটা মুখোসে তার মুণ্ডটা ঢেকে দিলাম, মমির বেলায় যেমন করা হত। তাতে সুন্দর একটা রৌপ্যমূর্তির মতন তাকে দেখতে হল। দেহসন্ধিগুলো শুধু অনাবৃত রাখলাম, যাতে নড়াচড়া চলাফেরা করতে অসুবিধা না হয়। আর একটা জিনিস আমি করলাম। আগের কনট্রোল ট্র্যানসমিটারের সঙ্গে জুড়ে দিলাম একটা ভয়েসকাস্ট ট্রানসমিটার। রিসিভার আর স্পীকারটা বসালাম রোবটের মুখগহ্বরে। ভয়েসকাস্ট ট্র্যানসমিটারে পাঠানো আমার কণ্ঠস্বর রোবটের মুখে শোনা যাবে চমৎকার ভাবে। রোবটের একটা নামকরণও করলাম—রবিদাস। 'রবি' কথাটা আসলে রোবি, রোবট-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। আর 'দাস' মানে তো ভৃত্য। আমার এই দুই ট্র্যানসমিটার দশ মাইল দূরত্ব পর্যন্ত রবিদাসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত।

আমি রবিদাসকে দিয়ে নানা কাজ করাতে লাগলাম। সকলের উপকার আর কল্যাণের কাজ। মানুষ হয়ে করতে যাতে অনেক বাধা, রবিদাসের পক্ষে তা ছেলে-খেলা। তার কাজের গতিও হল অবিশ্বাস্যরকম দ্রুত। শক্তিতে সে একটা ছোটখাটো ক্রেনের সমান। কিছু দিনের মধ্যেই রূপঠাকুর নামে মোহনগড়ে তার পরিচয় হয়ে গেল। সরল বিশ্বাসী গাঁয়ের লোক ভাবল সে মোহনদেবেরই জাগ্রত রূপ। স্থানীয় এক ব্যবসাদার বেআইনীভাবে সরষের তেল আর কেরোসিন তেল মজুত করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করছিল। আমি রবিদাসকে রাতে তার কাছে পাঠিয়ে তাকে দিয়ে (আমার কণ্ঠে) বলালাম, কাল সকালেই সব মজুত মাল বের

করে না দিলে তার মৃতদেহ খৈরির জলে ভাসবে। স্বয়ং রূপঠাকুরকে সামনে দেখে সে ভয় পেয়ে গেল। পরদিন থেকে তেলের অভাব আর থাকল না।

আমি ভাবলাম, এরকম আরো রবিদাসের সৃষ্টি করে দেশের সমস্যা সমাধানের কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দেব। হাজার রবিদাস মাঠে সোনা ফলাবে, গ্রাম সহর পরিষ্কার রাখবে। তারা বাঁধ তৈরি করবে, বাড়ি তৈরি করবে, রাস্তা তৈরি করবে। কিন্তু সব স্বপ্ন, সব কল্পনা চুরমার হয়ে গেল অল্পকালের মধ্যেই।

স্থানীয় এক ডাকাতের সর্দার একদিন রাত্তিরে চলমান রবিদাসকে দেখে ফেলল। রূপঠাকুরের সামনে পড়ে গিয়ে সে ভয় শিউরে উঠল। অবশ্য তার ভয়ের কোনো কারণ ছিল না। তাকে সামনে দেখলেও রবিদাস কিছু করত না। কারণ তার ব্রেন আদেশ পেয়েছিল একটা জমি চাষ করার। সে সেই কাজ করেই আমার কাছে ফিরে আসছিল। ডাকাত মঙ্গল দেও রবিদাসকে দেখল আমার বাংলোয় ঢুকতে। পরদিনই সে ত্রিনাথকে রাস্তায় একলা পেয়ে তাকে ধরে নিয়ে গেল। তাকে লোভ দেখিয়ে পারল না। অবশেষে নানারকম অত্যাচার করে তার কাছ থেকে রবিদাস কাহিনী জেনে নিল। তাকে আটকে রাখল নিজেদের আখড়ায়। ত্রিনাথ কিভাবে একটা ছোট ছেলেকে দিয়ে তার ভাষায় লেখা একটা চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দিল সব কথা আমাকে। যেখানে কাজ করতে হবে সেখানকার লোকের ভাষা না জানাটা আমি লজ্জার ব্যাপার মনে করতাম। কাজেই চিঠির বক্তব্য বুঝতে কোনো অসুবিধে হল না।

আগের দিন থেকে ত্রিনাথকে না দেখে চিন্তিত ছিলাম। এভাবে না বলে কার নিজের বাড়ি যায় না সে। চিঠি পেয়ে ডিউটি শেষ হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতাড়ি কোয়ার্টারের দিকে রওনা দিলাম। মঙ্গল ত্রিনাথকে নিয়ে আগেই বাড়িতে ঢুকেছিল। তারপর রবিদাসের সুইচ চালু করে কনট্রোল ট্র্যানসমিটারে আদেশ করল ত্রিনাথকে বেঁধে ফেলতে। রবিদাস তার হুকুম পালন করল। বিকট উল্লাসে মঙ্গল দেও লাফিয়ে উঠল। ঠিক সেই সময় আমি বাড়ি ঢুকলাম। আমাকে দেকেই মঙ্গল রবিদাসকে হুকুম করল, 'সাধু ডাক্তারকে হত্যা কর।'

ঘটনার আকস্মিকতায় আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু সেটা এক মুহূর্তের জন্য। সম্বিৎ ফিরে পেতেই পেছন ফিরে দৌড় লাগালাম। যদিও জানি বৃথা এ দৌড়। রবিদাস হুকুম পালন না হওয়া পর্যন্ত নিরস্ত হবে না। দেখলাম হরিণের মতো রবিদাস ছুটে আসছে। কিন্তু কোথায় যাচ্ছে সে? আমার দিকে তো আসছে না

আমি মোহনগড় থেকে পালিয়ে গা ঢাকা দিলাম। যেখানে এলাম সেখানে আমাকে কেউ চেনে না। তবুও লোকমুখে কানে এসেছিল মোহনগড়ের হোমিওপ্যাথি ডাক্তার সাধুচরণ পট্টনায়কের খুনের খবর। সাধু আমার প্রকৃত নাম নয়। এই লোকের দেওয়া নামই আমাকে বাঁচিয়ে দিল। হর্ষ ডাক্তারের নিখোঁজ হওয়ার খবরও রটে গিয়েছিল দু' একদিনের মধ্যেই। তবে আরেক জনের নিখোঁজ হওয়ার খবর রটতে দেরি হয়েছিল। তার বাড়ি থেকে খোঁজ করতে এলে তখনই সবাই জানল যে সে-ও নিখোঁজ। বেচারি ত্রিনাথ। তার খবর আর পেলাম না।

আমি যে বেঁচে আছি এটা মঙ্গল দেও নিশ্চয় জেনেছে। মোহনগড়ে ফেরা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কলকাতায় মামার বাড়ি ফিরে যাওয়া! কি কারণ দেখাব তাদের? পুলিশ যখন জেরা করবে তাদেরই বা কি উত্তর দেব? আমার আত্মগোপনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একজনের খুন আর একজনের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা। দাড়ি গোঁফের ছদ্মবেশে নিজেকে ঢেকে ফেলে মোহনগড়ের কাছেই কোনো জায়গায় দিন কাটাতে লাগলাম। শুনতে পেলাম, রবিদাসের নানা কীর্তি কলাপের খবর। বুঝলাম, মঙ্গল দেও রবিদাসকে তার আস্তানায় নিয়ে গিয়ে তাকে দিয়ে এসব কাজ করাচ্ছে। আমার সৃষ্টি এই সব জঘন্য কাজ করছে—এই চিন্তা আমার

ক্ষুধা তৃষ্ণা ঘুম কেড়ে নিল। এটাকে বন্ধ করতেই হবে, এই হল এখন আমার একমাত্র ধ্যান, একমাত্র লক্ষ্য।

অবশেষে আরেকটা ট্র্যানস্‌মিটার তৈরি করলাম। কিন্তু পরীক্ষা করব কী করে?

ট্র্যানস্‌মিটারটা ঠিকমতো কাজ করছে কিনা জানতে রোবটাকেই দরকার। তার মানে মঙ্গল দেওয়ের আস্তানায় ঢুকে রবিদাসের সুইচ চালু করা। কিন্তু সেটা যে অসম্ভবের চেয়েও বেশি!

অবশেষে একদিন ট্র্যানস্‌মিটারটা হাতে করে সাধুর বেশে মঙ্গল দেওয়ের গ্রাম বীরসাপুরে ঢুকলাম। তার বাড়ির কাছাকাছি এক গাছতলায় থাকি, 'ব্যোম্ ব্যোম্' করি আর আড়চোখে লক্ষ রাখি তার বাড়ির দিকে। অবশেষে একদিন রবিদাসকে দেখলাম। রাত্তিরে সে বেরিয়ে আসছে মঙ্গলের বাড়ি থেকে। হায়রে, না জানি কার সর্বনাশ করতে যাচ্ছে সে।

মুহূর্তে আমার ট্র্যানস্‌মিটারটা চালু করে দিয়ে মাউথ পিসে মুখ দিয়ে বললাম, 'রবিদাস থামো!'

বলার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে রক্ত যেন আনন্দে লাফিয়ে উঠল। দেখলাম, রবিদাস থেমেছে। আমার ট্র্যানস্‌মিটারের ফ্রিকোয়েন্সি তবে ঠিকই হয়েছে! এবার বললাম, 'রবিদাস, মঙ্গল দেওকে শেষ কর!'

রবিদাস ফিরে চলল মঙ্গলের বাড়ির দিকে। এত তাড়াতাড়ি রবিদাসকে ফিরতে দেখে মঙ্গল বোধ হয় একটু অবাকই হয়েছিল। তার ওপর রবিদাসের হাত খালি। কিন্তু সেই অবাক হওয়া বোধ হয় এক মুহূর্তের জন্য। তবে আগেই অ্যালুমিনিয়ামের পাতে মোড়া শক্ত হাতদুটো সজোরে বসে গেল তার কণ্ঠনালীর ওপর।

আমার আরেকটা আদেশ পেয়ে সে মঙ্গল দেওয়ের ঘর থেকে ট্র্যানস্‌মিটারটা হাতে নিয়ে আমার কাছে ফিরে এল। দাঁড়িয়ে থাকল পরবর্তী হুকুম দেওয়ার অথবা সুইচ অফ্ করে দেওয়ার অপেক্ষায়।

এবার আমি আমার মন স্থির করে ফেলেছি। জগতের মঙ্গলের জন্য কিছু বৈজ্ঞানিক যা সৃষ্টি করেন, সেটাকে দিয়ে অকল্যাণ সাধনের জন্যে আরো বেশি লোক সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। তাই সব সাধু উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়।

ভাগ্যিস আমি শত শত রবিদাস সৃষ্টি করি নি। তাহলে ভারতবর্ষ এতদিনে শ্মশান হয়ে যেত একদল শকুনের পায়ের তলায়।

আমি রবিদাসকে তার রোবট জীবনের শেষ আদেশ করলাম। হুকুম দিতে আমার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। রবিদাস তো আমারই সৃষ্টি, আমারই মানস সন্তান।

আমি বললাম, 'রবিদাস, এই দুটো ট্রানস্‌মিটারই তুমি নিয়ে গিয়ে নদীর জলে ফেলে দাও। তারপর নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেকে শেষ করে দাও।'

হুকুম তামিল করতে আনন্দে ডগমগ হরিণের মতন ছুটে চলল রবিদাস। নদী অনেক দূরে। ঝপাং করে একটা শব্দ হবে কিছুক্ষণ পরে, সেটা আমি আর শুনতে পাব না। তবে জানি, রবিদাসের অ্যালুমিনিয়াম মোড়া ভারি দেহটা নদীতে তলিয়ে যাবে। আর উঠবে না।

এবার মোহনগড়ে ফিরতে আমার আর বাধা নেই। কিন্তু কীভাবে ফিরব? হর্ষ ডাক্তার হয়ে ফিরে কী বলব? পাগল ভেবে আমার ডাক্তারি লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করবে। তার চেয়ে এই থাক। সাধুডাক্তার সাধু হয়েই জীবনটা কাটিয়ে দিক।

তফাৎ কিছুই নেই

করুণাময় বসু

রঘু আমার বাচ্চা চাকর, বছর বারো হবে,
বাপ-মা মরা, ঠিক মনে নেই আমার বাড়ি
বহাল হল কবে।
ছোট খাট ফাই ফরমাশ, টেবিল ঝাড়ামোছ,
দুধের বোতল দোকান থেকে নিয়ে আসা ডিউটি তাহার রোজ।
সেদিন অসাবধানে
কেমনতর মনের ভুলে বুঝি সেই তা জানে,
টেবিল থেকে ঠেলে
নকশাকাটা ফুলদানীটা ফেলল ভেঙে
মেজের উপর ফেলে।
বিষম ত্রাসে সংকোচের একশেষ,
রঘুর মুখে ভয়ের রেখা, ঠোঁটের কোণে
লজ্জা মাখা সরল হাসির একটু আছে রেশ।
শব্দ শুনে ঘুমের থেকে জেগে
হঠাৎ রেগে মেগে
গিন্নী বলেন, 'ঢের হয়েছে, কালকে তোমার পাওনা নিও বুঝে,
দোর খুললেই সোজা রাস্তা,
তোমার রাস্তা নিজেই নেবে খুঁজে।'

রঘু যেন কেমন ভ্যাবাচ্যাকা,
গিন্নী বল্লেন, 'দেখছো কেমন ন্যাকা,
সবই বোঝে, তবু দেখ বোকার মত সেজে,
রাম চালাকি জানাই আছে, হাড়বজ্জাৎ এ যে।'
হেসে বলি 'তোমার ছেলে বাবলুসোনা বছর চোদ্দ হবে,
গন্ধ তেলের ভরা শিশি আছাড় মেরে ফেলল ভেঙে
এই তো সেদিন, তবে ?'
উলটিয়ে ঠোঁট গিন্নী বলেন, 'তুলনাটা কিসের সঙ্গে কিসে,
অমাবস্যায় পূর্ণিমাতে, সোনায় এবং সীসে।
বাবলু সোনা প্রভুর ছেলে, রঘু চাকর, তফাৎ অনেক তফাৎ,
জন্ম, ভাগ্য মানতে হবে, সব কিছুতেই ঈশ্বরেরই হাত।
চড়িয়ে গলা বলি তখন, 'তফাৎ, কেবল তফাৎ,
বর্ণভেদে, জাতিভেদে, বংশ ভেদে সবই আছে,
মানুষ এবং ঈশ্বর শুধু বাদ।
আমার কাছে মানুষ মানুষ, সবই আপন,
বন্ধু, দোসর, কেউ নয় তো পরগো,
এই কথাটি বুঝবে যখন, সেদিন তুমি গড়বে মনে
ভালোবাসায় ভরা সুধার স্বর্গ।
বাবলু, রঘু বাচ্চা ছেলে, বয়স একই, তফাৎ কিছুই নেই
তফাৎ শুধু বানিয়ে তোলা মনে মনে,
ভুলটা এইখানেই।
কাল বিকেলে অফিস থেকে ফিরে
ফুলদানী এক আনব কিনে, হোক না যতই ভিড়ে।'
ভুরু কুঁচকে অল্প হেসে গিন্নী বলেন,
'থাকুক তবে রঘু,
মনে কিছু করিস নাকো, যা বলেছি বাছা আমার,
একটু গুরু লঘু।'
হাস্য মুখে রঘু বারম্বার
গড় হয়ে সে গিন্নীমাকে করল নমস্কার।

প্রণব মুখোপাধ্যায়

ছুটি

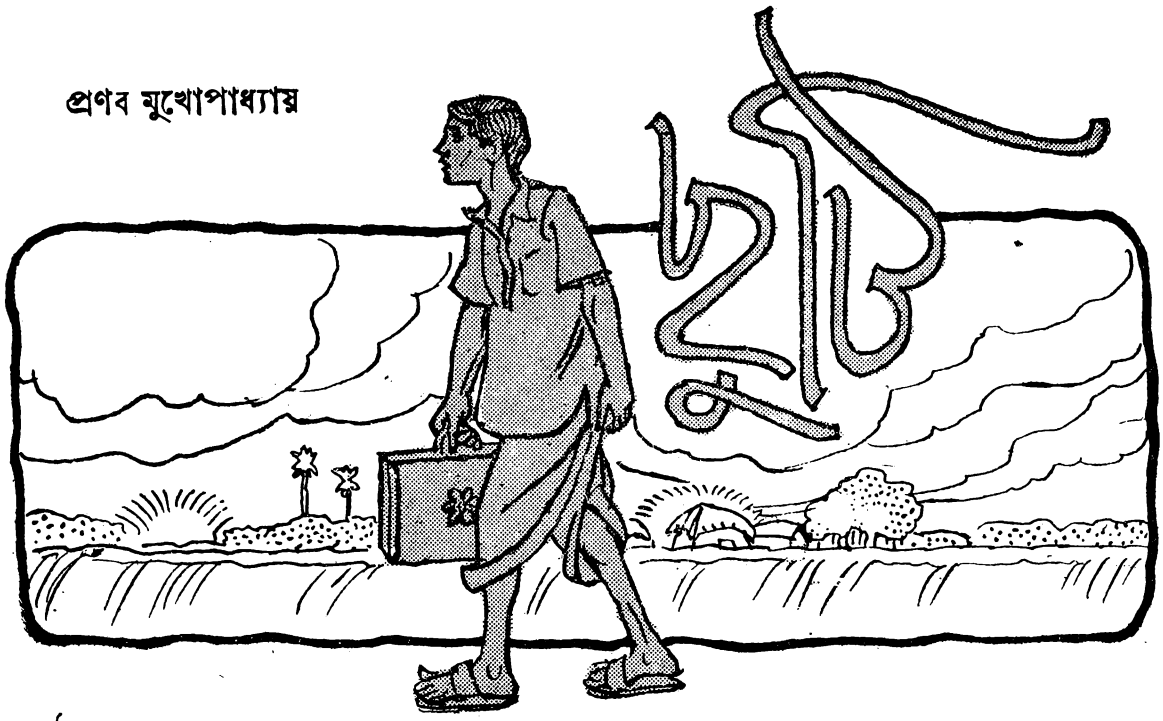

নৈনিতাল, মুসৌরি, দার্জিলিঙ, সিমলা, উটি—কত আলাপ কত আলোচনা। সকালে চায়ের কাপে, দুপুরে মাংসের ঝোলে, রাত্তিরে লুচিছক্কায় শুধু প্ল্যান আর প্ল্যান। রোদ্দুরটা এত দিনে নরম হচ্ছে, আকাশ গাঢ় নীল, স্কুল কলেজ অফিস আদালতে ছুটির নোটিস।

বড়বাবু চললেন ফের সেই মেঘরাজ্যে, পাহাড় আর পাইনবনের দেশে, জামাই বাড়ি।

ছোটসাহেব তাই শুনে নাক কুঁচকে বললেন, ফের সেই হিল স্টেশন? উঃ, এতবার কি করে যে তোমার ভাল লাগে বড়দা। আমার তবে ঐ ঠিক রইল, মিস্টার সেনের সঙ্গে রামবাগে মিট্ করে ওর জীপে করে জয়সলমীর।

সেজবাবু যোগীপুরুষের মত চোখ মুদে বললেন আমি বাপু রাণীক্ষেত। ত্রিশূলের যা রূপ।

আর বৃন্দাবন। সে যাবে কোথায়, কার সঙ্গে? এও এক সমস্যা। বড়কত্তার কোমরে ব্যথা, টেপাটেপির লোক দরকার। যদিও জামাই বাড়ি লোকজনের অভাব নেই, তবু বিন্দেকে নিলে ভালই হত।

মেজবাবুর সঙ্গে চলেছেন তাঁর শালা। শালার ছেলেটা বড় দুরন্ত। ওটাকে সামলাতে একটা লোকের দরকার। বিন্দেকে পেলে ভালই হয়।

ছোট সাহেব দুখচেটে লোক। বললেন, 'আমি কারো তোয়াক্কা করি না। কন্টিনেন্ট ঘুরলাম একা লাগেজ বয়ে। তবে এবার অফিসের দুই বন্ধু জুটেছে, লাগেজ একটু বেশি। বইবার একটা লোক পেলে মন্দ হত না।'

কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে বৃন্দাবনকে, শিলং না রাণীক্ষেত না রাজস্থান? ছোট সাহেব বললেন, 'ভেবে দেখ বিন্দে, কোথায় তোর পছন্দ।'

সেজবাবু বললেন, 'বিছানাপত্তর ঠিক আছে ত? আর শীতের সোয়েটার? গত বছরেরটা আছে না গেছে?'

বৃন্দাবন মাথা হেঁট করে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মুখ না তুলেই বলে, 'আমায় এবার ছুটি দেননা বাবুরা, একটু দেশে যাই।'

'সকলে অবাক।' সে কি রে? এমন বেড়াবার সুযোগ ছেড়ে পাড়া গাঁয়ে?

বড় কত্তা বললেন, 'এই তো সেদিন গেলি বিন্দে, আবার না হয় সামনের গ্রীষ্মে যাস। এখন গিয়ে এমন ছুটিটা মাটি করিস না।'

তবু বৃন্দাবনের চোখে ভেসে থাকে একটা বিরাট নীল দিগন্ত, কানে বাজে দূর থেকে ভেসে আসা ঢাকের বোল।

কোথা দিয়ে কি যে হয়ে গেল। বড় কত্তার গা টেপার লোক জুটল তাঁর গিন্নির বাপের বাড়ির লোক সর্বেশ্বর। চোখে কম দেখে। তা হোক। বিন্দের মত উড়ু উড়ু নয়। সর্বক্ষণ ঘরে দোরে থাকে। সেজকত্তার শালার ছেলে ফর্সাটর্সা লোক ছাড়া ঘেঁসেই না। অচেনা কালোকোলো লোক চলবেই না। ঠিক হল বৃন্দাবনকে কারোরই সঙ্গে নেবার দরকার নেই। বাড়তি ঝামেলা, খরচও বেশি।

তারপর আর কি। একটা টিনের সুটকেশ, বর্ধমান লোকালের উধাও ছুট, সেই টেলিগ্রাফের তারে ফিঙের দোলা, সেই কাশফুল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আদিগন্ত ফসলের প্রান্তর। ট্রেন থেকে নেমে আলের পথ ধরে ছুটল বৃন্দাবন। মাথার ওপর শব্দ করে উড়ে যায় এক ঝাঁক টিয়া। বৃন্দাবন থমকে দাঁড়ায়। হু হু করে কোত্থেকে একটা বাতাস এসে ফসলের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ঢেউ তুলে দিয়ে চলে যায়। বৃন্দাবন চলতে থাকে।

নিতাই গোস্বামীর আটচালা। সার সার মূর্তি সাজান। তুলির শেষ ছোঁয়া লাগাচ্ছে সেই বুড়ো হরিপদ। বয়সের ভারে আরো নুয়ে পড়েছে, চশমাটা ঠেকে রয়েছে নাকের ডগায়, কপালে ঘামের বিন্দু।

আরে বৃন্দাবন যে, কতকাল পরে!

হ্যাঁগো খুড়ো, এবারে ছুটি পেয়েছি। সবুর কর, ঘরে দেখা দিয়ে আসি।

একটা ছোট্ট মাটির ঘর একটুখানি ছোট্ট ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে নিকোনো উঠোন। কয়েকটা কালো কালো ছোট্ট ছোট্ট ভাই বোন, এক বিধবার সাদা আঁচল ছেড়ে হৈ হৈ করে ছুটে এল—দাদা এসেছে দাদা এসেছে।

আর একটু পরেই নিতাই গোস্বামীর আটচালাতেও আনন্দের একটা ঢেউ বয়ে যায়—বৃন্দাবন এসেছে! সেই বৃন্দাবন যে ছোট্ট বেলা থেকেই কেমন মায়ের মুখ আঁকতে পারত। ঠাকুর গড়া, রং করা হয়ে গেলে সে মায়ের চোখে শেষ তুলির টান দিত। লোকে দেখে বলত, আহা মায়ের মুখটা দেখ। আর আজ সেই বৃন্দাবন শহুরে হয়ে গেছে। আসতেই চায় না।

বুড়ো হরিহরের হাত থেকে তুলি নিয়ে বিন্দে মায়ের চোখ আঁকতে বসে গেল।

উপকার

কুমারেশ ঘোষ

একুশ বছরের বীর বালক আলেকজাণ্ডারের প্রতাপে গ্রীস তখন থরহরি কম্প। সবাই বিস্মিত। বিদ্রোহীরা আতংকিত। শত্রুরাও তখন মিত্রের ছদ্মবেশে আলেকজান্দারের স্তব-স্তুতি গাইতে শুরু করলো।

গ্রীসের রাজধানী এথেন্সের কাছেই করিন্থ-এ এক মহাসভার অধিবেশন হলো। আলেকজাণ্ডারই এই সভার অধিনায়ক।

সেই সভায় উপস্থিত হলেন গ্রীসের প্রত্যেক রাজ্যের প্রধান ব্যাক্তিরা। বহু দার্শনিক পণ্ডিত এবং রাজনীতিবিদরাও এসে অভিবাদন করলেন মহাবীর আলেকজাণ্ডারকে।

আলেকজাণ্ডার সমস্ত গ্রীসের প্রধান সেনাপতিরূপে মনোনীত হলেন।

চারিদিকে জয়জয়কার পড়ে গেল!

কিন্তু আশ্চর্য, একজন আলেকজাণ্ডারের ঐ অভ্যর্থনাসভায় উপস্থিত হলেন না। অথচ তিনি করিন্থএর উপকণ্ঠেই থাকেন। তবু তিনি ঐ সভায় গেলেন না বা যাওয়ার দরকার মনে করলেন না।

কিংবা এও হতে পারে ঐ সভায় যে তাঁর যাওয়া উচিত এবং না গেলে তাঁর ক্ষতি হতে পারে, সেকথা তাঁর মনেই হলো না।

তিনি হলেন সাধু ডায়োজিনিস। দার্শনিক পণ্ডিত।

আলেকজাণ্ডার আশা করেছিলেন, পণ্ডিত ডায়োজিনিসও তাঁর সভায় উপস্থিত হবেন। কিন্তু তিনি পণ্ডিতকে দেখতে পেলেন না।

'সভা শেষ হয়ে গেলে তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ সঙ্গীকে বললেন, 'সবাই তো এলেন সভায়, কিন্তু পণ্ডিত ডায়োজিনিসকে দেখলাম না তো? কী ব্যাপার।'

'আমরাও তো তাই ভাবছি!' —প্রায় সমস্বরে বললেন সবাই

আর মনে মনে ভাবলেন, এবার পণ্ডিতের দফা রফা। পণ্ডিতের পিণ্ডি চটকাবে এবার। হয়তো মুণ্ডুটাই—

আলেকজাণ্ডার বললেন, 'চলো তো দেখে আসি, কী ব্যাপার!'

আলেকজাণ্ডার সঙ্গীদের নিয়ে চললেন করিন্থ-এর কাছে ডায়োজিনিস-এর কুটিরে।

তখন শীতকাল।

আলেকজাণ্ডার গিয়ে দেখলেন ডায়োজিনিস উঠোনে রোদ্রে বসে তেল মাখচেন।

আলেকজাণ্ডার ডায়োজিনিস-এর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ডায়োজিনিস জিগ্যেস করলেন, 'তুমি কে ?'

সঙ্গে সঙ্গে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গীরা বলে উঠলো, 'চেনেন না ওঁকে ? কী আশ্চর্য ! ইনিই হচ্চেন মহাবীর আলেজাণ্ডার !'

'অ।' —ডায়োজিনিস বললেন, 'তা কি উদ্দেশ্যে আগমন ?'

এবার আলেকজাণ্ডার বললেন, 'আমি আশা করেছিলাম, আপনি আমার সভায় আসবেন।'

'কেন ? কোন দরকার ছিল কি ? আমার তো মনে হয়েছিল তাহলে কেউ এসে আমাকে ডেকে নিয়ে যাবে,' বললেন ডায়োজিনিস।

আলেকজান্দার দেখলেন, সাধু ও সরল প্রকৃতির পণ্ডিত ডায়োজিনিস ঠিক কথাই বলেছেন।

কিন্তু সঙ্গীরা ভয় পেয়ে বললো তাঁকে, 'তার মানে,আপনাকে কি মাথায় করে নিয়ে যাবার কথা ভেবে ছিলেন !'

'চুপ করো !' তাদের ধমক দিলেন আলেকজাণ্ডার।

ডায়োজিনিসকে বললে, 'আপনি কিছু মনে করবেন না। আমারই ভুল হয়েছিলো। এখন আমি জানতে ইচ্ছা করি, আমি আপনার কী উপকার করতে পারি ?'

'উপকার ?' ডায়োজিনিস হাসলেন। 'তবে বাপু এক কাজ করো। একটু সরে দাঁড়াও। যাতে গায়ে রোদ্দুরটা পাই।'

ও, তাইতো। ছায়া পড়েছে পণ্ডিতের গায়ে। আলেকজাণ্ডার তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়িয়ে বললেন 'এবার বলুন কী করতে পারি ?'

'ঐ তো করলে উপকার ! আর কিছু দরকার নেই আমার।' ডায়োজিনিস তেল মাখতে লাগলেন।

'আচ্ছা চলি তবে।' আলেকজাণ্ডার অভিবাদন জানিয়ে সঙ্গীদের নিয়ে বেরিয়ে এলেন ডায়োজিনিসের বাড়ি থেকে।

বাইরে এসে বললেন, 'আমি রাজ্যর লোভে ঘুরে বেড়াচ্চি, আর ঐ সাধুর কোন লোভই নেই। আশ্চর্য আমি আলেকজাণ্ডার না হয়ে ডায়োজিনিস হতে পারতাম যদি !'

আলেকজাণ্ডার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

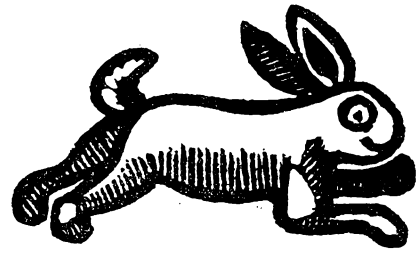

পিঁপড়ে রাণীর সিংহাসন

গৌরী ধর্মপাল

এক পুকুরের ধারে এক ডুমুরগাছ। তার তলায় মাটির নিচে পিঁপড়ে-রাণীর রাজ্য। ডুমুরের তলায় একটি মাটির ঢিপি, সেইটে পিঁপড়ে-রাণীর সিংহাসন। দিনমানে রাণী রাজ্য সামলায়। বিকেল হলে সিংহাসনে লালটুকটুক তরুলতা ফুল বিছিয়ে দেয় পিঁপড়েরা, তার ওপর বসে বসে রাণী বিচার করে। একবার দোষ করলে রাণী একটু হেসে 'খবরদার, আর করবি না' বলে ছেড়ে দেয়। দুবার করলে চোক দিয়ে বকে। তিনবার করলে হুঙ্কার দেয়। চারবারে মারে। পাঁচবারে একঘরে করে। ছবারের বার খাওয়া বন্ধ, নাকখত, একলা-ঘরে বন্দী। আর সাত বারে ডুমুর গাছের সঙ্গে ব্যাবোস্তা করা আছে, গাছ একটি ডুমুর ফেলে দেয় কাঁটার কাঠগড়ার সামনে ঠিক দুষ্টু পিঁপড়ের মাথার ওপর। ব্যস্।

এমনি করেই চলছে। পিঁপড়ে-রাণীর রাজ্যে এতটুকু বিশৃঙ্খলা নেই। ডিমেরা যত্ন পায়, বাচ্চারা আদর পায়, পোয়াল ভর্তি মিষ্টিরসের পোকা, খেতভর্তি ফসল, ভাঁড়ার ভর্তি খাবার। সব ভাগে ভাগে সাজানো গোছানো। আজকেরটা, কালকেরটা, হেমন্তেরটা, শীতেরটা। আর খাবার যোগাড় করে আনা—সে তো চলছেই অনবরত। সাত সকালেই শয়ে শয়ে পিঁপড়ে সার বেঁধে বেরিয়ে পড়ে। কোনো সার ক্ষেতের দিকে, কোনো সার চাষীর গোলার দিকে, কোনো সার মুদির দোকান, কোনো সার

লোডশেডিং-এর ফাঁকে হিমঘর, কোনো সার গেরস্তর ভাঁড়ার, কোনো সার বা মরা পোকা পাখি আরশুলা টিকটিকি গিরগিটির সন্ধানে।

মানুষের বেলায় মা-রাণীর কড়া হুকুম—এমন করে নিবি, যেন তুই মৌমাছি, ফুলের থেকে মধু নিচ্ছিস। ফুলটি যেমন কে-তেমন থেকে গেল, তুইও মধু পেয়ে গেলি। খবরদার, গেরস্তর ক্ষতি না হয়। কেননা তাতে শেষ পর্যন্ত তো আমাদেরই ক্ষতি। ফ্লিট ফিনিট কেরোসিন ফিনাইল বাইগন টাইগনের ধাক্কায় অন্ধকার। আর দেখিস যেন ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে মুখ দিস্‌নি গুড়ে-ভাঁড়ে। কেউ যেন না বলে, এইরে পিঁপড়ে ধরেছে। কাজ সারবি চুপিসারে। যা নেবার চটপট নিয়ে দেয়াল ঘেঁষে ঐ দিকে মুখ করে চলে আসবি, যেন দেয়ালের ছবি দেখছিস। অত বাহার দিয়ে মেঝে জুড়ে আসবার দরকারটা কি ?

তাই তাই। মা-রাণীর কথামত কাজ চলে। চোদ্দ গাঁ, একুশ দোকান, ঊনপঞ্চাশ গোলা, সাতশো ভাঁড়ার ঘোরাঘুরি করে পিঁপড়েরা খাবার আনে, ভাঁড়ার ভরে, পিঁপড়ানীমার রাজ্য বাড়ে, প্রজা বাড়ে সম্পত্তি বাড়ে।

একদিন হাজার-পিঁপড়ের এক দলের বড় সর্দার করেছে কি—

চোদ্দগাঁয়ের সেরা গাঁ ধানসুপুরি, ধানসুপুরির সেরা চাষী তালফুলুরি, তালফুলুরির আটচালা বাড়ির প্রকাণ্ড উঠোনে তুলসীমঞ্জরী ধানের এক ভারী বাহারি মরাই—সেই মরাইতে, মা-রাণীর আজ্ঞে-আইন লঙ্ঘন করে, সোম মঙ্গল দুদিন পর পর সিঁদ কেটে ধান নিয়ে এল। ছোট সর্দার আপত্তি করলে। শুনলে না। বললে, উঁহু, একবার যখন সোয়াদ পেয়েছি, তখন অন্য ধানে আমি ইহজন্মে আর মুখ দিতে পারব না। ছোট সর্দার ফিরে এসে মা-রাণীকে বলে দিলে। মা রাণী বল্লেন বলিস কিরে!

বিকেলবেলা ছোটসর্দার বাদে বাকি ৯৯৯ পিঁপড়ের বিচার হল। মা-রাণী সাবধান করে দিলেন, খবরদার, আর ভুলেও ওদিক মাড়াবি না। তালফুলুরি সাংঘাতিক লোক, জানতে পারলে রক্ষে রাখবে না।

বড়-সর্দার চুপিচুপি দলের পিঁপড়েদের বললে, সাতবারের বার তো ডুমুর-চাপা? এখনো ঢের সময় আছে। ইতিমধ্যে তোরা কজন কাঠগড়ার তলায় সুড়ঙ্গ খুঁড়ে রাখ ডুমুর পড়ার আগেই আমরা পালাব।

৯৯৯ পিঁপড়ের দল ধানসুপুরি গাঁয় গিয়ে তালফুলুরি চাষীর বাড়ি তুলসীমঞ্জরীর মরাইয়ে সিঁধ কাটল বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার, রবিবার। আবার সোমবার।

জামাই-ষষ্ঠী এসে পড়েছে। মরাই থেকে ধান বের করতে গিয়ে তালফুলুরির চক্ষু স্থির! পিঁপড়ে! এত ভাল দামী ধান এত ঝেড়ে ঝুড়ে রাখা, সেই পিঁপড়ে! দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা।

বিকেলবেলা। সিংহাসনে বসে আছেন পিঁপড়ে-রাণী। চোখ জ্বলছে। পিঁপড়েরা সব কাঠ গড়ার সামনে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ দূরে শোনা গেল হৈ হৈ রৈ রৈ।

রাণী একবার তাকিয়েই বললেন, ঐ তালফুলুরি আসছে লোকলস্কর নিয়ে। সোনার বাছারা যে

যেখানে আছ, একটি করে বাচ্চা মুখে নিয়ে চলে এসো।

নিমেষের মধ্যে হাজার হাজার পিঁপড়ে এসে জড় হল সিংহাসনে।

রাণী বললেন, সিংহাসন, ওড়ো তো।

সঙ্গে সঙ্গে পিঁপড়ের মত দেখতে বড় বড় পঞ্চাশজোড়া পাখা মেলে আকাশ দিয়ে উড়ে গেল পিঁপড়ে রাণীর উড়ুক্কু সিংহাসন।

হাঁ করে দেখতে গিয়ে গাছ ডুমুর ফেলতে ভুলে গেল। সর্দার পিঁপড়ে আর তার দলবল সুড়ঙ্গে লুকোতে ভুলে গেল। তালফুলুরি এসে তাদের মেরে বাসা তছনছ করে দিয়ে চলে গেল।

পিঁপড়ে-রাণী আর এক জঙ্গলে নেমে নতুন রাজ্য গড়লেন।

রাজা

দেবী চৌধুরী

বাবার সিমলায় কর্মক্ষেত্র ছিল। আমার সাত আট বছর বয়স পর্যন্ত সিমলায় কেটেছে। এক নাগাড়ে কাটেনি। শীতের সময় বাবার ছুটি হতো, অফিস দিল্লীতে চলে আসতো। শীতে সেই ছুটির সময় কলকাতায় আসতাম মাঝে মাঝে। শীতের দুমাস ছুটি পেতেন, তবে সব ছুটিতে আসা হতো না। আমরা নিজেরা ভাই বোন বারোজন। ছয় ভাই, ছয় বোন। আমি মেয়েদের মধ্যে পঞ্চম। আমার পরে চার ভাই, তারপরে এক বোন। বোনের পরে আরো দুই ভাই।

কাশী, বৃন্দাবন এবং অন্যান্য জায়গায় যেমন বানরের উৎপাত শুনি, সিমলায় কিন্তু সেরকম দেখি নি। যদিও ছোট ছোট বানরেরা, বাড়িতে ঢুকে তরী তরকারী ইত্যাদি নিয়ে যেত, তাতে বিশেষ কারো ক্ষতি হতো না। বাচ্চাদের কিছু বলত না, তাদের সঙ্গে খেলা পর্যন্ত করত। একদিনের কথা বলছি। মা সংসারের কাজে ব্যস্ত, আমিও মার পেছু পেছু ঘুরছি, মা বল্লেন, 'যা তো দেখে আয় নিমু কি করছে, তার সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।' নিমু আমার মেজো ভাই, তখন তার বয়স বছর দেড় হবে আমি দৌড়ে এসে ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে দেখি, আলনার তলায় যে সব জুতো সাজানো আছে, সেই জুতো গুলো নিয়ে, ও আর একটা বানরছানা খেলা করছে, ঠিক বল খেলার মতো। ছোঁড়াছুড়িটা করছে খুব আস্তে। আমার ভয় হলো, যদি নিমুকে আঁচড়ে কামড়ে দেয়। তাড়াতাড়ি মাকে এসে বল্লাম-'মা-মা নিমু একটা বাঁদর বাচ্চার সঙ্গে খেলা করছে।' মা বল্লেন, 'তুই আর ওদিকে যাসনি; ওরা বাচ্চাদের কিছু বলে না।'

সিমলায় লক্কড় বাজার বলে একটা জায়গা আছে, প্রথমে আমরা ঐ জায়গায় থাকতাম। একবার ওখানে একটা বিষম কাণ্ড হয়েছিল। সেবার আমাদের পুনর্জন্ম হয়েছিল, বিশেষ করে, বাবা, বড়দা, আর দুজন লোক সিধু আর গণেশ—এদের। বড়দা আমার পিসতুত ভাই, মেজপিসিমার বড় ছেলে। বৌদিও ছিলেন।

সেদিনের ঘটনা মনে পড়লে এখনও গায় কাঁটা দেয়। ওখানকার দরজা জানালার ওপরদিকে কাঁচ দেওয়া থাকে, যাতে আলো পড়লে দেখা যায়। রান্নাঘরের উপরটা তিনদিকই কাঁচ দিয়ে ঘেরা। সেই কাঁচের একজায়গা খানিকটা ভেঙে গিয়েছিল। আগের দিনে বিকেলে একটা বানরছানা ঐ ভাঙা কাঁচের মাঝখানে আটকে পড়েছিল। বোধ হয় বেচারা রান্নাঘরে ঢোকার তালে ছিল, তাতেই এই বিপত্তি। বাড়ির লোকেরা অত গ্রাহ্য করেনি, মনে করেছিল আপনিই ছাড়া পাবে। ও নিয়ে কেউ মাথাই ঘামায়নি।

আমাদের লক্কড়বাজারের বাড়িটার একটু বর্ণনা দি, তা নইলে বোঝানো যাবে না। রাস্তার দিকে বারান্দা। দুদিকে দুটো ঘর মাঝখানে প্যাসেজ। দুটো ঘর এক প্যাসেজ এই নিয়ে বারান্দা। প্যাসেজের মুখে একটা দরজা। ভেতরের দিকে সোজা চলে গিয়ে, যেখানে প্যাসেজ শেষ হয়েছে সেখানেও একটা দরজা। এই দরজাটা খুললে একটা চাতাল, চাতালের ওদিকে রান্নাঘর আর ভাঁড়ার ঘর। প্যাসেজের দরজা খুলে চাতাল, তার বাঁ দিকে সিঁড়ি এসে শেষ হয়েছে। রান্নাঘর বা ভাঁড়ার ঘর থেকে বেরোলে সিঁড়িটা ডানদিকে পড়ে। সিঁড়িটা একতলার সদর পর্যন্ত পৌঁছেচে। নিচের তলায় আরো একটা পরিবার থাকতো। তাঁরাও বাঙালী। দোতলার পাশেও এক পাঞ্জাবী পরিবার

থাকতেন, তাঁরা বাঙালীই হয়ে গিয়েছিলেন। যাক্। সেদিনের বিপদের কথাটা বলি—বেলা ৮ কি ৮॥০ হবে, আমি আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, কিছু দেখছি কি দেখছি না। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, রাস্তার অপরদিকে নানারকম খেলনা পুতুলের দোকান। আরো কিসের দোকান ছিল মনে নেই।

হঠাৎ দেখি দুমদাম শব্দে দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। রাস্তার দিকে চেয়ে দেখি মানুষজন কেউ নেই, শুধু শয়ে শয়ে ছোট বড় নানা আকারের বানর সৈন্য। আমি তাড়াতাড়ি পিছন দিকে চেয়ে দেখি প্যাসেজের অপর প্রান্তে বানরদের রাজা ও রাণী একজন রান্নাঘরের দরজা ঠেলছে, একজন ভাঁড়ারঘরের দরজা ঠেলছে, পেছনে অসংখ্য বানরসৈন্য। রাস্তা থেকে সিঁড়ি থেকে চাতালভর্তি। রাজারাণীর সঙ্গে অন্যান্য বানররাও যোগ দিয়েছে। লিখতে যত সময় লাগলো, দেখতে এক নিমেষ লেগেছিল। ইতিমধ্যে বৌদি কাঁদতে কাঁদতে আমার প্যাসেজে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে, দৌড়ে রান্নাঘরের দিকে যে দরজাটা আছে সেটাও বন্ধ করে দিলেন। তারপর মার কাছে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি মা অঝোরে কাঁদছেন আর ভগবানকে ডাকছেন। বৌদিও কাঁদছেন। আমি কিছুই বুঝলাম না, কেন অত বানর এসেছে, কেন তারা দরজা ঠেলচে, রাজারাণীই বা কেন এসেছে! কিছু না বুঝেও সকলের কান্না দেখে আমিও কাঁদতে লাগলুম। তবে অবচেতন মনে এও মনে হলো একটা কিছু হতে চলেছে।

এরকম অবস্থা কতক্ষণ চলেছিল জানিনা, বিপদের ক্ষণ বড় দীর্ঘ মনে হয়। এখন মনে হয় ১৫ কি ২০ মিনিটের বেশী নয়। কারণ তার বেশি হলে ওঁরা বানরদের হাতে ছিন্নভিন্ন হতেন, আর বোঝবার ক্ষমতাও ছিল না। একসময় রান্নাঘরের দিকে প্যাসেজের

দরজায় দমাদম শব্দ হতে লাগল, মা ও বৌদি আরও জোরে কাঁদতে লাগলেন। শেষে বাবা ও বড়দার গলা শোনা গেল, 'দরজা খোল, শীগগির দরজা খোল।' তখন এঁরা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলেন। ওঁদের সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রচুর ঘাম ঝরছে, কাজের লোক দুটির ওই একই অবস্থা।

কেউ তো বুঝতেই পারেননি ব্যাপারটা কি! ওঁরা অফিস যাবেন, খেতে বসেছেন সবেমাত্র, এবং কি যেন নিতে শোবার ঘরে মা এসেছেন, ইতিমধ্যে বানর-বাহিনীর আক্রমণ। কাজের লোকদুটি রান্নাঘরেই ঘোরাফেরা করছে, এই সময় রাজরাণীকে দেখেই দরজা বন্ধ করতে গেছে, তার চেঁচানীতে বাবা ও বড়দা ততক্ষণে দেখতে পেয়ে লাফিয়ে উঠে দরজা বন্ধ করতে এসেছেন। বাবা ও বড়দা ও পাহাড়ী লোক দুটি খুব জোয়ান। ওঁরা কিছুতেই দরজার খিল আটকাতে পারেন নি। পরে বোঝা গেল ঐ বানরছানাটির জন্যে এত কাণ্ড। কি ভাগ্য বানরছানাটা তো নিজেকে ছাড়াবার জন্যে চেষ্টা করেই চলেছে, করতে করতে টুক করে বেরিয়ে পড়েছে। বানরছানাটা ছাড়া পেতেই অত বানর সৈন্য নিমেষে উধাও। ওরা মনে করেছিল মানুষেরাই বুঝি ছানাটাকে বন্দী করেছে। নিজেরা না ছাড়াতে পেরে, রাজারাণীর কাছে নালিশ করেছে। রাজরাণীও প্রজার বিপদে ছুটে এসেছে। ছানাটা যদি ছাড়া না পেত তাহলে যা হতো ভেবে এখনও শিউরে উঠি। বানরদের রাজরাণীর যা ব্যক্তিত্ব। রাজা তো রাজা, রাণী তো রাণী। তারা সহজে লোকালয়ে আসে না। প্রজাদের বিপদ আপদে বোধ হয় তারা দেখা দেয়। এর বাড়ি ওর বাড়ি ঢুকে জিনিস নিতে কখনও শোনা যায়নি, দেখাও যায় নি।

একদিন বারান্দায় ওদিকের দোকান রাস্তা খেলনা পুতুল দেখছি। বারান্দায় যেখানে কার্নিশ থাকে, সেই জায়গাটা কার্নিশের বদলে টিনের ছাউনি দেওয়া, ছাতও ওই রকম। এখানকার মতো সমতল ছাত নয়। বরফ পড়ে বলে ওইরকম ছাত। বরফ ঝরে পড়ে যায়।

দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় দেখি রাজা আসছেন। রাজা তো রাজকীয় ভঙ্গী। আমাকে পার হয়ে যাবার সময় দুবার ঘাড় ফিরিয়ে রাজকীয় ভঙ্গীতে দেখে চলে গেল। সেই দৃষ্টিভঙ্গী আমাকে স্তব্ধ করে দিল। আমার নড়াচড়ার বা কোন শব্দ করার মত শক্তি ছিল না। কয়েক মিনিট নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে ছিল।

ঘরের জানালা দিয়ে বৌদি দেখতে পেয়েছেন, রাজা গেল, আর আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। রাজা চলে যাবার পর বৌদি ছুটে এলেন, বললেন, 'রাজা গেল না?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ' তখন ভাল করে কথা বলতে পারছিনা। বৌদি বললেন, 'রাজাকে দেখে তুই একা দাঁড়িয়ে রইলি, এ্যাঁ! পালিয়ে আসতে পারলি না! যদি তোকে চড় মারতো!' বলে আমার হাত ধরে টেনে এনে বারান্দার দরজা বন্ধ করে মার কাছে নিয়ে এসে বললেন, 'মাইমা, দেবীর এত সাহস, রাজা গেল আর ও একা দাঁড়িয়ে রইল। যদি চড় মারতো কি হতো বলুন তো?' মা বললেন 'সে কীরে। তুই দাঁড়িয়ে রইলি?' আমি বললাম, 'রাজাকে দেখে আমি নড়তেই পারলুম না।' মা নিজের মনেই বললেন, 'রাজা বা রাণী যখন তখন তো আসে না। ওরা শুধু শুধু কাউকে কিছু বলে না, দেখলে না সেবারে যেই বাচ্চাটা ছাড়া পেল, অমনি সব দলবল নিয়ে নিমেষে চলে গেল। এতটুকু কোন ক্ষতি করেনি।'

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

ঘোড়ায় চেপে কত খেলা

গৃহপালিত প্রাণী হিসেবে ঘোড়াকে প্রথম পোষ মানিয়েছিল প্রাচীন মেসোপোটেমিয়ার (একালের ইরাক) অধিবাসীরা; খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় দু'হাজার বছর আগে। অবশ্য ভারত-বিদ্যা বিশারদ অধ্যাপক ব্যাশম (Basham) মনে করেন, বালুচিস্তানের রানা ঘুণ্ডাই অঞ্চলে খ্রীষ্ট জন্মের ৩০০০ বছর আগে যে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল সেই সভ্যতায়ও গৃহপালিত পশু রূপে বন্য ঘোড়াকে কাজে লাগানো হয়েছিল; কারণ ঐ অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খোঁড়াখুঁড়ি চালিয়ে যে সব জিনিস পাওয়া গেছে তার মধ্যে মহিষের শিং, অস্থির সঙ্গে ঘোড়ার দাঁতও আছে। ব্যাশম মনে করেন রানা ঘুণ্ডাইএর সভ্যতা হরপ্পার সভ্যতার প্রায় সম-সাময়িক, আর্যেরা ভারতে আসার আগে একদল অশ্বারোহী যাযাবর মানুষ ঐ অঞ্চলে আস্তানা গেড়েছিল; তাদের হাতেই ঘোড়া প্রথম পোষ মানে; ব্যাশম, তাঁর বিখ্যাত বই 'দি ওয়াণ্ডার দ্যাট ওয়াজ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে ঐ বিষয়ে তারও আলোচনা করেছেন।

তবে ঘোড় সওয়ারের সবচেয়ে পুরানো মূর্তিটি পাওয়া গেছে আনাতোলিয়ার (খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ অব্দে গড়া) মূর্তিটি সম্ভবতঃ কোন যোদ্ধার।

অবশ্য প্রায় আড়াই / তিন হাজার বছর আগে লেখা 'ঋকবেদে' ঘোড়ার, রথের, অশ্বমেধ যজ্ঞের নানা রকম বিবরণ পাওয়া যায়। তবে বৈদিক যুগে প্রধানতঃ রথ টানার জন্যে বা যুদ্ধের প্রয়োজনে ঘোড়া পালন করা হ'ত; তাছাড়া, অশ্বমেধ যজ্ঞে ঘোড়া বলি দিয়ে তার মাংস রান্না করে খাওয়াও চলতো। মহাভারতে তেমন বর্ণনা আছে। বেদে সায়ন ও অগ্নিদেবতাকে 'দধিক্রা' নামের এক দ্রুতগতি, দীপ্তিমান অশ্ব রূপে বন্দনা করতে দেখা যায়। অর্থাৎ, সভ্যতার সেই আদিযুগ থেকেই মানুষ ঘোড়াকে ভালবেসেছে।

প্রায় দু'হাজার বছর আগে অ্যাসিরিয়ায়, আলতো-লিয়া বা তুরস্কে, আরও পরে আরব দেশগুলিতে ঘোড়াকে নানা কাজে লাগানো হয়। এরপর মধ্যযুগে ক্রুজেড ধর্মযুদ্ধ চলাকালে ইউরোপের মানুষ আরবী ঘোড়সওয়ারের নানা বাহাদুরি আর কেরামতি দেখে অবাক হয়ে গেল। ওয়াল্টার স্কটের লেখা 'ট্যালিসম্যান' উপন্যাসে বা 'আইভান হো' বইটিতে সেকালের যুদ্ধে, নানা ধরনের বল-কৌশলের খেলায় বা 'টুর্ণামেণ্টে' কি ভাবে ঘোড়াকে কাজে লাগানো হ'ত তার চমৎকার বর্ণনা রয়েছে। আসলে প্রায় সেই সময় থেকেই ঘোড়ায় চেপে নানা ধরণের খেলা, সিংহ-বরাহ শিকার, বর্শা-ঢাল নিয়ে আপোষ লড়াই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে।

অ্যাসিরীয় ভাস্কর্যে ঘোড়ায় চেপে সিংহ শিকারের চমৎকার সব নিদর্শন পাওয়া গেছে। ঐ ভাস্কর্যের বয়স ২০০০ বছরের ও বেশি।

তবে অশ্বক্রীড়া চালু হয়েছে ১৫৮০ সাল নাগাদ ইতালীর নেপলস শহরে। ঐ সময়ে ঘোড়ায় চেপে নানা আকারের খাল, নালা, বেড়া টপকানোর খেলা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ইংরাজিতে ঐ ধরণের খেলাকে বলা হয় 'শো জাম্পিং'। ঘোড়সওয়ারকে আগাছা-লতা-গুঁড়ি-কাঠের রেলিং দিয়ে বানানো নানা রকম বেড়া টপকাতে হয়। গাছ গাছালির বেড়া বা হেজকে বলে 'অকসার'।

ষোড়শ শতকে ঘোড়ায় চড়া শেখানোর জন্যে ইতালীর ঐ শহরেই পিনিয়াভেল্লির আকাদেমী স্থাপিত হয়।

১৮৬৬ সালে ঐ আকাদেমী ঘোড়া-চেপে নানা খেলার নিয়ম কানুন ঠিক করেন। ১৮৮৬ সালে ফ্রান্সের পারী পহরে প্রথম বসলো আন্তর্জাতিক অশ্বক্রীড়ার আসর। আর ১৯১২-এর ওলিম্পিকে প্রথম ঐ ধরণের খেলা প্রতিযোগিতার অঙ্গ হয়ে ওঠে। এখন শো জাম্পিং-এর নিয়ম কানুন যে সংস্থা গড়েন প্রয়োগ করেন তার হেড অফিস।

অবশ্য এই 'শো জাম্পিং' খেলার ও আরম্ভের একটা আরম্ভ আছে!' আগেই বলেছি খোলা তলোয়ার বা বর্শা নিয়ে ঘোড়ায় চেপে মৃগয়া বহুদিন থেকেই চলে আসছে। বিলেতে ঘোড়ায় চেপে শেয়াল, খরগোশ শিকার শ' দুই বছর আগেও তো রীতিমত ফ্যাশনের ব্যাসন ছিল। ভারতে শাসক সাহেবেরা সড়কি দিয়ে ঐ ভাবে মারতেন বুনো শূয়োর (Pig sticking)। রাজস্থানে এই শতকের গোড়াতেও কর্ণেল কেসরী সিং ঘোড়ায় চেপে সদলে চিতাবাঘ পর্যন্ত মেরেছেন। ঐ ভাবে শিকার করতে গিয়ে অনেক সময় খানা, ঝোঁপ, গর্ত বা ডিবি লাফ দিয়ে পার হতে হ'ত; তা' থেকেই শো জাম্পিং এর কসরৎ শিকারীরা আয়ত্ত করেন।

ঘোড়ায় চেপে দলবদ্ধভাবে দু'ধরণের খেলা বর্তমানে প্রচলিত আছে—একটি 'পোলো' আর একটি 'বুজকাশী' (Buz-Kashi)। 'পোলো' বা 'পুলা'র জন্ম কেউ বলেন ইরানে (খ্রীঃ পূঃ ৫২৫ অব্দে) কেউ বলেন তিব্বতে। পুলা শব্দটি তিব্বতীয়। পোলো সবচেয়ে পুরানো বল খেলাও বটে। ১৮৭৫ সালে স্থাপিত হালিংহাম পোলো কমিটি ঐ খেলার নিয়ম ঠিক করেন।

আফগানিস্তানের জাতীয় খেলা 'বুজকাশী'। ঐ খেলায় যথেষ্ট সাহস, শক্তি আর কৌশলের প্রয়োজন হয়ে থাকে। গোটা গ্রাম ঐ খেলা নিয়ে মেতে ওঠে।

ঘোড়দৌড়ের জনপ্রিয়তা প্রায় চার হাজার বছরের। আফ্রিকার অস্থি-ভাস্কর্যে প্রায় ঐ সময়ের ঘোড়দৌড়ের খোদাই কাজ পাওয়া গেছে। ঐ দৌড় দু'রকম—সমতল মাঠে আর নানা বেড়া বা বাধা ডিঙিয়ে অসমতল পথে বা স্টিপ্‌ল চেজিং। খ্রীঃ পূঃ ৬২৪ অব্দে অনুষ্ঠিত গ্রীসের ২৩ তম ওলিম্পিকে ঘোড় দৌড়ের প্রতিযোগিতা হয়েছিল। আধুনিক নিয়মে প্রথম ঘোড় দৌড় হয়েছিল ২১০ খ্রীষ্টাব্দে, ইংলণ্ডের ইয়র্ক শিয়ারে। ঐ ঘোড় দৌড়ের উদ্যোক্তা ছিলেন রোমের সম্রাট সেভেরাস। তখন ব্রিটেন ছিল রোমের অধীন।

"চ্যাম্পিয়ান ক্র্যাবেট" নামে একটি ঘোড়া ১৯২০ সালে ২৪৫ পাউণ্ড ওজনের বোঝা পিঠে নিয়ে ৩০০ মাইল পথ ৫২ ঘণ্টা ৩৩ মিনিটে পাড়ি দিয়েছিল। এটি ঘোড় দৌড়ের বিশ্ব রেকর্ড। ১৯৬৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দা স্টেচার সাহেব ভিক্টোরিয়াতে ১০০ মাইল পাড়ি দিয়েছিলেন মাত্র ১৯ ঘণ্টায়। এটাও এক রেকর্ড।

মার্কিন দেশের পশুপালক কাউ-বয়রা দুরন্ত ঘোড়ায় পিঠে চেপে 'রোডিও' নামে এক ধরণের রোমাঞ্চকর প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। তবে ঘোড়ায় চেপে উঁচু লাফ দেওয়ার (৮ ফিট ১ ইঞ্চি) বিশ্ব রেকর্ড করেছেন চিলি দেশের ক্যাপ্টেন মোয়েলস, ১৯৪৯ সালে। সবচেয়ে লম্বা লাফের রেকর্ড ২৭ ফিট ৩ ইঞ্চি। স্পেনের কর্ণেল হিরের্‌রো ১৯৫১ সালে একটা ডোবা পার হয়ে ঐ রেকর্ড করেন বর্তমানে অলিম্পিকে তিনজন ঘোড় সওয়ার এ যাবৎ চারটি করে সোনার মেডেল পেয়েছেন। তাঁদের নাম হলাণ্ডের মোর টেঞ্জেস, সুইডেনের সিয়ের এবং জার্মানীর উইন্‌কলার সাহেব।

জোঙবাকের মা

সঞ্জয় গঙ্গোপাধ্যায়

প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে। বেলা আড়াইটে নাগাদ সূর্য হাতিপাহাড় টপ্‌কে যাবার পরই আস্তে আস্তে আলো কমতে সুরু হয়েছে। কার্তিক মাস প্রায় শেষ হয় হয়। আর দু'চার দিন পরেই এ পথে যাত্রী চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। বদরীনাথজীও মন্দির টন্দির বন্ধ করে তাঁর পূজারী রাওয়ালজীর কাঁধে চড়ে জোশীমঠের বাড়িতে চলে যাবেন—আবার ফিরবেন সেই চোত বোশেখ মাসে। ডি জি বি আরের লোকেরা বরফ কাটবে, রাস্তা খুলবে তারপর। বদরীনাথজীর প্রথম পুজোটাও ওরাই দেবে। তবে আবার লোকজন তীর্থযাত্রী সবাই আসতে শুরু করবে। এখন এই বরফের ক'মাসের জন্য কাঠকুটো খাবার দাবার সমস্ত কিছু জোগাড় করে রাখার দরকার। নয়ন সিং আর খাজুরি তাই পাণ্ডুকেশ্বরের ওপরের বন থেকে কাঠকুটো নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। সন্ধ্যের আগেই বাড়ি পৌঁছতে হবে অন্ধকার হলে আবার সেই যাদের নাম করতে নেই তারা সব কৈলাস পাহাড় থেকে নেমে আসে।

উৎরাইয়ের যে মোড়টা থেকে বিষ্ণুপ্রয়াগের মন্দির দেখা যায় ঠিক সেইখানটায় পৌঁছে নয়ন সিং হঠাৎ খাজুরির হাত ধরে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'পণ্ডিত জি, ওই দেখ!' নয়ন সিং যদিও খাজুরির চেয়ে বছর খানেক বয়সে বড়, তাহলেও খাজুরি হ'ল ব্রাহ্মণ—তাই পণ্ডিত জি। নয়ন সিংয়ের নজরে নজর মিলিয়ে খাজুরি দেখল, পথের ধারে সিদ্ধির ঝোপের তলায় দুটো গোল গোল মিশ্‌কালো মতন গড়াগড়ি দিয়ে খেলা করছে।

আস্তে আস্তে কাঠের বোঝাটা পাশের কালভার্টের ওপর নিঃশব্দে নামিয়ে ফিস্ ফিস্ করে খাজুরি বলল, 'নয়ন সিং. চল্ ধরি।' নয়ন সিং বলল 'কি বলছ! ওদের মা যদি কাছাকাছি থাকে?' বলতে বলতেই অস্পষ্ট হুঁ হুঁ শব্দটা ওদের কানে এল। দেখে, একটু দূরে খাদের পাশে মস্ত আখরোট গাছটার তলায় ধুমসো কালো ভাল্লুক পড়ে পড়ে কাঁপছে আর হুঁ হুঁ করে শব্দ করছে। খাজুরি বলল, 'জ্বর এসেছে, এখন দু'তিন ঘণ্টা ও আর নড়ছে না। চল্, ধরে বাড়ি নিয়ে যাব—একটা তোর, অন্যটা আমার। ডিমরি মামা বলেছে কোটদ্বারায় রীছের (ভালুকের) নাচ হয়—ডুগ্ ডুগ্ করে ডুগ্‌ডুগি বাজে।' নাকের ওপর সাদা ছাপওয়ালা ছানাটাকে বুকের কাছে তুলে নিয়ে নয়ন সিং বলল, 'দেখেছ পণ্ডিতজি কপালে কেমন তিলক আঁকা! ঠিক যেন জোশীমঠের বুড়ো রাওয়ালজি।' একহাতে অন্য ছানাটাকে জাপটে ধরে অন্য হাত দিয়ে কাঠের বোঝাটা ঠিক করতে করতে খাজুরি বলল, 'তাড়াতাড়ি চল্ ওদের মা টের পাবার আগেই পালাতে হবে।' হন্ হন্ করে পা চালিয়ে দুজনে অলকানন্দার পুল পার হয়ে নিজেদের গাঁয়ের পাকদণ্ডী ধরল। দূর থেকে ভেসে আসা গাঁয়ের ভুটিয়া কুকুরগুলোর গম্ভীর ডাক কানে আসতে আসতেই টুপ্ করে চার দিক অন্ধকার।

* * *

গায়ের দোসুতিটা ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে ভুড়ভুড় করে হুঁকোর লম্বা একটা টান দিয়ে তিলক সিং বলল,

'মুন্নাকে যদি কেউ ধরে নিয়ে যেত তাহলে মুন্নার মায়ের কেমন লাগত?' আগেঠির (শীতের দিনে জ্বালানো ছোট উনুন) পাশে বসা নয়ন সিংয়ের গলার কাছে ভাতের শেষ দলাটা যেন আটকে গেল। মুন্না নয়ন সিংয়ের ছোট্ট ভাই, সবে চার হাত পায়ে গুড় গুড় করে হামাগুড়ি দিতে শিখেছে—কোলে উঠিয়ে নিলেই চার খানি দাঁত বার করে খিল খিল করে হেসে ওঠে। বোজা বোজা গলায় নয়ন সিং বলল, 'ওর মায়ের জ্বর হয়েছিল বাবা, কালভার্টের ধারে খেলা করছিল—যদি অলকানন্দায় পড়ে যেত!' মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে তিলক সিং বলল, 'বদরীনাথজীর পায়ের কাছে বসে কারো মনে দুঃখ দিতে হয় না। কাল সকালে যেখান থেকে নিয়ে এসেছিলি সেখানে ছেড়ে আসিস বাচ্ছু টাকে। খেতে টেতে দিয়েছিস কিছু?' 'হ্যাঁ বাবা, রামদানার লাড়ু দিয়েছিলাম খেল না কিন্তু।'

'বোকা কোথাকার! ওর কি তোর মতন দাঁত হয়েছে যে রামদানার শক্ত লাড্ডু খাবে?'

নিভু নিভু আগেঠির পাশে জুৎ করে শুয়ে পড়বার জোগাড় করছিল নয়ন সিং! তিলক সিংয়ের তাড়ায় সেটা কোনোক্রমে ঘরের বাইরে রেখে এসে রেজাইয়ের (লেপের) তলায় ঢুকে পড়ল নয়ন সিং। বাইরের দিকে ছাগল রাখার ছোট্ট খালি ঘরের পাতা খড়ের বিছানায় কপালে সাদা তিলক আঁকা ছোট্ট ছানাটা ঘুমিয়ে পড়বার স্বপ্ন দেখতে দেখতে এক সময় নয়ন সিংয়েরও চোখের পাতা জড়িয়ে এল।

শেষ রাতের দিকে যখন তারাগুলো পাহাড়ের মাথায় বেশি কাছে সরে নিবে যাবার আগে বেশি তেজে জ্বল জ্বল করছিল সেই সময়ে গাঁয়ের কুকুরগুলো সব একসঙ্গে ডাকাডাকি লাগিয়ে দিয়েছিল! নয়ন সিং তখন অঘোর ঘুমের তিনটে পাঁচটা মোটা মোটা রেজাইয়ের তলায়। যদি কুকুরগুলোর সঙ্গে অন্য কেউ জেগে উঠত তাহলে দেখতে পেত ছাগলের ঘরের আগলটা ভাঙ্গা হা হা করছে আর জঙ্গলের দিকে আলো আঁধারির মধ্যে দিয়ে চার পায়ে হেঁটে যাচ্ছে বড় মতন একটুকরো মিশ কালো অন্ধকার—সঙ্গের ছোটমতন অন্ধকারের টুকরোটার কপালে যেন জোশীমঠের 'পেনসিল পাওয়া' বুড়ো রাওয়ালজির মত শ্বেত চন্দনের তিলক আঁকা।

* * *

'আর কি দিদি,' ডিমরি মামা বলল, 'এবার ভাগ্নে বাবুকে একটা ডুগ্‌ডুগি আর লাঠি কিনে দাও আর ওর রীছের জন্যে একটা ঘুন্টিওয়ালা বকলস—বাবুসাহেব কোট দ্বারা, ঋষীকেশ, দেরাদুন, সাহারানপুরে খেলা দেখিয়ে বেড়াক।' খান্দুরি বলল 'ধ্যেৎ!' বলল বটে, কিন্তু মনের মধ্যে একটা ছবি জ্বলজ্বল করে উঠল—বড় শহরের বাজারের চৌকে বিশাল ভালুক নিয়ে লাল ওয়েস্ট কোট পরা মাথায় গোল টুপি খান্দুরি খেলা দেখাচ্ছে, হাতে ডুগ্‌ডুগি বেজে চলেছে ডুগ্, ডুগ্, ডুগ্, ডুগ্, ডুগ্, ডুগ্, অন্য হাতে লাল রঙের বেঁটে লাঠি। 'নাচে ভালু নাচে ভালু নাচে মেরে ভালুয়া।' ঘুরে ঘুরে হেলে দুলে তার ভালুক নাচছে আর গলায় বাঁধা চওড়া বকলসের ঘুন্টিগুলো বাজছে টুং টুং কুন্ কুন্। হাততালি আর সাবাশের আওয়াজে বাজার সরগরম। খান্দুরির মা বলল, 'তোরা সবাই আদর দিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে দিনদিন বাঁদর বানাচ্ছিস। কোথা থেকে একটা গাই না, বকরা না, নিদেন একটা ভুটিয়া কুকুর না, একটা রীছের ছানা ধরে নিয়ে এল। ওর বাপ এখানে থাকলে ঠিক বলতাম দিল্লির চিড়িয়াঘরে নিয়ে গিয়ে দিয়ে আসতে।' গজ গজ করতে করতে খান্দুরির মা ঘরের ভিতর ঢুকে গেল।

ভাগ্যে বাবার পল্টন এখন ঝাঁসিতে আছে খান্দুরি একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'জানো দিদি', 'গলা উঁচিয়ে ডিমরি মামা বলল, 'দিল্লির কথায় মনে পড়ল কোটদ্বারার হেমচন্দ্র দেবরাণীর শ্বশুর শর্মাজি, সেই যে ঋষীকেশের লীচায়, সে দেরাদুনের কাছে দইওয়ালার আখের খেত থেকে দুটো ডোরাদার বাঘের ছানা ধরে দিল্লিতে নেহেরুজির কাছে দিয়ে এসেছিল। নেহেরুজির সঙ্গে সেই বাঘের ছানা নিয়ে শর্মাজির ছবি'—কথাটা শেষ হতে পেল না। 'পণ্ডিত জি', বলে চিৎকার করতে করতে হাঁপাতে হাঁপাতে নয়ন সিং এসে

হাজির। 'ওদের মা কাল রাতে এসেছিল। ছাগলের ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলাম বাচ্চাটাকে—সকালে দেখি আগড় ভাঙা, বেড়ার গায়ে রীছের আঁচড়ের দাগ রাস্তার পাশে ডি জি বি আরের জমা করা বালির ওপরে পায়ের ছাপ।

খানিকক্ষণ বাদে নয়ন সিং একটু শান্ত হয়ে চলে যাওয়ার পর খান্দুরি আস্তে আস্তে ডিমরিমামাকে বলল, 'মামা, ওর মা এসে যদি ওকেও নিয়ে যায়? কি হবে মামা? আমাদের তো কাঠ আনা, সবজি শুকোনো সব হয়ে গেছে, মামা তুমি কদিন আমাকে বড়া গাঁওয়ে তোমাদের বাড়ি নিয়ে চল—অতদূর নিশ্চয়ই ওর মা আসতে পারবে না।' খান্দুরির কোলে মিশকালো নাদুস নুদুস ছানাটাকে দেখে ডিমরি মামাও কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। 'দাঁড়া, দেখি দিদিকে বলে। ভাগ্যিস তিলক সিং রাওয়াতের বাড়ি ভালুক আসার কথাটা দিদি শুনতে পায়নি।'

দুপুরে ডাল ভাত আর আজোয়ান দিয়ে আরবির (মুখী শুচু) ভাজি খেয়ে ডিমরিমামার সঙ্গে খান্দুরী মামার বাড়ি বড়াগাঁও রওনা হ'ল। পিঠে কাপড় দিয়ে বাঁধা কালোকোলো গোলগাল লোমওয়ালা ছানাটা। 'তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস' মা বলল, 'বাচ্চাটাকে ঠিকঠাক খেতে দিতে ভুলিস না যেন, কোনো কাজে তো মন থাকে না তোর। জয় বাবা বদরী বিশাল!' 'তুমি কিছু ভেবোনা মা, দু'দিন বাদেই ফিরে আসব—তোমার জন্যে বড় গাঁও থেকে আড়ু (পীচ) নিয়ে আসব।' দেখতে দেখতে মোড় পেরিয়ে দুজনেই চোখের আড়াল।

খান্দুরিদের গ্রাম মায়ওয়াড়ি থেকে মামার বাড়ির গ্রাম বড়াগাঁও ছ'সাত মাইল দূর। সেই যে পথ দিয়ে নন্দাদেবী, ত্রিশূল চড়তে যায়, সেই মালারির পথে। পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। ভালুকের ছানা দেখে দিদিমা গোড়ায় একটু গাঁই গুঁই করেছিলেন বটে, কিন্তু হাজার হলেও খান্দুরি তাঁর একমাত্র মেয়ের একমাত্র ছেলে। সুতরাং বড় ঘরের কোণে খড়ের উপর রেজাইয়ের ছেঁড়া টুকরো বিছিয়ে তার উপর ভালুক-ছানার জায়গা হ'ল। ছাগলের দুধের সঙ্গে মকির (ভুট্টা) আটার রুটি চটকে তার খাওয়ার ব্যবস্থাও হল।

তারপর খানিক কুঁই কুঁই করে ছানাটা ঘুমিয়ে পড়লে পরে তার উপরে আপেল রাখার বড় খালি ঝুড়িটা চাপা দিয়ে ডিমরি মামা বলল 'চাচার ভুটিয়া কুকুরের বকলসটা বোধহয় ঘরেই কোথাও আছে—কাল সকালে তোকে খুঁজে দেব। জানুবানের গলায় মানাবে ভাল।' ডিমরি মামার চাচাজির ভুটিয়া কুকুর কবেই মরে গেছে। চাচাজিও দেরাদুনে গিয়ে কাপড়ের দোকান খুলেছে। দিদিমা কিন্তু কিচ্ছু ফেলতে দেয় না। জব্বর নামটা দিয়েছে মামা, জানুবান! ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে খান্দুরির চোখের সামনে সেই ছবিটা আবার ভেসে উঠল, বড় শহরের বাজারের চৌক—খান্দুরির গায়ে লাল ওয়েস্টকোট, জানুবান ঘুরে ঘুরে নাচছে। খান্দুরির হাতে ডুগ্‌ডুগি বাজছে ডুগ্, ডুগ্, ডুগ্, ডুগ্।

দুটো দিন আর একটা রাত নির্বিঘ্নে কেটে গেল। বড়াগাঁওয়ের ছেলে মহলে এখন খান্দুরির আলাদা খাতির। জানুবানের গলায় ডিমরি মামার চাচাজির কুকুরের বকলস চড়েছে। তাতে একটা দড়ি বেঁধে খান্দুরি তাকে নাচ শেখাবার তালিম দিতে শুরু করেছে—ডুগ্‌ডুগিটারই যা অভাব। ছানাটা কিন্তু ভারি দুষ্টু, কিছুতেই দু পায়ে দাঁড়াতে চায়না, থপ্, থপ্, করে পড়ে যায়। খান্দুরি ঠিক করে ফেলেছে বাবাকে চিঠি লিখবে এবারে ছুটিতে আসবার সময় যেন ওর জন্যে একটা লাল ওয়েস্ট কোট আনে, আর ঋষীকেশের বাজার থেকে একটা ডুগ্‌ডুগি।

* * *

বড়াগাঁওয়ের সরপঞ্চ (গ্রাম প্রধান) বহুগুণাজি ডিবরির আলোয় চোখে ডবলকাঁচের চশমা এঁটে রাম চরিত মানস পড়ছিলেন। সত্তরের কাছাকাছি বয়স, এখনও একটিও দাঁত পড়েনি, শিরদাঁড়া সোজা। সেকেণ্ড গাড়োয়াল রেজিমেণ্টের সুবেদার মেজর ছিলেন—যেমন ছিলেন তাঁর আগে তাঁর বাবা। তাঁর ছেলেও এখন

পল্টনের হাওলদার মেজর। গাঁয়ের কুকুরগুলো যখন একসঙ্গে ডাকাডাকি আরম্ভ করে দিল তখনও তিনি তেমন গা করেন নি। কিন্তু তার সঙ্গে যখন লোকজনের চিৎকারও কানে এল তখন তিনি বই মুড়ে, চশমা খুলে খাপে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। শীতের শুরুতে যখন পাহাড়ের উপরে বরফ জমতে শুরু করে আর ঠাণ্ডা বেড়ে যায় তখন উপর দিক থেকে জঙ্গলী জানোয়াররা নীচে বসতি এলাকায় নেমে আসে খাবারের খোঁজে। অবশ্য এ অঞ্চলে জানোয়ার বলতে গোনা গাঁথা তিন চারটে চিতাবাঘ আর কিছু ভালুক। লোমড়ি (খ্যাঁকশেয়াল), গিদড় কে (শেয়াল) তো আর জঙ্গলী জানোয়ার বলা যায় না। অবশ্য গোটা কতক হুঁড়ারও (বড় সাইজের বন বেড়াল জাতীয় জন্তু) আছে—তবে সেগুলোর স্বভাব চোরের মত। তাদের জন্য গাঁয়ের লোক শোরগোল লাগিয়ে দেবেনা। বহুগুণাজি এককালে নাম করা শিকারী ছিলেন এ তল্লাটে—কখনো গুলি ফস্‌কায় নি। এখন অবশ্য নিয়মিত পরিষ্কার করার জন্যে ছাড়া বন্দুক ছোঁন না। তাহলেও গ্রামের প্রধান তিনি—গ্রামের একমাত্র বন্দুকটাও তাঁরই কাছে। বেশ খানিকক্ষণ বাদে অবশ্য চেঁচামেচি, ক্যানেস্তারা বাজানোর আওয়াজ কমে গেল।

গ্রামের বুজুর্গ (প্রবীণ) লোকেদের আড্ডা বসে মোটররাস্তার ধারে লছমন সিং নেগির চায়ের দোকানের সামনে। সকাল বেলা নিয়মমত বহুগুণাজি সেখানে এসে বসতেই সবাই একসঙ্গে তাঁকে কাল রাতের ঘটনা শোনাতে লেগে গেল। রাতে নাকি মস্ত বড় কালো ভালুক এসেছিল গাঁয়ে। অন্য ভালুকদের মত সেটার মোটেই স্বভাব নয়। খামার বাড়ির দিকে না গিয়ে সেটা নাকি লোকের বাড়িতে ঢুকতে চেষ্টা করেছিল—দু' তিনবার সবাই চিৎকার চেঁচামেচি করে, মশাল জ্বালিয়ে, ক্যানেস্তারা পিটিয়ে তাকে তাড়িয়েছে—আবার সে ফিরে এসেছে। ডিম্‌রিদের পাড়ার চণ্ডীপ্রসাদের দুটো ছাগল আর রাস্তার একটা কুকুর মেরে ফেলেছে। যা বোঝা যাচ্ছে শয়তানটা মানুষকে মোটেই ভয় পাচ্ছে না। এখন বহুগুণাজি যদি ওটাকে না মারেন তা'হলে গাঁয়ের লোকের কোনো স্বস্তি নেই। আর তাছাড়া চিতাবাঘ না মারার জন্যে যেমন সরকারী আইন আছে ভালুক-মারার বিরুদ্ধে তো তেমন কোনো কানুন নেই। সরপঞ্চ (মোড়ল) যদি বন্দুক থাকা সত্ত্বেও গাঁয়ের লোকদের রক্ষা না করেন তা'হলে সবাই ধনে প্রাণে মারা যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

সারারাত খান্দুরির ঘুম নেই। তার মনে একটুও সন্দেহ নেই কাল রাতে যে ভালুকটা বড়াগাঁওয়ে উৎপাত করেছে—সে অন্য কেউ নয় নির্ঘাৎ জাম্বুবানের মা। কিন্তু কি করে ও মারওয়াড়ি থেকে বড়াগাঁও রাস্তা চিনে এল? ভালুকরাও কি কুকুরদের মত গন্ধ শুঁকে রাস্তা চিনে আসতে পারে? ও জানলেই বা কি করে যে ওর বাচ্চা এখানে আছে? কাল রাতে যারা নাকি ভালুকটাকে দেখেছে তাদের দু'একজনকে ও জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করেছিল বড় ভালুকটার সঙ্গে কপালে সাদা রঙের তিলক আঁকা একটা ছানা ভালুকও ছিল কিনা। ছোট বলে ওকে কেউ পাত্তাই দিল না। এদিকে ডিম্‌রি মামাও চণ্ডীপ্রসাদের সঙ্গে সকাল বেলাই দারোগাজিকে খবর দেবার জন্যে জোশীমঠ গেছে। আর দিদিমার ধারণা ভালুক নয়, কাল রাতে যেটা এসেছিল সেটা দানো। গুলি, বন্দুক, দারোগাতে ওর কিছুই হবে না—বরং পূজাপাঠের ব্যবস্থা করা দরকার। দিনের বেলাতেও খান্দুরি জাম্বুবানকে ঘরের কোণে ঝুড়ি চাপা দিয়ে রাখল। ঝুড়ির ওপর চড়াল একটা বাক্স! মনে মনে কানে তুলো দিয়ে খান্দুরি বাবা বদরী বিশালের কাছে একমনে প্রার্থনা করতে লাগল 'হে বাবা জাম্বুবানের মা যেন আর ফিরে না আসে,' কেননা, ঝুড়ির ভিতয়ে বদ্ধ জাম্বুবান মহা কুঁই কুঁই লাগিয়ে দিয়েছে।

* * *

রাস্তার ওপারে দূরে জঙ্গলের দিক থেকে একটা গিদড় (শেয়াল) ফেউ ডেকে উঠতেই বহুগুণাজি নড়ে

বসলেন। কোলের ওপর রাখা বন্দুকটা দেখে নিলেন—দুটো। চেম্বারেই রাইফেল স্লাগ ভরা আছে। তাঁর অভিজ্ঞ শিকারীর মন বলছে জানোয়ারটা যদি আজ আসে তাহলে কালকের মত মোটর রাস্তার ওপার থেকেই আসবে। রাস্তার এপারে খানিকটা খোলা জায়গা যেখানে গাঁয়ের লোকেরা আনাজ শুকোয়, তারপরেই লোকবসতি—চণ্ডীপ্রসাদের বাড়ি, তার পিছনে ডিমরি-দের বাড়ি। অনেক বারণ করা সত্ত্বেও গাঁয়ের তাবৎ

লোক সেই দুপুর থেকেই আনাচে কানাচে ভিড় করে আছে। মানুষকে ভয় করে না এমন আশ্চর্য জানোয়ার মায়া স্বচকে দেখবার ইচ্ছে সকলেরই। পড়ন্ত বেলা, আলো বেশ কমে এসেছে। রাস্তার ওপারে ঢালু জমিতে সিদ্ধির ঝোপটা কি একটু নড়ে উঠল।

পাড়ার কুকুরগুলো ডাকতে আরম্ভ করেছে—কেমন যেন ভয় ভয় ডাক। কিন্তু রাস্তার দিকে কোনো কুকুরই যাচ্ছেনা। ঝোপটা থেকে প্রথমে বেরিয়ে এল গোল গাল মিশকালো রঙের একটা ছোটমত জানোয়ার। ভিড় থেকে একটা গুঞ্জন উঠল—'আসছে, আসছে!' খান্দুরি পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দেখার চেষ্টা করল—ওটার কপালে জোশীমঠের বুড়ো রাওয়ালজির মত সাদা তিলক আঁকা কিনা—আধো অন্ধকারে ঠিক বোঝা যায় না। তারপরেই ঝোপ সরিয়ে বেরিয়ে এল এক বিশাল কালো ভালুক। বহুগুণাজি বন্দুক তুলে নিলেন ছানা ভালুকটা বড়টার সামনে থেকে সরলেই গুলি করবেন। ক্রমে ভালুক দুটো রাস্তার উপরে এসে পড়ল। বড় ভালুকটারও নজরে এসেছে গ্রামের সমস্ত লোক রাস্তার এপারে জমা হয়েছে। তার ভ্রূক্ষেপ নেই। কে যেন পেছন থেকে বলে উঠল, 'বহুগুণাজি গুলি করুন।' কিন্তু বাচ্চাটা এখনও মায়ের সামনে।

হঠাৎ বহুগুণাজির পেছন দিক থেকে একটা চাপা শোরগোল উঠল। ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে আর একটা ভালুকছানা লোক বসতির দিক থেকে খোলা জায়গাটায় বেরিয়ে এসেছে—গলায় তার বকলস বাঁধা। জাম্বুবান। কোনো রকমে ঝুড়ি উলটে ফেলে চলে এসেছে—মায়ের গন্ধ পেয়েছে নিশ্চয়ই। বড় ভালুকটা ইতিমধ্যে রাস্তার উপর পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। পিছনের লোকেরা চেঁচিয়ে উঠল, 'মারুন, মারুন!' বহুগুণাজির হাতের বন্দুক নিষ্কম্প, আঙুল ট্রিগারে আস্তে আস্তে চাপ দিতে শুরু করল—পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ। হঠাৎ খান্দুরি প্রাণপণে চিৎকার করে বহুগুণাজির দিকে ছুটে এল, 'মেরোনা ও জাম্বুবানের মা, মেরোনা ওকে!' জাম্বুবান ততক্ষণে চার হাত পায়ে দৌড়ে রাস্তার উপর মায়ের কাছাকাছি।

বহুগুণাজির হাতের বন্দুক আস্তে আস্তে নীচে নেমে এল। জমায়েত গাঁয়ের লোক হতাশায় হৈ হৈ করে উঠল। ডান হাতের উলটো পিঠ দিয়ে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়া একফোঁটা চোখের জল মুছে নিয়ে ধরা গলায় বহুগুণাজি পাশে দাঁড়ানো খান্দুরিকে বললেন, 'দেখ্‌তো চোখে যেন কি পড়ল।' জাম্বুবানের মা তখন জাম্বুবান আর তার ভাইকে নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

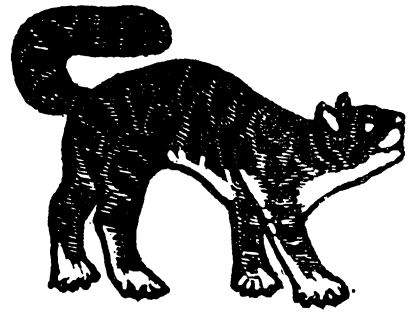

বাচ্চা ভুত

সুধীন্দ্র সরকার

বাড়ির কাছে পৌঁছে শেষে
পথ হারালুম অবশেষে,
ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে
হাতড়ে খুঁজি চারিধারে ;
আলের পথ উঁচু নিচু
চেনা জানা পাইনা কিছু।
সম্মুখেতে তাকিয়ে থাকি
কেউ কোথা নেই কাকে ডাকি ?
পায়ে পায়ে এগোই তবু
হাঁটছি যেন জবুথবু,
থমথমে এই রাত্তিরে
একলা আমি যাত্রিরে
হঠাৎ দেখি দু'হাত তুলে
একটা ছেলে হেলে দুলে,
অন্ধকারে হাঁটছে একা
যাচ্ছে নাকো মুখটা দেখা
আমি তখন দৌড়ে গিয়ে
পেছন থেকে যাই চেঁচিয়ে,
'এই যে খোকা চললে কোথা,
কোনদিকেতে চিংড়িপোতা' ?
নেইকো সাড়া ব্যাপারটা কি,
ওই ছেলেটা কালা নাকি ?
…হন্‌হনিয়ে চলছে আগে
ব্যাপার দেখে খট্‌কা লাগে।
যেমনি গেলুম ধরতে ওকে
অমনি ধাঁধা লাগল চোখে।
রাস্তা থেকে সড়াৎ ক'রে
অশথেরই ডালটি ধ'রে—
সেই ছেলেটা একনিমেষেই
এই ছিল, আর এই তো নেই!
দেখছি কি এ, চোখের ভুল ?
দাঁড়িয়ে গেল মাথার চুল !
বাচ্চা ভূতে চাপবে ঘাড়ে ?
পা চলে না ভীষণ ভারে।
সামনে তখন ধূ-ধূ মাঠ
ভয়েই গলা শুকিয়ে কাঠ ?
এমন সময় পেছন থেকে
নাম ধরে কে উঠলো ডেকে,
তাকিয়ে দেখি রাঙা দাদা
সঙ্গে সাথী গাদা গাদা ;
টর্চ চোখেতে ফেললো যেই
ভূতের ঘোর কাটলো সেই।
কিন্তু তখন চটাৎ করে
পড়লো চাঁটি মাথায় জোরে,
গাছের ডালে তাকিয়ে দেখি
দুই পায়েতে পালায় সেকি ?
'হুশ' করতেই ধাবমান…
য়্যাব্বড় এক হনুমান !

ভাইরাসের গল্প

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

আজ সকাল থেকেই শরীরটা বড় ম্যাজ ম্যাজ করছিল। ভীষণ শর্দী হয়েছে, থেকে থেকে হাঁচি আসছে আর, একবার এলে, যেন আর থামতেই চায় না! মাথাটাও বেশ টিপ্ টিপ্ করছে।

মলিনা আমাদের বাড়ি কাজ করে। দেখে শুনে বলল, 'ও কিছু না, ফ্লু হয়েছে। দিন তিনেকের ভোগান্তি, তারপর আপনিই সেরে যাবে। আমার খোকারও হয়েছিল যে! সেই যে—যে এবার ছিক্‌ছে উঠছে।'

মলিনার ক্লাস সিক্স-এ পড়া ছেলেরও ফ্লু অর্থাৎ ফ্লু কিনা ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল এবং মাত্র তিন দিন ভুগেই সেরে উঠেছে শুনে একটু আশ্বস্ত হয়েছিলাম কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল, না, ইনফ্লুয়েঞ্জাও তো সময় বিশেষে ভয়ঙ্কর রূপ ধরতে পারে।

মনে পড়ে বহু—বহু বছর আগেকার কথা। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ, হিটলারের নয়, কাইজারের, সবে শেষ হয়েছে। আমরা সুদূর লাহোর থেকে কলকাতায় চলে এসেছি, আর, একটা বছর যাতে না নষ্ট হয় সেজন্য বাবা এসেই আমাকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন—একেবারে বছরের শেষ দিকে অর্থাৎ ঠিক পুজোর ছুটির পর অক্টোবর কি নভেম্বর মাসে। ওদিকে ডিসেম্বর পড়তেই শুরু হবে বাৎসরিক ক্লাসে ওঠার পরীক্ষা। এদিকে ইস্কুলটাও আবার যে সে ইস্কুল নয়—হিন্দু স্কুল। যেমন অসম্ভব নাম করা তেমনি অসম্ভব কড়া, পাঞ্জাবের লাহোরের পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে কোন বইএরই মিল নেই, মিল নেই পঠ্যসূচীরও। বাবা তো ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েই খালাস, এখন ঠেলা সামলাতে হবে আমাকে। কিন্তু—

কিন্তু আমাকে রেহাই দেবার জন্যই বোধ হয় হঠাৎ শুরু হ'ল ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী, আজ এ বাড়ি, কাল ও বাড়ি; আজ এ পাড়া, কাল ও পাড়া। শহরের কোন জায়গাই বাদ রইল না। শুধু কলকাতা নয়,—সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে, এমন কি গোটা এশিয়া, ইয়োরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়া অর্থাৎ পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল সেই রোগ। আর অত ভয়ঙ্কর জাতের ইনফ্লুয়েঞ্জার কথা এর আগে কেউ কোনোদিন শোনে নি। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক সেবার আক্রান্ত হয়েছিল এই রোগে। পরে হিসেব করে দেখা গেছে এদের সংখ্যা ছিল দশ কোটির ওপর। তার মধ্যে মারা গিয়েছিল দু' কোটির ওপর। ইনফ্লুয়েঞ্জাও

যে এরকম মারাত্মক ব্যাধি হতে পারে তা কেউ ভাবতে পারে নি। আমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের, সহপাঠীদের অনেককেও হারিয়েছিলাম আমরা। আর ইস্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষা পিছোতে পিছোতে তিন মাস পিছিয়ে গেল। ফেব্রুয়ারীর শেষে পরীক্ষা দিয়ে মার্চ মাসে গিয়ে বসলাম নতুন ক্লাসে।

ঘটনাটার উল্লেখ করছি এই জন্য যে কোন অসুখকেই হেলাফেলা করা উচিত নয় আর, বিশেষ করে সেই সব অসুখকে যার উৎপত্তি ভাইরাস থেকে। ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে এই রকম একটা ভাইরাসজনিত রোগ।

ভাইরাস! কথাটা আজকাল শুধু ডাক্তারদের মুখেই নয়, সাধারণ লোকের মুখেও হামেশা শুনতে পাওয়া যায়। বিখ্যাত বিজ্ঞানী লুই পাস্তুয়ের কৃপায় আমরা অনেক দিন থেকেই শুনেছি সব রকম অসুখেরই মূল কারণ হচ্ছে নানা ধরণের ব্যাকটিরিয়া—বাংলায় যাকে বলা হয় জীবাণু। এরা মানুষের শরীরে একবার কোন রকমে ঢুকতে পারলে সেখানে গিয়ে বাসা বাঁধে, তারপর বিদ্যুৎগতিতে বংশবিস্তার করে চলে। একটা থেকে চারটে, চারটে থেকে আটটা এইভাবে অতি অল্পসময়ে লক্ষ লক্ষ জীবাণু গজিয়ে উঠে দেহের ভিতরকার নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অকেজো করে দেয়। তা হলে ভাইরাস আবার কি?

ভাইরাস কথাটার আসল মানে হচ্ছে বিষ। আগেকার দিনে সব বিষকেই বলা হত ভাইরাস। এমন কি সাপের বিষকেও। তারপর নানা রোগের ব্যাকটিরিয়া বা জীবাণু আবিষ্কৃত হলে সেগুলোকেও লোকে ভাইরাস বলত।

ভাইরাসের নতুন বাংলা নামকরণ কেউ কেউ করেছেন জীবকণা। জীবাণুকে বলা হয় জীবের অণু। অবশ্য অণু বলতে ঠিক যা বোঝায় এগুলি তা নয়, তাদের সঙ্গে সামঞ্জস্য দেখেই নামটা দেওয়া হয়েছে। অণু আবার তৈরি হয় পরমাণু দিয়ে—যা নাকি পদার্থের সবচেয়ে ছোট অংশ বলে মনে করা হত। এখন জানা গেছে পরমাণুই সবচেয়ে ছোট নয়, তার মধ্যেও কয়েক রকম ছোট ছোট কণা আছে। তা হলে জীবকণা বলতে নিশ্চয়ই জীবাণুর চেয়েও সূক্ষ্ম কিছু বোঝাচ্ছে। ভাইরাস কি তা হলেও জীবাণুর চেয়েও ছোট? হাঁ, সত্যি তাই। সাধারণ জীবাণু খালি চোখে দেখা যায় না, কিন্তু অণুবীক্ষণ বা মাইক্রস্‌কোপ যন্ত্রের সাহায্যে তাদের চেহারা ঠিক ধরা পড়ে এবং বিজ্ঞানীরা প্রচুর পরিশ্রম আর গবেষণা করে কোন্ রোগের জন্য কোন জীবাণু দায়ী, কি করে তারা জন্মায়, কি করে জীবের শরীরে ঢুকে বংশ বাড়ায়, কি করলে তাদের ঠেকানো যায়—এইসব খবর বার করে ফেলেছেন। কিন্তু কতকগুলি রোগের জীবাণু তাঁরা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও ধরতে পারেন নি। ফলে তাদের সম্বন্ধে তাঁদের কোন পরিষ্কার ধারণা করা সম্ভব হল না,—হ'ল না সঠিক চিকিৎসাপদ্ধতি বার করা। শুধু এইটুকু জানা গেল যে এগুলি সাধারণ জীবাণুদের তুলনায় অনেক সূক্ষ্ম এবং বংশবিস্তার করার ক্ষমতা সম্ভবতঃ এদের জীবাণুদের চাইতে অনেক বেশি।

ভাইরাসের অস্তিত্ব কি করে ধরা পড়ল সে কাহিনীও কম কৌতূহলপ্রদ নয়।

অসুখ তো শুধু মানুষেরই হয় না, সমস্ত জীবজগতের কারোই এর হাত থেকে নিস্তার নেই। পশুপাখি, কীটপতঙ্গ এমন কি গাছপালারও অসুখ হয় এবং সকলকার অসুখের কারণ অনেকটা একই রকম—সেই জীবাণুর আক্রমণ।

তামাকের চলন পৃথিবীর সর্বদেশে। এই তামাক বহুদিন যাবৎ লোকে নানা ভাবে ব্যবহার করে আসছে। কেউ হুঁকো বা গড়গড়ার নলে মুখ লাগিয়ে আরাম করে তামাক টানে (ভালো বাংলায় যাকে বলে তামাকুসেবন), কেউ খায় বিড়ি বা সিগারেটে আগুন ধরিয়ে তার ধোঁয়া টেনে (যাকে বলে ধূমপান) আবার কেউ বা দোক্তা, জর্দা বা ঐ রকম আকারে স্রেফ চিবিয়ে তামাক খেতে ভালোবাসে—সাধারণতঃ পানের সঙ্গে। (মেয়েদের মধ্যেও এ নেশা বড় কম নয়!) হিন্দুস্থানীরা খায় চুন দিয়ে খৈনি। সেও তামাক। এমন কি মুখে না দিয়েও তামাক টানবার অভ্যাস আছে অনেকের। আমাদের

দেশের পণ্ডিতরা তো এক সময়ে ও জিনিস ছাড়া দিন কাটানো ভাবতেই পারতেন না। কিসের কথা বলছি বুঝেছ নিশ্চয়? নস্যি নাকে দেওয়া। তাতে নাকি বুদ্ধি খুব ভালো খেলে—যদি না হাঁচতে হাঁচতে প্রাণ যায়। তবে পাঁড় নস্যি-খোরদের নাকি সহজে হাঁচি-টাঁচি আসে না। যাই হোক, যে ভাবেই হোক না, তামাক খাওয়া যে স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয় একথা অনেকেই মেনে নিয়েছেন কিন্তু তবু ছাড়ছেন না। তবে এই তামাকের দৌলতেই যে ভাইরাসের অস্তিত্ব প্রথম ধরা পড়ে সে কথা ভাবলে তামাককে কিছুটা ধন্যবাদ দিতেই হবে। ব্যাপারটা হয়েছিল এইরকম :—

তামাক তৈরি হয় তামাক পাতা থেকে—তা সে হুঁকো-গড়গড়ার তামাকই বল আর সিগারেটের তামাকই বল কিংবা দোক্তা জর্দা নস্যির তামাকই বল। পৃথিবীর কোটি কোটি লোক এ সবের নেশায় মশগুল। কাজেই এই তামাক পাতার চাষ যে একটা লোভনীয় ব্যবসা হয়ে দাঁড়াবে তাতে আর সন্দেহ কি?

কিন্তু তামাক গাছেও এক রকম রোগ হয়। সারা তামাক পাতা জুড়ে এক রকম ছিট ছিট দাগ ধরতে শুরু করে এবং ক্রমে তা সমস্ত পাতায় ছড়িয়ে পড়ে। তামাক পাতায় এই রোগ ধরলে আর রক্ষা নেই। ছোঁয়াচে রোগের মত সারা ক্ষেত জুড়ে সমস্ত তামাক গাছের পাতায় সে রোগ ছড়িয়ে প'ড়ে সব কিছু উজাড় করে দেয়। মোজেইক করা মেঝের মত দেখতে বলে তামাক গাছের এই রোগকে বলা হয় 'টোবাকো মোজেইক।'

প্রায় শ' খানেক বছর আগে একবার রাশিয়ায় তামাকের এই রোগ খুব মারাত্মক ভাবে দেখা দিল। তামাক-ব্যবসায়ীরা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। এখন উপায়?

ব্যাপার দেখে এগিয়ে এলেন একজন রুশ বিজ্ঞানী—ডিমিট্রি আইভানোস্কি। তিনি ধরে নিলেন, নিশ্চয়ই কোন অজানা জীবাণু এর জন্য দায়ী, সেই জীবাণুটিকে আগে খুঁজে বার করতে হবে তারপর খুঁজতে হবে তার প্রতিষেধককে। এর কিছু আগে চেম্বারলিন নামে আর এক বিজ্ঞানী জীবাণু ছাঁকার একটা অদ্ভুত ছাঁকনি আবিষ্কার করেছিলেন। এই ছাঁকনির গুণ হচ্ছে এই যে, এর ভিতর দিয়ে কোনও তরল পদার্থ ঢেলে দিলে তার মধ্যে যদি কোনও জীবাণু থাকে তবে তা ছাঁকনির গায়ে থেকে যায়। ছাঁকনির ভিতর দিয়ে গলে যেতে পারে না। ডিমিট্রি আইভানোস্কি এই ছাঁকনিরই সাহায্য নিলেন। প্রথমে তিনি কিছু রোগগ্রস্ত তামাক পাতা নিয়ে তার রস খুব চাপ দিয়ে নিংড়ে বার করে অন্য সুস্থ তামাক গাছের গায়ে ঢেলে দিয়ে দেখলেন ঐ রস লেগে তাদেরও ঐ রোগ হয় কিনা। দেখা গেল—হয়, এবং খুব তাড়াতাড়িই হয়। অর্থাৎ ঐ রসের মধ্যেই রোগের জীবাণুটা রয়েছে। কাজেই চেম্বারলিন-ছাঁকনির সাহায্যে পৃথক্ করে ফেলা যাবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল তা হচ্ছে না। ছাঁকনির ভিতর দিয়ে ছাঁকার পর যে রস পাওয়া যাচ্ছে তাও সুস্থ তামাক পাতার ওপর ফেললে তাকে ঐ রোগে আক্রমণ করছে। অর্থাৎ ঐ জীবাণুগুলি এত সূক্ষ্ম যে ঐ জীবাণু-ছাঁকা ছাঁকনি দিয়ে তাদের আলাদা করা তো যায়ই না, আবার অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রাখলেও সেগুলি চোখে ধরা পড়ে না।

এই পরীক্ষাটা যখন ডিমিট্রি আইভানোস্কি করছিলেন তখন বাইজেরিঙ্ক নামে এক ওলন্দাজ বিজ্ঞানীও ঐ একই পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন—অনেকটা একই ভাবে, যদিও কেউ কারো কাজের কথা আগে জানতেন না। বাইজেরিঙ্কও ঠিক ঐ একই ফলাফল দেখতে পেলেন।

তা হলে দেখা যাচ্ছে জীবাণুদের মধ্যেও বেশ কিছুটা জাতিভেদ আছে। এদের একদল এত সূক্ষ্ম যে সাধারণ জীবাণুর মত তাদের খুঁজে বার করা তো প্রায় অসম্ভবই, তাদের চালচলনেও অনেক তফাৎ। তা হলে এগুলিই হচ্ছে সত্যিকার বিষ। সেই থেকে ভাইরাস কথাটি অন্য সব বিষ বা জীবাণু সম্বন্ধে আর ব্যবহার না করে এই বিশেষ ধরনের সূক্ষ্ম জীবাণুর সম্বন্ধেই ব্যবহার করা শুরু হ'ল। এখন ভাইরাস বলতে আমরা শুধু এদেরই বুঝি।

তাই বলে ভাইরাসও কিন্তু সব এক জাতের নয়। নানা জাতের ভাইরাস আছে এবং তারা নানা ধরনের অসুখ ছড়াতে ওস্তাদ্। সামান্য শর্দীকাসি থেকে শুরু করে ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, জলবসন্ত, বসন্ত, মাম্‌স্, পোলিও এমন কি এনকেফেলাইটিস প্রভৃতি হাজার রকম রোগের জন্য এরা দায়ী।

কিন্তু মুশ্‌কিল হল, বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসকে যদি চিনে নিতে না পারা যায় তা হলে তাদের আক্রমণ থেকে রোগীকে নীরোগ করা যাবে কি করে? শর্দীকাসি হাম প্রভৃতি না হয় অল্প দিন পরে আপনিই কমে যায়, কোন ক্ষেত্রে টিকে নিয়ে, অর্থাৎ ঐ রোগের অতি সূক্ষ্ম খানিকটা বিষ আগেভাগেই শরীরে ঢুকিয়ে দিতে পারলে কিছুটা কার্যোদ্ধার হয়। টিকে নেবার ফলে শরীরের মধ্যেই ঐ রোগের প্রতিষেধক,—যাকে ডাক্তারীভাষায় বলে অ্যান্টিবডি, তৈরি হয়ে যায়, যার ফলে আসল রোগটা যদি সত্যিই আক্রমণ করে তবে তাকে ঠেকিয়ে রাখবার দায়িত্ব ওরাই নিতে পারে। দেখা গেছে কখনও কখনও কোন রোগের ভাইরাস একটু কম-জোরী হয়। টিকে তৈরির পক্ষে বীজ হিসেবে সেগুলিকেই শুধু ব্যবহার করা চলে। কিন্তু তারা যদি অতি-জোরী হয়ে দেখা দেয় তবেই ভাববার কথা। এর আগে পৃথিবীব্যাপী যে মারাত্মক ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর কাহিনী দিয়ে আমার গল্প শুরু করেছিলাম তাও নাকি এই অতি তেজী ভাইরাসের দরুণই হয়েছিল।

কিন্তু বেশির ভাগ ভাইরাসজনিত রোগের টিকে বার করা এখনও সম্ভব হয়নি; ওদের ঠেকাবার জন্য ঠিক ঠিক ওষুধও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে এ যুগের 'সর্বরোগহর' অ্যান্টিবায়োটিকও সে সবের সঙ্গে লড়াই করতে সমর্থ হয়নি। এনকেফেলাইটিস এই ধরনের একটি রোগ যার আক্রমণ হয় মস্তিষ্কে, আর মস্তিষ্ক বা মগজ, ইংরেজীকে যাকে বলা হয় ব্রেন,—তাই তো আমাদের শরীরের যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রিত করার প্রধান কর্তা। আমরা নিজেরাও এর ভুক্তভোগী। আমার বড় মেয়ে ছেলেবেলায় এই রোগের শিকার হয়েছিল।

কোন্‌টা

শৈলেনকুমার দত্ত

সবাই জানে কোন্‌টা বেলুন
কোন্‌টা হল চাকি
শিল-নোড়াটা চিনতে কারও
আছে কি আর বাকি?
কিন্তু এখন প্রশ্ন ভেবে
বিগড়ে গেছে মনটা
কেউ কি জানে কোন্‌টা হামান
দিস্তে বলে কোন্‌টা?

বহুকষ্টে তাকে বাঁচানো গেলেও, নানা উপসর্গ ছিল। কিছু দিনের জন্য তো দৃষ্টিশক্তিই একেবারে চলে গিয়েছিল। পরে অবশ্য তা সেরে গেছে এবং এখন বড় হয়ে সে কলেজে অধ্যাপিকার দুরূহ কাজও স্বাভাবিক ভাবে করে যাচ্ছে। তবে শুনেছি এ রোগে হাজারে বড় জোর একজন বাঁচে। সম্প্রতি আবার এদেশে ঐ রোগের আক্রমণ শুরু হয়েছিল। কয়েকজন জাপানী ভদ্রলোক নাকি প্লেনে আসবার সময় এই ভাইরাসটিকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তবে এখন নাকি সে ফাঁড়া কেটে গেছে।

ইতিমধ্যে অবশ্য ভাইরাস নিয়ে আরও অনেক তথ্য তল্লাসী—অনেক গবেষণা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের অসাধ্য কিছুই নেই। অত ক্ষুদে ভাইরাস, চেহারার হদিস না পেলেও তাদের কারো কারো দৈহিক উপাদান তাঁরা খুঁজে বার করে ফেলেছেন। দেখা গেছে ওদের মধ্যে প্রোটিন আর নিউক্লিক অ্যাসিড—এ দু'টি জিনিসই প্রধান। গাছে যে সব ভাইরাসের আক্রমণ হয় তার

মধ্যে প্রোটিনই থাকে বেশি। যেগুলি প্রাণিদেহে আক্রমণ করে সেগুলির মধ্যে চর্বি জাতীয় জিনিসও কিছুটা থাকে, এমন কি 'শর্করা' অর্থাৎ চিনি জাতীয় জিনিসও থাকতে পারে। কোন কোনটার মধ্যে খানিকটা ভিটামিনের সন্ধান পেয়েছেন তাঁরা।

কিন্তু শুধু উপাদান জানতে পারলেই তো হ'ল না। জিনিসটা চোখে দেখতে না পারলে কি করে তাকে চিনে বার করা যাবে আর কি করেই বা জানা যাবে কোন্‌টা কোন্ রোগের জন্য দায়ী?

শেষ পর্যন্ত তাও একদিন ধরা পড়ল।

বছর চল্লিশেক আগে বিজ্ঞানীদের হাতে এল এক নতুন হাতিয়ার—যার নাম তাঁরা দিয়েছেন ইলেকট্রন মাইক্রসকোপ্। এতদিন সাধারণ মাইক্রস্কোপে অর্থাৎ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কোন কিছু দেখতে হলে সাধারণ সূর্যের আলোর সাহায্যেই তা দেখা হ'ত। কিন্তু এই নতুন মাইক্রস্কোপে সাধারণ আলোর বদলে ব্যবহার করা হ'ল ইলেকট্রনের ঝাঁক—যার ফলে মানুষের দৃষ্টিশক্তি গেল বহুগুণ বেড়ে। খুব শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও কোন জিনিসকে ২০০০ গুণের চাইতে বড় করে দেখা যায় না কিন্তু এই নতুন যন্ত্রে তাকে ১০,০০০ গুণ বড় করে দেখা যেতে লাগল। বিজ্ঞানীরা আবার তারও মাইক্রো-ফটো তুলে তাকে এন্‌লার্জ করে নিয়ে ২ লক্ষ গুণ বড় করে দেখবার ব্যবস্থা করলেন। ব্যাপারটা কি রকম হ'ল একটু বুঝিয়ে বলি। কঠোপনিষদে একটা শ্লোক আছে—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।'—তীক্ষ্ণ ক্ষুরের ধারের ওপর দিয়ে হাঁটা যেমন সুকঠিন, জ্ঞানের পথও তেমনি দুর্গম।—পণ্ডিতেরা এই রকম বলে থাকেন। লাইনটা পড়লে মনে হয় ক্ষুরের ধার, তার ওপর দিয়ে কেউ আবার হাঁটতে পারে নাকি? কিন্তু এই ইলেকট্রন মাইক্রসকোপের সাহায্যে সেই ক্ষুরের ধারকে যদি দু'লক্ষ গুণ চওড়া করে নেওয়া যায় তবে তো তা একটা ৭।৮ ফুট চওড়া শান বাঁধানো রাস্তা বলে মনে হবে! তার ওপর দিয়ে হাঁটতে বাধা কি? অবশ্য সত্যি সত্যি এত বড় দেখালেও আসলে সেটা ক্ষুরের ধারের মতই থাকবে, তার ওপর দিয়ে কখনও হাঁটা সম্ভব নয়। ব্যাপারটা কি রকম হতে পারে আমি শুধু তারই একটু আভাস দিলাম মাত্র।

এবারে আর ভাইরাস মহাপ্রভুদের লুকিয়ে থাকা সম্ভব হল না। তাদের সত্যিকার চেহারা ধরা পড়ে গেল দেখা গেল ওদের কোনটা দেখতে সুতোর মতো পাকানো, কোনটা দেখতে গোছা বাঁধা ছুঁচের মত কোনটা নকুলদানার মত, আবার কোনটা বা চৌকো চৌকো ফিটকিরি বা মিছরির মত দানাদার। ইংরেজীতে যাকে আমরা বলি ক্রিস্ট্যাল।

ভাইরাসের এই দানাদার বা ক্রিস্ট্যালের মত চেহারা দেখে আর একটা 'অসম্ভব সম্ভাবনা'র কথা মনে হ'ল বিজ্ঞানীদের। তাঁরা এতদিন পর্যন্ত জানতেন—কোনও জীবিত পদার্থ ও-রকম দানা বাঁধতে পারে না,—ওটা জড় পদার্থেরই ধর্ম। তবে?

এই 'তবে' নিয়েই যত গোলমাল। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখলেন, ভাইরাস যতক্ষণ এই দানাদার চেহারা নিয়ে থাকে ততক্ষণ তারা সত্যিই জড় পদার্থ, জীবনের কোন লক্ষণই তাদের মধ্যে থাকে না। বিজ্ঞানের ভাষায় যাদেরকে বলা হয় জায়ান্ট মলিকুল—দৈত্যাকার অণু,—এগুলি তখন শুধু তাই। বংশ বিস্তার—যা জীবন্ত পদার্থের একটা বড় ধর্ম, তা থেকে তখন এরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত। কিন্তু যেমনি এদের নিয়ে কোন সজীব পদার্থের ওপর,—তা গাছপালাই হোক আর পোকামাকড়ই হোক বা পশুপাখি-মানুষই হোক,—ছড়িয়ে দেওয়া যায় অমনি ওরা 'জড়' থেকে 'জীবে' পরিণত হবে আর দ্রুতবেগে একটা থেকে দু'টো, দুটো থেকে চারটে, চারটে থেকে আটটা—এইভাবে বংশ বিস্তার শুরু করে দেবে। এ এক বিচিত্র কাণ্ড! তবে কি এরাই জড় আর জীবের মাঝামাঝি সেই খুঁজে-না-পাওয়া বস্তুটি—বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় 'মিসিংলিঙ্ক'? জড়তার জীবের যোগসূত্রই কি এই ভাইরাস?

বিজ্ঞানীরা এখন এই সত্যের সন্ধানে ব্যস্ত।

ডাক্তার কিষ্কিন্ধ্য

অশোক মুখোপাধ্যায়

দিদা বললেন, আজকে শোনাই আজব হনুর গল্প
সঙ্গগুণে হয়েছিল প্রায় সে নরকল্প।
বলছি এখন যে ঘটনা হুবহু তা সত্যি
তোদের দাদুর মুখে শোনা, বানাইনি একরত্তি।
উনি তখন ডাক্তারিতে পাস দিয়েছেন মাত্র ;
সতীর্থ অনেকগুলি, শিক্ষানবীশ ছাত্র ;
থাকেন সবাই হাসপাতালের ছাত্রাবাসের কক্ষে
তিনটি বছর পার করলেই পৌঁছে যাবেন লক্ষ্যে।
কাছেই ছিল স্বাধীনচেতা আরেক সহকর্মী
বৃক্ষবাসী শিক্ষানবীশ ওঁদের সমধর্মী—
ছুটত বটে এধার ওধার উড্ডীয়মান পুচ্ছে
উঠত বটে লম্ফ দিয়ে দ্বিতল গৃহের উচ্চে,
বিফল তবু হয়নি মোটে হাসপাতালের শিক্ষা
বাতায়নের ফাঁকে ফাঁকে গভীর জীবনবীক্ষা।
শয়ান বেডে সারি সারি নাচার রোগীবর্গ
দুই বেলা যান ভিজিট দিয়ে নানান বিশেষজ্ঞ,
ডাক্তার সেন, ডাক্তার পাল, ডাক্তার মালখণ্ডী
চক্রাকারে সারেন ওঁদের দৈনিক পাকদণ্ডী,
দ্যান ঔষধ-পথ্য-আদির যথাবিহিত ফর্দ
অর্ধেক তার পায় রোগীরা, লোপাট বাকী অর্ধ।

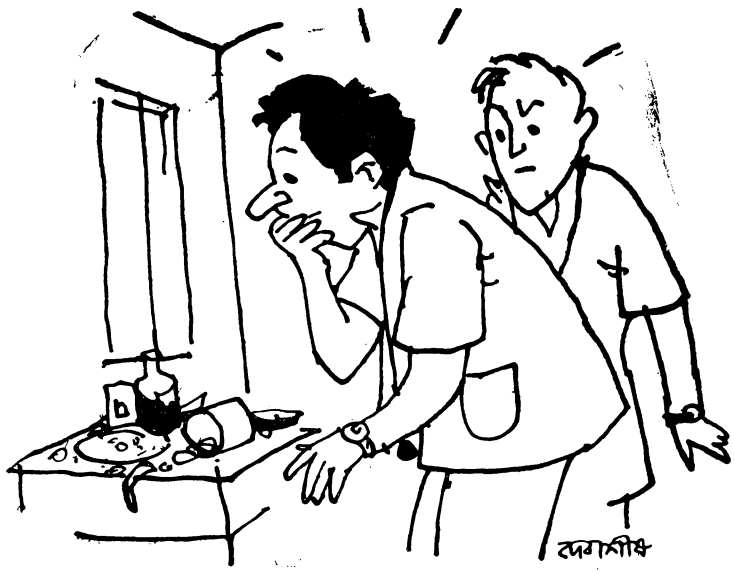

সঙ্গগুণে বানরও হয় নরের সমতুল্য
বিশেষ যদি পরিবেশের পায় সে আনুকূল্য।
প্রমাণ তারি মিলল প্রথম ছাত্রাবাসের কক্ষে
দিনের খাবার, সন্ধেবেলা আর পড়ে না চক্ষে,
দ্বিপ্রহরে সবাই যখন হাসপাতালে ব্যস্ত
মণ্ডা মেঠাই সাফ করে' যায় অদৃশ্য কার হস্ত,
রাখলে ঘরো পেস্তা বাদাম প্রোটিন পরিপূর্ণ
অবশিষ্ট থাকে কেবল শুকনো খোলা চূর্ণ।
আবিষ্কৃত অবশেষে ভোজনসুখে মগ্ন
টেথিস্কোপের সুদৃশ্য নল কণ্ঠদেশে লগ্ন
কিষ্কিন্ধার অধিবাসী—স্বাধীন এবং মুক্ত—
স্বইচ্ছায় এখন যিনি হাসপাতালে যুক্ত।
বামালসহ ধৃত তবু নেইকো বিকার চিত্তে
শিক্ষাগুণে স্বচ্ছন্দ এবম্প্রকার কৃত্যে।
শিক্ষাও যে গভীর কত বুঝল রোগীবৃন্দ
নিয়মিত ভিজিট দিতেই ডাক্তার কিষ্কিন্ধ্য।
সময়সূচী ইচ্ছামত, জানাননাকো পূর্বে
কোন্‌দিকে আজ পরিক্রমা—পশ্চিমে না পূর্বে,

কোন্ পথে যে দেখা দেবেন সেটাও অনির্দিষ্ট
জানলা, নাকি স্কাইলাইটেই হবেন তিনি দৃষ্ট ;
রোগীর চেয়ে রোগিনীদের দিকেই অধিক লক্ষ্য
স্বভাবতই অবলা তাই টানেন ওদের পক্ষ,
অতর্কিত আবির্ভাবে করেন ত্রাসের সৃষ্টি
বেড থেকে যান বেডান্তরে ঘূর্ণায়মান দৃষ্টি,
ছাখেন চেখে একে একে দিনের খোরাক: পথ্য
আপেল আঙ্গুর কদলী ও রসালো আমসত্ব,
সারগর্ভ সরেস: কিছু না যদি হয় লভ্য
কামড় দিয়েই বাতিল করেন অসার যত দ্রব্য,
দন্তপাটি জাহির করে' এমন ধরেন মূর্তি
রোগিনীরা আতংকে কাঠ, হয় না বাক্যস্ফূর্তি।
হাসপাতালের পরিদর্শক অরুণবরণ ইন্দ্র
এসেই খোঁজেন কোথায় আছেন ডাক্তার কিষ্কিন্ধ্য,
ডাক্তার সেন ডাক্তার পাল ডাক্তার মালখণ্ডী
মুখোমুখী হলেই গভীর আলোচনায় বন্দী—
কোথায় উনি ? কোন ওয়ার্ডে ভিজিট দিলেন অদ্য
ডাক্তারিতে এই আচরণ অতীব দুর্বোধ্য,
যুক্ত মিটিং ডাকুন না হয়—সেটাই যুগধর্মী
ডাকুন পুলিস, ফায়ার ব্রিগেড, জুগার্ডেনের কর্মী,
মোদ্দা কথা রাখাতো চাই হাসপাতালের স্বাস্থ্য
না হয় ডাকুন সৈন্যদলই, একটি প্ল্যাটুন আস্ত।

এমনি গভীর আলোচনায় সবাই যখন ব্যস্ত
রোগী এবং ডাক্তারেরা সমান বিপদগ্রস্ত,
প্রতিষ্ঠানের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে
এলেন মহান মহানুভব ছোটোলাটের পক্ষে
বিপুল-বপু উড্রোসাহেব মুখ্য উপদেষ্টা
রাজদ্রোহ দমনই যাঁর একমাত্র চেষ্টা।
রাজ অতিথির আগমনে ব্যস্ত শ্রীযুত ইন্দ্র
খোঁজ নেননি কোথায় আছেন ডাক্তার কিষ্কিন্ধ্য,

তার চেয়ে যা গুরুতর, খোঁজ নেন নি অগ্রে
হাসপাতালে সক্রিয় কে স্বদেশীদের চক্রে,
কারণ তখন স্বদেশপ্রেমের ঢল নেমেছে বঙ্গে
গোপন লড়াই চলছে শাসক ইংরেজদের সঙ্গে
হঠাৎ হঠাৎ ফাটছে বোমা, দুড়ুম গুলি ছুটছে
শক্ত যতই হচ্ছে বাঁধন ততই বাঁধন টুটছে।
ক্রান্তিকালে কে থাকে আর উদাস অনাসক্ত
ছাত্রদলেও ছিলেন কিছু বিপ্লবীদের ভক্ত,
হাসপাতালের খাসমহলেই গোপন সভা বসত
লক্ষ একই—ইংরেজদের করো ব্যতিব্যস্ত ;
সম্মানীয় রাজঅতিথির আপ্যায়নের জন্য
কাজেই ওঁরা পথ ধরলেন একেবারেই অন্য।
প্রথম হবে রাজপতাকা উত্তোলনের কৃত্য
প্রবেশপথে সেই কারণে চিহ্নিত এক বৃত্ত,
রাজভক্তির বিজয় নিশান রেশম-চিকন বস্ত্রে
উড্রোসাহেব স্বয়ং এসে ওড়াবেন স্বহস্তে ;
সুসজ্জিত থাকবে সবই, তার মধ্যে বাড়তি
লুক্কায়িত সুকৌশলে বোম্-পটকা চারটি,

স্যর উড্রোর রাজপতাকা উত্তোলনের সঙ্গে
সশব্দ বিস্ফোরণে রাষ্ট্র হবে বঙ্গে,
রেশমী ধ্বজার দিন বিগত, চাই স্বদেশী ঝাণ্ডা
ইংরেজরা ভারত ছাড়ো, আমরা নাছোড়বান্দা!
হিসাবমত ঘটত সবই, যদি শ্রীযুত ইন্দ্র
খোঁজ রাখতেন কোথায় আছেন ডাক্তার কিষ্কিন্ধ্য,
কারণ সেদিন পরিক্রমায় যান নি কোনো কক্ষে
কাছেই ছিলেন বৃক্ষশাখায় কৌতূহলী চক্ষে,
বোঝেননি ঠিক রাজপতাকা উত্তোলনের মর্ম
ভেবেছিলেন তাঁকেই সাজে এই সুমহান কর্ম,
উড্রোকে তাই উল্টে ফেলে প্রবেশ পথের প্রান্তে
বীরদর্পে উল্লাঙ্গুল রজ্জু কষে' টানতে
বিস্ফোরণের বিকট রবে হুলুস্থুলুস কাণ্ড
উড্রো ভুঁয়ে গড়াগড়ি ঠিক যেন কুষ্মাণ্ড,
ভূলুণ্ঠিত রাজপতাকা—পড়েছে মুখ থুবড়ে
তফাৎ থেকে ইন্দ্র চ্যাঁচান, বেঁচেছি আজ খুব রে
উদ্‌ভ্রান্ত গোয়েন্দাকুল, ত্রস্ত পুলিসবৃন্দ—
হট্টগোলে রাজদ্রোহী ডাক্তার কিষ্কিন্ধ্য
সেই যে উধাও তড়িতগতি লম্ফ দিয়ে উচ্চ
যায়নি দেখা আর কখনো লম্বিত তাঁর পুচ্ছ,
আসেননি আর রাউণ্ড দিতে রোগিনীদের কক্ষে
অমর তবু কীর্তি আজো বঙ্গবাসীর বক্ষে।

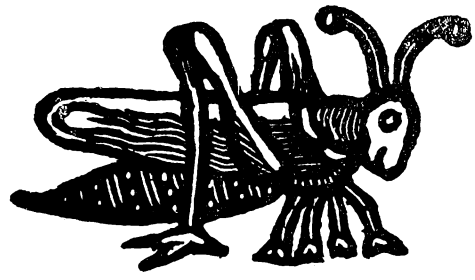

ভক্তের খোঁয়াড়

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

আমি তখন খুব ছোট। আমাদের বাড়ির কাছে একটা পাঠশালা ছিল, তার মাস্টার মশাই ছিলেন ভক্তি ভূষণ খাঁড়া। ভক্তি বাবুকে সবাই ভক্ত বাবু বলত। আর পাঠশালাটাকে বলত ভক্তের খোঁয়াড়। হাতে খড়ির পর আমিও সেই ভক্তের খোঁয়াড়ে ভর্তি হয়েছিলাম।

একদিন পাঠশালায় গিয়ে দেখি ভক্তবাবু তখনও আসেন নি, আর সেই সুযোগে দুটো ছেলেতে দারুন মারামারি লাগিয়ে দিয়েছে। ছেলে দুটো ছিল ভয়ানক দুষ্টু। তাদের ঘিরে তখন অন্যান্য ছেলেদের ভিড়। সেই ভিড়ে আমিও উঁকি মেরে যেই না তাদের মারামারি দেখতে গেছি অমনি একটা ছেলের ঘুসি এসে লাগল আমার নাকে। ছেলেটা ছিল আমার থেকে বড়। তাই ঘুসির চোটে নাক দিয়ে গল গল করে রক্ত পড়তে লাগল। আমি তো কাঁদতে কাঁদতে রক্তাক্ত দেহে ফিরে এলুম। পাঠশালা থেকে বাড়ি ফেরার পথে একটি হরিসভার মাঠ ছিল। সেই মাঠে মঞ্চের বেদীতে রোগা লম্বা কালো মতো লুঙ্গি পরা একজন লোক প্রায়ই বসে থাকত। সেদিনও বসেছিল সে। আমাকে ঐভাবে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি আসতে দেখে লোকটি বলল—'এই খোকা, শোন্ এদিকে। কি হয়েছে তোর ?'

লোকটিকে দেখলে কেমন যেন ভয় করত আমার। তাই ভয়ে ভয়ে কাছে গেলাম। যেতেই লোকটি বলল—'এ হে হে হে। একেবারে রক্তে ভেসে যাচ্ছে! কে মেরেছেরে তোকে ?'

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম—'একটা ছেলে।'

লোকটির চোখ মুখ কি রকম যেন লাল হয়ে উঠল। বলল—'কি এতদূর স্পর্ধা! আমি বেঁচে থাকতে আমার ভায়ের গায়ে হাত দেওয়া ? চলত দেখি কে।'

আমি আর কি করি ? ভয়ে ভয়েই লোকটিকে পাঠশালায় নিয়ে এলাম।

লোকটি বলল—'কই, কে মেরেছেরে তোকে ?'

অন্যান্য ছেলেরা তখন মহা উৎসাহে দেখিয়ে দিল—'ঐ যে। ঐ ছেলেটা।'

লোকটি ছেলেটার কাছে গিয়ে শাসনের ভঙ্গিতে বলল—'জানিস তুই কার গায়ে হাত দিয়েছিস এ আমার ভাই। আমার ভাইয়ের গায়ে হাত দেওয়ার মজাটা একবার দেখ।' বলেই ছেলেটার চুলের মুঠি ধরে ঠাস ঠাস করে চড়াতে লাগল সে।

ছেলেটি আমার থেকে একটু বড় হলেও ছোট তো, কাজেই অত বড় একটি লোকের হাতে মার খেয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে তার পা দুটি জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল—'আর মেরো নাগো। আমি মরে যাবো আমি আর কখনো মারামারি করব না। আমাকে ছেড়ে দাও। তোমার পায়ে পড়ি।'

পাঠশালা শুদ্ধু ছেলে তখন মার দেখে ভয়ে কাঁপছে।

লোকটি তো রাগের বশে ছেলেটিকে প্রায় আধমরা করে মেরে কান ধরে ওঠ বোস করিয়ে অন্যান্য ছেলেগুলোকেও বেশটি করে ধমক ধামক দিয়ে চলে গেল। যাবার আগে আমাকে বলে গেল—'এরপর কেউ কখনো যদি তোর গায়ে হাত দেয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ডাকবি। আমি তোর দাদা। কেমন?'

লোকটি চলে যাবার পরই ভক্তবাবু এসে হাজির হলেন।

আমার তখন বুকের জামা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ঐ ছেলেটিরও কচি দাঁত ভেঙে বুক মুখ ভেসে যাচ্ছে। আমার চেয়েও তার অবস্থা আরো খারাপ। সে না পারছে উঠে বসতে, না দাঁড়াতে। মাটিতে উপুড় হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

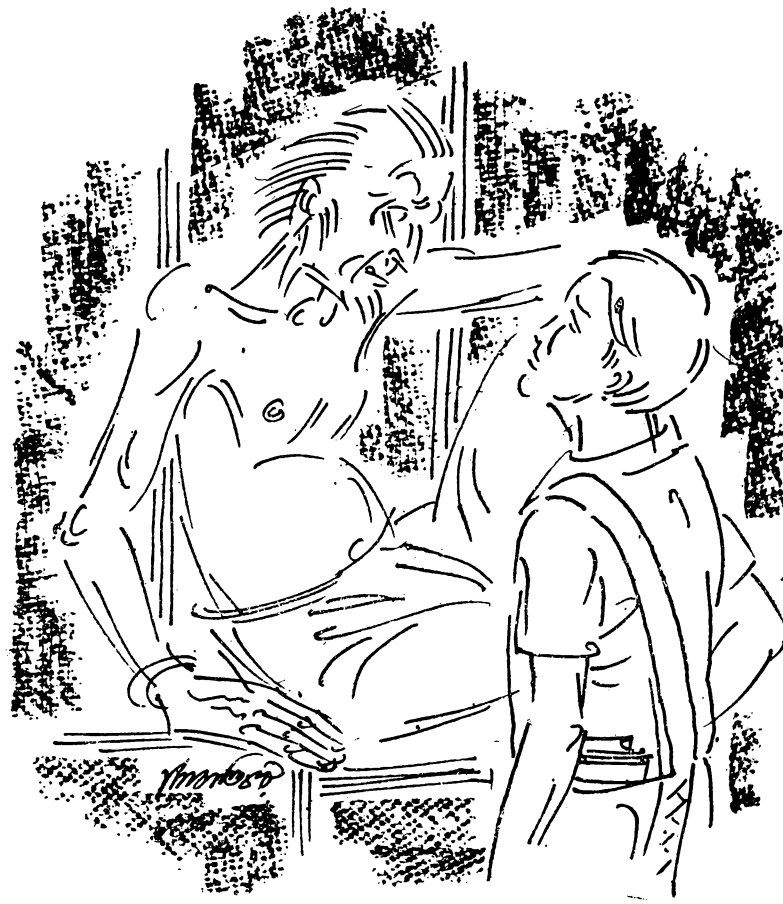

ভক্তবাবু কুয়ো থেকে জল তুলে ছেলেটির মুখে চোখে দিলেন। আমারও রক্ত ধুয়ে দিলেন।

চারিদিকে তখন ভিড়ে ভিড়। খবর পেয়ে ছেলেটির বাড়ির লোকেরা ছুটে এল। তারপর অন্যান্য ছেলেদের মুখে সব শুনে তারা তো আমার বাড়ির লোকের উদ্দেশ্যে যা তা গালাগালি দিতে লাগল।

ভক্তবাবু বললেন—'আরে মশাই, আমি ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না। এর আবার দাদা এলো কোথা থেকে? এর মা-বাবার এই একটি মাত্র ছেলে।'

ওরা বলল—'ওসব

কথা শুনতে চাই না আমরা। ওর বাড়ি আমাদের দেখিয়ে দেবেন চলুন। না হলে আমরা থানায় যাবো। আপনার এই খোঁয়াড় বন্ধ করে দেব আমরা।'

অগত্যা ভক্তবাবু আমাকে কোলে নিয়ে সেই ছেলেটির বাড়ির লোকদের সঙ্গে করে আমাদের বাড়ির দিকে চললেন। অন্যান্য কুচো কাচার দলও সব কল বল করতে করতে চলল।

হরিসভার মাঠের কাছে আসতেই দেখা গেল সেই লোকটি আগের মতোই ঠিক সেইখানে মঞ্চের বেদীতে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে।

তাকে দেখেই ছেলেরা বলে উঠল—'ঐ তো। ঐ লোকটা মেরেছে।'

যেই না বলা লোকটি অমনি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে একটা থান ইঁট কুড়িয়ে এনে চোখ রাঙিয়ে বলল—'অ্যাই এক পাও এগোবে না কেউ। আমার মাথায় খুন চেপে আছে। যে এগোবে তারই মাথা ফাটাবো। আমার ভাইকে মারা!'

দেখেই তো চক্ষুস্থির সকলের। এ কিরে বাবা! সবাই অবাক হয়ে বলল—'এ তো অনিল পাগলা!'

ভক্তবাবু বললেন—'আমি তো আগেই বললুম মশাই এর কোন দাদা টাদা নেই। দেখুন দিকিনি পাগলের কাণ্ড খানা। পাগল না হলে কেউ একটা বাচ্ছা ছেলেকে এইভাবে মারে?'

সেই ছেলেটির বাড়ির লোকেরা তখন অনেক ধমক ধামক করল অনিল পাগলকে।

ভক্তবাবু বললেন—'ছিঃ অনিল। একি করেছিস বলতো? এইভাবে মারে ছেলেটাকে'

অনিল চোখ মুখ পাকিয়ে বলল—'কি ভাবে মারবে তাহলে? আমার সঙ্গে চালাকি নয়। আমার ভাইকে যে মারবে তার মাথাটা আমি এমনি, এমনি, এমনি করে ফাটিয়ে দেবো।' বলে ইঁটটাকে ঠক ঠক করে মঞ্চের গায়ে তিনবার ঠুকে পাশেরই একজনদের পাঁচিলের মাথায় রেখে বলল—'এই ইঁট আমি রেখে গেলুম, যে এই ইঁটে হাত দেবে তাকেই কেটে ফেলব আমি।' বলে হন হন করে চলে গেল।

সেই ছেলেটির বাড়ির লোকেরাও ফিরে গেল তখন,

ভক্তবাবু অন্যান্য ছেলেদের পাঠশালায় ফিরে যেতে বলে আমাকে আমার মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে এলেন।

সেই থেকে পাঠশালার ছেলেরা আমাকে যমের মতো ভয় করত। কোনো ছেলে কখনো ভুলেও কিছু বলতো না। আর অনিল পাগলা? তার আর আমার উপর থেকে টান গেলনা। এমন কি আমি যখন বড় হলাম, তখনও কোচিং থেকে পড়ে ফিরতে দেরি হলে রাতভিত অন্ধকারে ও আমাকে বাড়ির কাছ অব্দি এগিয়ে দিত। কারো বাড়ি সত্যনারায়ণের প্রসাদ দিতে গেলে ও আমার কাছ থেকে সির্নি বাতাসা চেয়ে খেত। তারপর একদিন মারা গেল অনিল।

আমি কিন্তু আজও ভেবে পাই না ঐ রকম একটা পাগলের বুকে অমন আশ্চর্য ভালোবাসা কি করে জেগেছিল।

প্যারী শহরে দেখানো

ম্যাজিক

যাদুকর এ. সি. সরকার

প্যারী শহরে দেখার জিনিসের অন্ত নাই। ফরাসী দেশের রাজধানী এই প্যারী নগরী। সৌন্দর্য-প্রিয় ফরাসী জাতির প্রিয় শহর। নানা শিল্প নিদর্শন দিয়ে ফরাসীরা সাজিয়ে রেখেছেন তাঁদের রাজধানীকে। আর্ক দ্য ত্রিয়ম্ফ, নেপোলিয়নের সমাধি ও আরো কত শিল্প স্থাপত্য কীর্তি ছড়িয়ে রয়েছে এ শহরের এখানে ওখানে তবুও কিন্তু লোকে বলতে বলে শুধু একটি কথা—এফেল টাওয়ার! স্যেন নদীর তীরে ইস্পাতে তৈরী গগনচুম্বী মিনার এই এফেল টাওয়ার। ভ্রমণকারীদের বিশেষ আকর্ষণীয় স্থান হচ্ছে এর উপরকার রেস্তোঁরা।

এক শনিবারের সকালে এই এফেল টাওয়ারের উপরকার রেস্তোঁরায় বসে কফি খাচ্ছি এমন সময় এক পরিচিত সাংবাদিক বন্ধু এসে বসলেন পাশে। তাঁর জন্য এক কাপ কফির অর্ডার দিয়ে হাসি মুখে তাঁকে স্বাগত জানালাম। যথারীতি পরিচারিকা কফির কাপ নিয়ে এলো।

সাংবাদিক বন্ধুটি উচ্ছ্বসিত ভাষায় তার কাছে সবিস্তারে আমার পরিচয় দিয়েই আমাকে ফেললেন বিপদে। অল্পক্ষণের মধ্যেই পরিচারিকা মহোদয়া তার আরো তিন চারজন সঙ্গিনীকে সঙ্গে নিয়ে এসে উপস্থিত হলো।

বিনীত ভাবে তারা অনুরোধ জানাতে থাকে ম্যাজিক, একটা ম্যাজিক তাদের তক্ষুনি দেখাতে হবে। আমার পকেটে সব সময়েই প্রস্তুত থাকে ছোট খাট সহজ অথচ চমকে দেবার মত দু একটি যাদুর সরঞ্জাম। তাদের অনুরোধে তাই সাড়া দিতে আপত্তি করি না। সঙ্গে সঙ্গেই ওভারকোটের পকেট থেকে বের করি একটা ছোট রাইটিং প্যাড আর একটা শক্ত সীসওয়ালা পেন্সিল। প্যাড আর পেন্সিল সামনের মহিলাটির হাতে দিয়ে আমাকে না দেখিয়ে ঐ প্যাডের ওপরে তাকে যে কোন একটি নাম লিখতে অনুরোধ করলাম। আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে মহিলাটি প্যাডের পাতায় কিছু লিখলো আর লেখা পাতাটি ছিঁড়ে নিয়ে প্যাডটা আমাকে দিয়ে দিলো। এর পরে আমার উপদেশমত সে কাগজটাকে সাবধানে মুড়ে নিজের হাতের মুঠোয় ধরে থাকলো আর নিবিষ্টমনে চিন্তা করতে থাকলো তার লেখা নামটার বিষয়ে। এই অবসরে আমি একবার পাশের কামরায় চলে গেলাম আর সেখানে বসে প্যাডে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে সকলের অজান্তে একটা কিছু লিখে ভাঁজ করে হাতে নিয়ে ফিরে এলাম ওদের কাছে।

ফিরে এসে ওদের একজনের হাতে আমার লেখা কাগজটা দিয়ে পড়তে বললাম আমার নির্দেশমত সে তার উপরকার লেখাটা পড়লো। সবাই অবাক। আমাকে না দেখিয়ে তারা যে নামটি

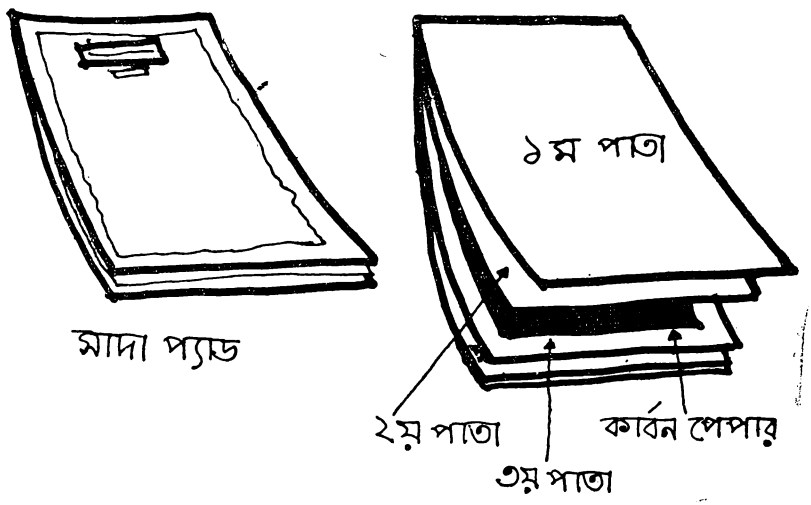

লিখে রেখেছে আমি আমার যাদুর প্রভাবে তা জানতে পেরে অন্য কামরা থেকে তা লিখে নিয়ে এসেছি! কেমন করে এ সম্ভব?

'এ কি ইচ্ছাশক্তি বা সম্মোহনের ব্যাপার?' ফেরার পথে প্রশ্ন করেন আমার সাংবাদিক বন্ধু।

কোন উত্তর না দিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে ধরি রাইটিং প্যাডখানা। প্যাডের পাতার মাপের চেয়ে সামান্য ছোট এক টুকরো পাতলা কারবন পেপার দেখা যায় প্যাডের ভেতরে।

'ও এই ব্যাপার'—উচ্ছ্বাসভরে চেঁচিয়ে ওঠেন বন্ধু।

প্যাডের ওপর থেকে দুটো পাতা বাদ দিয়ে তার পরে আমি ঢুকিয়ে দিই এই কার্বন পেপারটা। এর পরে আমার হাত থেকে শক্ত সীসওয়ালা পেন্সিলটা নিয়ে তার সাহায্যে তিনি প্রথম পাতায় লিখলেন তার নাম—রনো, আর ছিঁড়ে নিলেন প্রথম পাতা। হাতে প্যাড ফেরত নিয়ে আমি দ্বিতীয় পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে কার্বন পেপারটা তুলে ফেলতে তৃতীয় পাতার উপরে আবিষ্কার করলাম কার্বনের ছাপ—রনো। সাদা দ্বিতীয় পাতার উপরে এবার আমি নিজের হস্তাক্ষরে লিখি—রনো।

এমনি করেই সাংবাদিক বন্ধুর কাছে ফাঁস করি এই অদ্ভুত যাদুর খেলার মূল রহস্য।

চেষ্টা করে দেখ, তোমরাও এ ম্যাজিকটা দেখিয়ে বন্ধুদের খুব অবাক করে দিতে পারবে। মনে রেখো পেন্সিলটা খুব হার্ড হওয়া চাই॥

রাজা ও পারিষদ

রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

শীতের সন্ধ্যা ছায়া ঘেরা ধরা
আকাশে তারার মেলা
কুলু কুলু স্বরে নদী বহে যায়
বাতাস করিছে খেলা।
জ্যোৎস্না আলোয় মাতাল ধরণী
মহুয়া নেশায় ঢোলে,
বসে আছে রাজা, পারিষদ দল
ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে।
'সব সেরা রাজা আপনার মত
রাজা এ জগতে নাই'
শুনে রাজা ভাবে পারিষদদলে
শিক্ষা দেওয়াতো চাই,
বলিলেন ধীরে, 'আচ্ছা বলতো,
সবে মানে মোর কথা ?'
পারিষদ বলে 'এ কথা বলিয়া
কেন মনে দেন ব্যথা ?'
আকাশ বাতাস, শোনে তব কথা,
নদী চলে তব মতে
সাগরের জল, তব বাণী পেয়ে
চলে তবে নিজ পথে।'

শীতের সন্ধ্যা, হিম ঝরে ঐ
বাতাস করিছে খেলা,
ধরা হিম্ হিম্, চোখে নামে ঝিম,
চাঁদ তারাদের মেলা।
গম্ভীর স্বরে, কন রাজা সবে—
'সম্মুখ পানে চাও,
নদীর জলেরে হুকুম দিতেছি
নদী তুমি ফিরে যাও।'
কে শুনিবে কথা, কুলু কুলু সুরে
নদী বহে চলে ধীরে
ঢেউ গুলি তার ছুটে আসে তীরে
গেল নাতো সেতো ফিরে।
হাসিলেন রাজা, চাটুকার সবে
মাথা নিচু করে রয়।
বলিলেন রাজা—'শুন চাটুকার
নদী নিজ মনে বয়,
তোমরা আমার হতে পার দাস,
প্রকৃতি নয়তো দাসী—
ভুল করে সবে ভেবেছিলে আমি
চাটু কথা ভালবাসি,

সর্বপ্রধান

আদিনাথ নাগ

দত্ত বলেন, ডেকচিতে নয়,
কিংবা হাঁড়ি-কড়াই-এ নয়,
তাঁর বাড়িতে ভাত রাঁধা হয়
আসলি চাঁদির তিজেলে।
কয়লা-গ্যাসের নেই ব্যবহার,
উনান ধরান ভিজেলে।
পাল-মহাশয় অমনি শোনান,
তাঁর বাড়িতে ধরান উনান
আকন্দি-কাঠ-কয়লা দিয়ে
রোজই সকাল-বিকেলে।
রান্না করার বাসন-কোসন
সব বানানো নিকেলে।
এসব শুনে বলেন ঘোষাল,
তাঁর আছে এক সৌর-মশাল।
সুপার-সনিক রশ্মি দিয়ে
কাজ চলে তাঁর হেঁশেলে।
দত্ত ও পাল নিলেন মেনে—
সর্বপ্রধান গেঁজেল এ।

জাদুকরের রঙ্গ

অশোক হালদার

কে বলে এই হাত বাড়ালে
আকাশ ছোঁয়া যায়না ?
উড়ুক্কু রোদ-পাখির ডানায়
আকাশ যখন আয়না
তখন ছোট্ট হাত ধরে' সে
পৌঁছে দেবে আলোয় ভেসে
জাদুরই সাম্রাজ্যে ;
আকাশে তা'র পৌঁছে দেওয়া
একমাত্র কাজ যে।
সেই জাদুকর ডাকছে, কে তার
ঘোড়ার লাগাম ধরবে !
ধরবে যে সে পৌঁছে যাবে
আকাশে সগর্বে—
দেখবে আকাশ বন্ধু ঠিকই,
এই আঁধার, এই ঝিকিমিকি,
ছোট্ট মনে দুঃখ সুখে
খুঁজছে নিবিড় সঙ্গ ;
আঁধার কাঁদার ধাঁধার আধার—
জাদুকরের রঙ্গ।

বেঙ্গলিয়নের চিঠি

সত্যজিৎ রায়

ফেলুদার রহস্য অ্যাডভেঞ্চার

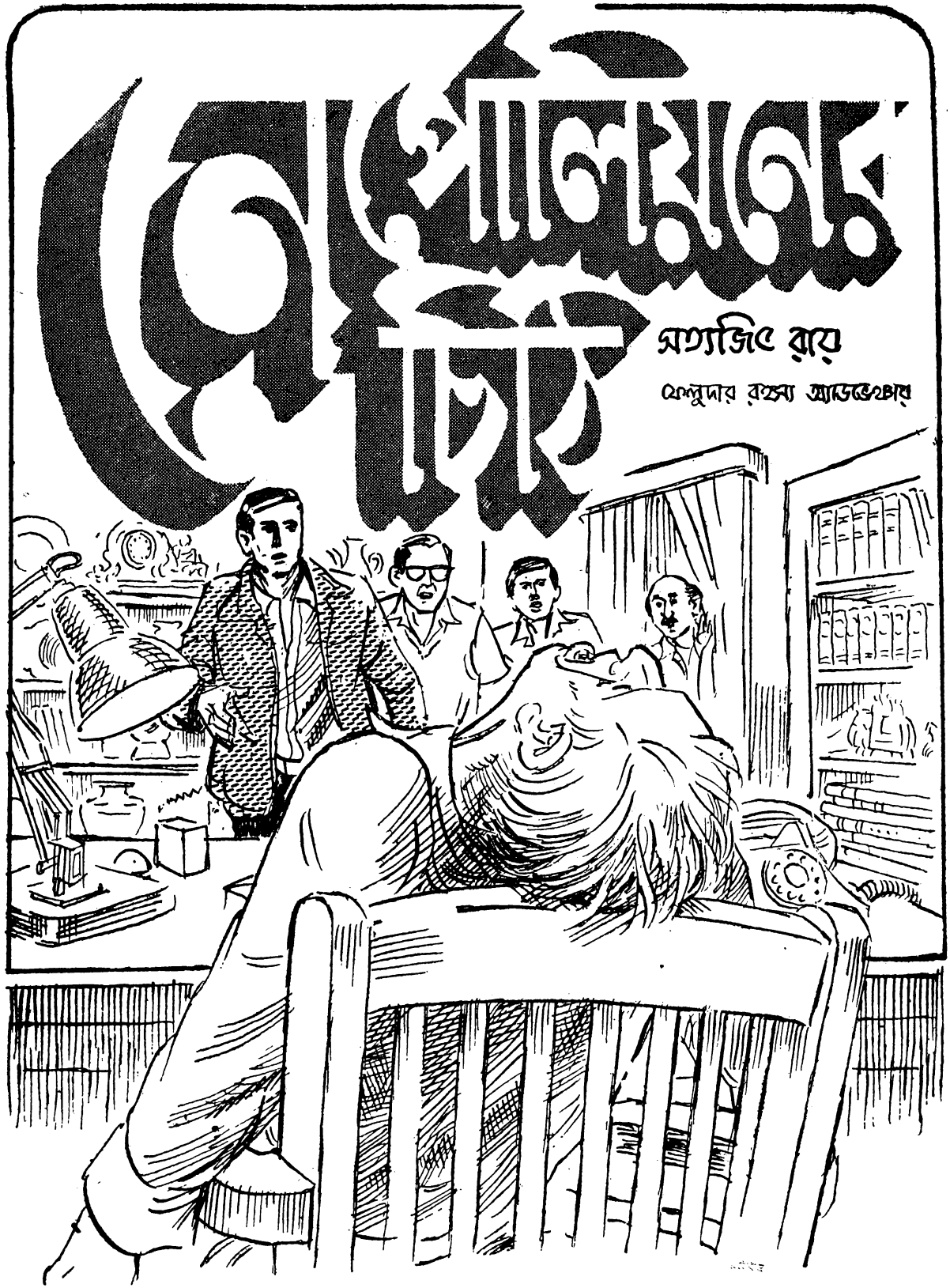

॥ ১ ॥

'তুমি কি ফেলুদা?'

প্রশ্নটা এল ফেলুদার কোমরের কাছ থেকে। একটি বছর ছয়েকের ছেলে ফেলুদার পাশেই দাঁড়িয়ে মাথাটাকে চিৎ করে তার দিকে চেয়ে আছে। এই সেদিনই একটা বাংলা কাগজে ফেলুদার একটা সাক্ষাৎকার বেরিয়েছে, তার সঙ্গে হাতে চার মিনার নিয়ে একটা ছবি। তার ফলে ফেলুদার চেহারাটা আজকাল রাস্তাঘাটে লোকে ফিল্মস্টারের মতোই চিনে ফেলছে। আমরা এসেছি পার্কস্ট্রীট আর রাসেল স্ট্রীটের মোড়ে খেলনা আর লাল মাছের দোকান হবি সেন্টারে। সিধু জ্যাঠার সত্তর বছরের জন্মদিনে তাঁকে একটা ভালো দাবার সেট উপহার দিতে চায় ফেলুদা।

ছেলেটির মাথায় আলতো করে হাত রেখে ফেলুদা বলল, 'ঠিক ধরেছ তুমি।'

'আমার চন্দনা কে নিয়েছে বলে দিতে পার?' বেশ একটা চ্যালেঞ্জের সুরে বলল ছেলেটি। ততক্ষণে ফেলুদারই বয়সী এক ভদ্রলোক ব্রাউন কাগজে মোড়া একটা লম্বা প্যাকেট নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছেন, তাঁর মুখে খুশির সঙ্গে একটা অপ্রস্তুতভাব মেশানো।

'তোমার নিজের নামটাও বলে দাও ফেলুদাকে,' বললেন ভদ্রলোক।

'অনিরুদ্ধ হালদার,' গম্ভীর মেজাজে বলল ছেলেটা।

'ইনি আপনার খুদে ভক্তদের একজন,' বললেন ভদ্রলোক। 'আপনার সব গল্প ওর মার কাছ থেকে শোনা।'

'চন্দনার কথা কী বলছিল?'

'ও কিছু না,' ভদ্রলোক হালকা হেসে বললেন, 'পাখি পোষার শখ হয়েছিল, তাই ওকে একটা চন্দনা কিনে দিয়েছিলাম। যেদিন আসে সেদিনই কে খাঁচা থেকে পাখিটা বার করে নিয়ে যায়।'

'খালি একটা পালক পড়ে আছে,' বলল ফেলুদার খুদে ভক্ত।

'তাই বুঝি?'

'রাত্তিরে ছিল, সকাল বেলা নেই। রহস্য।'

'তাই ত মনে হচ্ছে। তা অনিরুদ্ধ হালদার এই রহস্যের ব্যাপারে কিছু করতে পারেন না?'

'আমি বুঝি গোয়েন্দা? আমি ত ক্লাস টু-তে পড়ি।'

ছেলের বাবা আর বেশি কথা এগোতে দিলেন না।

'চল অনু। আমাদের আবার নিউ মার্কেট যেতে হবে। তুমি বরং ফেলুদাকে একদিন আমাদের বাড়িতে আসতে বল।'

ছেলে বাবার অনুরোধ চালান করে দিল। এবার ভদ্রলোক একটা কার্ড বের করে ফেলুদার হাতে দিয়ে বললেন, 'আমার নাম অমিতাভ হালদার।'

ফেলুদা কার্ডটায় একবার চোখ বুলিয়ে বলল, 'বারাসতে থাকেন দেখছি।'

'আপনি হয়ত আমার বাবার নাম শুনে থাকতে পারেন। পার্বতীচরণ হালদার।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। ওঁর লেখা-টেখাও ত পড়েছি। ওঁরই সব নানারকম জিনিসের কালেকশন আছে না?'

'ওটা বাবার নেশা। ব্যারিস্টারি ছেড়ে এখন ওসবই করেন। সারা পৃথিবী ঘুরেছেন ওই সবের পিছনে। আপনার ত অনেক ব্যাপারে ইয়ে আছে, আমার মনে হয় আপনি দেখলে আনন্দ পাবেন। আদ্যিকালের গ্রামোফোন, মুগল আমলের দাবা বড়ে, ওয়ারেন হেস্টিংসের নস্যির কৌটো, নেপোলিয়নের চিঠি···। তাছাড়া আমাদের বাড়িটাও খুব ইনটারেস্টিং। দেড়শো বছরের পুরোন। একদিন যদি ফ্রী থাকেন, একটা ফোন করে দিলে—রোববার-টোববার··। আমিই বরং একটা ফোন করব। ডাইরেকটরিতে ত আপনার—?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার নামেই আছে। এই যে।'

ফেলুদাও তার একটা কার্ড ভদ্রলোককে দিয়ে দিল।

কথা হয়ে গেল আমরা এই মাসেই একদিন বারাসত গিয়ে হাজির হব। লালমোহনবাবুর গাড়ি আছে, যাবার কোনো অসুবিধে নেই। এখানে বলে রাখি লালমোহন বাবু বাহাল তবিয়তে এবং খোশমেজাজে আছেন, কারণ এই পুজোয় জটায়ু জায়ান্ট অমনিবাস বেরিয়েছে,

তাতে বাছাই করা দশটা সেরা রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাস। দাম পঁচিশ টাকা, এবং লালমোহনবাবুর ভাষায় 'সেলিং লাইক হট কচুরিজ।'

সন্ধ্যাবেলা ফেলুদার মুখ শুক্‌নো দেখে জিজ্ঞেস করলাম কী ব্যাপার। ও বলল, 'খুদে মক্কেলের আর্জিটা মাথায় ঘুরছে রে।'

'সেই চন্দনার ব্যাপারটা?'

'খাঁচা থেকে পাখি চুরি যায় শুনেছিস কখনো?'

তা শুনিনি সেটা স্বীকার করতেই হল।—'তুমি কি এর মধ্যেও রহস্যের গন্ধ পাচ্ছ নাকি?'

'ব্যাপারটা ঠিক দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে পড়ে না। চন্দনা ত আর বার্ড অফ প্যারাডাইজ নয়। এক যদিনা কারো নেগলিজেন্সে খাঁচার দরজাটা বন্ধ করতে ভুল হয়ে গিয়ে থাকে।'

'কিন্তু সেটাত আর জানবার কোনো উপায় নেই।'

'তা থাকবেনা কেন? ওখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই জানা যায়। আসলে বুঝতে পারছি এ ব্যাপারটা ও-বাড়ির কেউ সিরিয়াসলি নেয়নি। ঘটনাটা যে অস্বাভাবিক সেটা কারুর মাথায় ঢোকে নি। অথচ ছেলের মনটা যে খচ খচ করছে সেটা বুঝতে পারছি, না হলে আমায় দেখে ও কথাটা বলত না। অন্তত একবার যদি গিয়ে দেখা যেত…'

'তা ভদ্রলোক ত বললেনই যেতে।'

'হ্যাঁ—কিন্তু সেটাও হয়ত আমাকে সামনা সামনি দেখলেন বলে। বাড়ি ফিরে সে কথা আর মনে নাও থাকতে পারে। ছোট ছেলের অনুরোধ বলেই মনে হচ্ছে সেটাকে একেবারে এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়।'

ক্রিসমাসের যখন আর পাঁচদিন বাকি তখনই এক শনিবারের সকালে এসে গেল অমিতাভবাবুর ফোন। আমি কলটা ফেলুদার ঘরে ট্রানসফার করে বসবার ঘরের মেন টেলিফোনে কান লাগিয়ে শুনলাম।

'মিঃ মিত্তির?'

'বলুন কী খবর।'

'আমার ছেলে ত মাথা খেয়ে ফেলল। কবে আসছেন?'

'পাখির কোনো সন্ধান পেলেন?'

'নাঃ—সে আর পাওয়া যাবে না।'

'ভয় হয়, আপনার ছেলে যদি ধরে বসে থাকে তার পাখি উদ্ধার করে দেব, তখন সেটা না পাওয়া গেলে ত বেইজ্জতের ব্যাপার হবে।'

'সে নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। ছেলেকে খানিকটা সময় দিলেই সে খুশি হয়ে যাবে। আসলে আমার বাবার সঙ্গে একবার আপনার আলাপ করিয়ে দিতে চাই। আজ ত আমার ছুটি; আপনি কী করছেন?'

'তেমন কিছুই না। আজ দশটা নাগাৎ হলে হবে?'

'নিশ্চয়ই।'

শনি রবি দুদিনই আমাদের বাড়িতে সকাল ন'টায় লালমোহনবাবুর আসাটা একেবারে হাণ্ড্রেড পারসেন্ট শিওর। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় আসাটা কলকাতা শহরে আজকাল আর সম্ভব নয়, তবে দশ মিনিট এদিক ওদিকের বেশি হয় না কোনোদিনই। আজও হোল না। ঠিক নটা বেজে পাঁচ মিনিটে ঘরে ঢুকে ধপ্‌ করে সোফায় বসে পড়ে বললেন, 'কালি কলম মন, লেখে তিনজন। মশাই, পূজোর লেখার ধকলের পর শীতকালটা এলে লেখার চিন্তাটা থাউজ্যাণ্ড মাইলস দূরে চলে যায়—কালি কলম খাতার দিকে আর চাইতেই ইচ্ছা করে না।'

লালমোহনবাবু ইদানীং প্রবাদ নিয়ে ভীষণ মেতে উঠেছেন। সাড়ে তিনশো প্রবাদ নাকি উনি মুখস্থ করেছেন। লেখার ফাঁকে ফাঁকে লাগসই প্রবাদ গুঁজে দিতে পারলে সাহিত্যের রস নাকি ঘনীভূত হয়। তিনি অবিশ্যি শুধু লেখায় নয়, কথাতেও যখন তখন প্রবাদ লাগাচ্ছেন। আজ ভদ্রলোকের পরনে ছাই রঙের টেরিলিনের প্যাণ্ট তার সবুজ সোয়েটার, আর হাতে এক চাঙাড়ি কচুরি। কচুরির কারণ আর কিছুই না—হট কচুরির আজকাল আর তেমন ডিমাণ্ড আছে কিনা ফেলুদার এই প্রশ্নের উত্তরে লালমোহনবাবু বলেন, 'মশাই, বাগবাজারের মোহন ময়রার দোকানে কচুরির জন্য কিউ দেখলে মনে হবে সেখানে কোনো বোম্বাইমার্কা

হিন্দি হিট ছবি চলছে। আপনাকে খাওয়ালে বুঝবেন উপমাটা কত অ্যাপ্রোপ্রিয়েট।'

সঙ্গে এক ফ্লাস্ক জল আর কচুরির চাঙাড়িটা নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। লালমোহনবাবু পার্বতী হালদারের নাম শোনেন নি। তবে নেপোলিয়নের চিঠি শুনে ভয়ানক ইমপ্রেস্‌ড হলেন। বললেন ইস্কুলে থাকতে ওঁর হিরো নাকি ছিল নেপোলিয়ন। 'গ্রেট ম্যান, বোনাপার্টি' কথাটা বার তিনেক চাপা গলায় বললেন যাবার পথে।

তি আই পি রোডের আগে স্পীড তুলতে পারলেন না লালমোহনবাবুর ড্রাইভার হরিপদবাবু। বারাসতে যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় সাড়ে দশটা।

অমিতাভবাবুদের বাড়িটা মেন রোডের উপরেই, তবে গাছপালায় ঘেরা বলে আসল বাড়িটা রাস্তা থেকে চোখে পড়ে না। গেট দিয়ে ঢুকে নুড়ি ফেলা রাস্তায় খানিকটা গিয়ে তবে থামওয়ালা দালানটা দেখা যায়। একেবারে সাহেবী ঢং-এর বাড়ি, বয়সের ছাপ যতটা থাকার কথা ততটা নেই : মনে হয় বছরখানেকের মধ্যেই অন্তত সামনের অংশটায় চুণকাম ও রিপেয়ার দুইই হয়েছে। বাড়ির সামনে একটা বাঁধানো পুকুরের চারিপাশে সুপুরিগাছের সারি।

অমিতাভবাবু নিচেই অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য, ফেলুদা লালমোহনবাবুর সঙ্গে আলাপ করানোতে বললেন, 'আমি নিজে আপনার লেখা পড়িনি বটে, তবে আমার স্ত্রী রহস্য রোমাঞ্চ সিহিরের ভীষণ ভক্ত।'

আমরা শ্বেতপাথরের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলাম। পার্বতীবাবুর কালেকশনের জিনিস নাকি সবই দোতলায়।

'বাবার আগে আমার পুত্রের সঙ্গে দেখাটা সেরে নিন,' বললেন অমিতাভবাবু। 'বাবার কাছে এখন লোক আছে। উনি বাইরের লোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতগুলো সকালেই করেন।'

'অ্যাদ্দুরেও লোক এসে উৎপাত করে?'

'বাবার মতো কিছু কালেক্টর আছেন, তাঁরা প্রায়ই আসেন। তাছাড়া সম্প্রতি বাবা একজন সেক্রেটারির জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। তার জন্য কিছু লোক দেখা করতে আসছে।'

'ওনার সেক্রেটারি নেই?'

'আছে, তবে তিনি দিল্লী চলে যাচ্ছেন সামনের সপ্তাহে একটা ভালো কাজ পেয়ে। লোকটি বেশ কাজের ছিল। আসলে সেক্রেটারির ব্যাপারে বাবার লাক্‌টাই খারাপ। গত দশ বছরে চারটি সেক্রেটারি এল গেল। একটিত বছরখানেক কাজ করার পর মেনিনজাইটিসে মারা গেলেন। আরেকটি কথা নেই বার্তা নেই, সাইবাবার ভক্ত হয়ে বিবাগী হয়ে গেলেন। এখন যে ভদ্রলোকটির সঙ্গে বাবা কথা বলছেন, তাকে সাত বছর আগে তাড়িয়ে দেন। সেও ছিল সেক্রেটারি।'

'কেন, তাড়ান কেন?'

'ভদ্রলোক কাজ খুব ভালোই করতেন। তবে অসম্ভব কুসংস্কারী। বাবা সেটা একেবারে সহ্য করতে পারতেন না। একবার ঈজিপ্ট থেকে একটা জেড পাথরের মূর্তি আনার পর কলকাতায় এসে বাবার অসুখ করে। সাধনবাবু বাবাকে সিম্বিয়াসলি বলেন যে মূর্তিটি যে দেবীর, তার অভিশাপ পড়েছে বাবার ওপর। এই এক কথাতেই বাবা তাঁকে একরকম ঘাড় ধরে বার করে দেন।'

'এই সাধনবাবু যদি আবার এসে থাকেন তাহলে তাঁকে খুবই অপটিমিস্টিক বলতে হবে। এবং আপনার বাবাকে অত্যন্ত ক্ষমাশীল বলতে হয়।'

'আসলে লোকটাকে তাড়িয়ে দেবার পর বাবার একটু অনুশোচনা হয়েছিল। কারণ ভদ্রলোকের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। আর বাবা ওঁকে সার্টিফিকেটও দেন নি।'

বাড়িটা বাইরে থেকে বিলিতে ধাঁচের হলেও, ভিতরটা বাংলা জমিদারী বাড়ির মতোই। মাঝখানের নাট-মন্দিরকে ঘিরে দোতলায় বারান্দার এক পাশে সারি সারি ঘর। বৈঠকখানা, আর পার্বতীচরণের স্টাডি বা কাজের ঘর সামনের দিকে, আর ভিতর দিকে সব শোবার ঘর। ফেলুদার খুদে মক্কেল বারান্দায় তার ঘরের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা সেই দিকে এগিয়ে যাব, এমন সময় জুতোর শব্দ শুনে বৈঠকখানার দিকে চেয়ে দেখি

নীল কোট পরা হাতে ব্রীফকেসওয়ালা একজন লোক গটগটিয়ে ঘরটা পেরিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল। অমিতাভবাবু বললেন, 'এই সেই প্রাক্তন সেক্রেটারি সাধনবাবু। ভদ্রলোককে খুব প্রসন্ন বলে মনে হল না।'

'এই যে আমার পাখির খাঁচা,' ফেলুদা তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বলল অনিরুদ্ধ।

'আমি ত সেটাই দেখতে এলাম।'

খাঁচাটা একটা হুক থেকে ঝুলছে বারান্দায় রেলিং-এর উপরে। ঝকঝকে ভাবটা দেখে বোঝা যায় খাঁচাটাও কেনা হয়েছিল পাখির সঙ্গেই। ফেলুদা সেটার দিকে এগিয়ে গেল। দরজাটা এখনো খোলাই রয়েছে।

'আপনার বাড়ির কোনো চাকরের পাখিতে অ্যালার্জি আছে বলে জানেন?'

অমিতাভবাবু হেসে উঠলেন।

'সেটা ভাববার ত কোনো কারণ দেখি না। আমাদের বাড়ির কোনো চাকরই কুড়ি বছরের কম পুরোনো নয়। তাছাড়া এক কালে এ বাড়িতে এক সঙ্গে দুটো গ্রে প্যারট ছিল। বাবা নিজেই এনেছিলেন। অনেকদিন ছিল, তারপর মারা যায়।'

'এই ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন কি?'

ফেলুদা বেশ কিছুক্ষণ হাত দিয়ে খাঁচাটাকে নেড়ে চেড়ে প্রশ্নটা করল।

অমিতাভবাবুর সঙ্গে আমরা দুজনও এগিয়ে গেলাম।

ফেলুদা খাঁচার দরজাটার একটা অংশে আঙুল দিয়ে দেখাল।

'ছোট্ট একটা লালের ছোপ বলে মনে হচ্ছে?' বললেন অমিতাভবাবু। 'তার মানে কি—?'

'যা ভাবছেন তাই। ব্লাড।'

'চন্দনা মার্ডার?' বলে উঠলেন লালমোহনবাবু।

ফেলুদা খাঁচার দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'পাখির রক্ত না মানুষের রক্ত সেটা কেমিক্যাল অ্যানালিসিস না করে বোঝা যাবে না। তবে একটা স্ট্রাগ্‌ল হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অবিশ্যি সেটা তেমন অস্বাভাবিক কিছু নয়। এটা বোঝাই যাচ্ছে যে খাঁচার দরজা খোলা রাখার জন্য পাখি পালায় নি; দরজা খুলে পাখিকে বার করে নেওয়া হয়েছে। আপনারা কোত্থেকে কিনেছিলেন পাখিটা?'

'নিউ মার্কেট,' বলে উঠল অনিরুদ্ধ।

অমিতাভবাবু বললেন, 'নিউ মার্কেটের স্তিনকড়িবাবুর পাখির দোকান খুব পুরোন দোকান। আমাদের জানা শোনা অনেকেই ওখান থেকে পাখি কিনেছে।'

অনিরুদ্ধর ইচ্ছা ছিল তার নতুন কেনা খেলনাগুলো আমাদের দেখায়, বিশেষ করে মেশিনগানটা, কিন্তু অমিতাভবাবু বললেন, 'এঁরা আবার তোমার কাছে আসবেন। তখন তোমার খেলনা দেখবেন, তোমার মা-র সঙ্গে আলাপ করবেন, চা খাবেন—সব হবে। আগে দাদুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, কেমন?'

আমরা পার্বতীবাবুর স্টাডির উদ্দেশে রওনা দিলাম।

কিন্তু দাদুর সঙ্গে আর আলাপ হল না। লালমোহনবাবু পরে বলেছিলেন এক-একটা ঘটনার শক্-এর এফেক্ট নাকি সারা জীবন থাকে। এটা সেইরকম একটা ঘটনা।

বৈঠকখানায় ঢুকেই বুঝেছিলাম চারিদিকে দেখবার জিনিস গিজগিজ করছে। সে সব দেখার সময় ঢের আছে মনে করে আমরা এগিয়ে গেলাম ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে পরদা দেওয়া স্টাডির দরজার দিকে।

'আসুন' বলে অমিতাভবাবু গিয়ে ঢুকলেন ঘরের মধ্যে। আর ঢোকামাত্র এক অস্ফুট চীৎকার দিয়ে উঠলেন—

'বাবা!'

ফেলুদার অমিতাভবাবুকে দুহাত দিয়ে ধরতে হল, কারণ ভদ্রলোক প্রায় পড়েই যাচ্ছিলেন।

ততক্ষণে আমরা দুজনেও ঘরে ঢুকেছি।

বিরাট মেহগনি টেবিলের পিছনে একটা রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন পার্বতীচরণ হালদার। তাঁর মাথাটা চিৎ, দুটো পাথরের মত চোখ চেয়ে আছে সিলিং-এর দিকে, হাত দুটো ঝুলে রয়েছে চেয়ারের দুটো হাতলের পাশে।

ফেলুদা এক দৌড়ে চলে গেছে ভদ্রলোকের পাশে। নাড়ীটা দেখার জন্য হাতটা বাড়িয়ে আমাদের দিকে ফিরে বলল, 'তোরা দৌড়ে গিয়ে ওই সাধন লোকটাকে আটকা··· দারোয়ানকে বল। দরকার হলে বাইরে রাস্তায় ছাখ,—'

আমার সঙ্গে সঙ্গে লালমোহনবাবুও ছুট দিলেন। মন বলছিল দশ মিনিট চলে গেছে, সে লোককে আর পাওয়া যাবে না—বিশেষ করে যদি সে খুন করে থাকে।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে প্রায় কোলিশন হয়েছিল। পরে জেনেছিলাম উনি পার্বতী চরণের বর্তমান সেক্রেটারি হৃষিকেশবাবু। দুজন অচেনা লোককে এই ভাবে তড়িঘড়ি নামতে দেখে তিনি কী ভাবলেন সেটা আর তখন ভাবার সময় ছিল না।

বাইরে কেউ নেই, রাস্তায়ও না, কারুর থাকার কথাও নয়। যেটা সবচেয়ে অদ্ভুত লাগল সেটা হল এই যে দারোয়ান জোর গলায় বলল গত দশ মিনিটের মধ্যে কেউ গেট দিয়ে বাইরে যায়নি। বাবুর কাছে লোক আসবে বলে সে সকাল থেকে ডিউটিতে রয়েছে, তার ভুল হতেই পারে না।

'চলো বাগানের দিকটা দেখি' বললেন লালমোহনবাবু, 'হয়ত কোথাও ঘাপটি মেরে আছে।'

তাই করলাম। দক্ষিণের পুকুরের ধার, পশ্চিমের গোলাপ বাগান, কম্পাউণ্ড ওয়ালের পাশটা, চাকরদের ঘরের আশেপাশে, কোথাও বাদ দিলাম না। পাঁচিল টপকানোও সহজ নয়, কারণ প্রায় আটফুট উঁচু।

হাল ছাড়তে হল।

সাধনবাবু উধাও।

॥ ২ ॥

পার্বতীবাবুকে মাথার উপর একটা ভারী জিনিস দিয়ে আঘাত মেরে খুন করা হয়েছে। এঁদের বাড়ির ডাক্তার সৌরীন সোম বললেন মৃত্যুটা হয়েছে মারার সঙ্গে সঙ্গেই। ভদ্রলোকের রক্তের চাপ ওঠা নামা করত, হার্টেরও গোলমাল ছিল।

ইতিমধ্যে পুলিশও এসে গেছে। ইনস্পেক্টর হাজরা ফেলুদাকে চেনেন। মোটামুটি খাতিরও করেন। সাধারণ পুলিসের লোক প্রাইভেট ইনভেসটিগেটরকে যেরকম অবজ্ঞার চোখে দেখে সেরকম নয়। বললেন, 'আমাদের যা রুটিন কাজ তা করে যাচ্ছি আমরা, যদি কিছু তথ্য বেরোয় ত আপনাকে জানাব।'

ফেলুদা বলল, 'যে ভারী জিনিসটা দিয়ে খুন করা হয়েছিল সেটা সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া করেছেন?'

হাজরা বললেন, 'তেমন ত কিছু দেখছি না আসে পাশে। খুনি সেই জিনিসটা নিয়েই ভেগেছে বলে মনে হচ্ছে।'

'পেপারওয়েট।'

'পেপারওয়েট?'

'একবার আসুন আমার সঙ্গে।'

হাজরা ও ফেলুদার পিছন পিছন আমরাও ঢুকলাম ঘরের মধ্যে।

ফেলুদা টেবিলের একটা অংশে আঙুল দিয়ে দেখাল।

সবুজ ফেল্টের উপর মিহি ধুলো জমে আছে। তারই একটা অংশে একটা ধুলোহীন গোল চাকতি। খুব ভালো করে লক্ষ না করলে বোঝা যায় না।

'অমিতাভবাবুকে জিগ্যেস করেছিলাম,' বলল ফেলুদা, 'একটা বেশ বড় এবং ভারী ভিক্টোরীয় আমলের কাচের পেপারওয়েট থাকত এই টেবিলের উপর। এখন নেই।'

'ওয়েল ডান, মিস্টার মিত্তির!'

'কিন্তু আসল লোক ত বেমালুম হাওয়া হয়ে গেল বলে মনে হচ্ছে,' ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল ফেলুদা।

হাজরা বললেন, 'নাম আর ডেস্‌ক্রিপশন যখন পাওয়া গেছে, তখন তাকে খুঁজে বের করতে অসুবিধা হবে না। তাছাড়া সে ত অ্যাপ্লিকেশন করেছিল; সেটা থেকে থাকলে ত তার ঠিকানাই পাওয়া যাবে। আমার মনে হয় দারোয়ান সত্যি কথা বলছে না। একটা সময় সে গেটের কাছে ছিল না; তখনই লোকটা পালিয়েছে। মেন রোডের উপর বাড়ি, হয়ত বেরিয়েই বাস পেয়ে গেছে। অবিশ্যি সে ছাড়াও ত আরো লোক এসেছিল সকালে। সাধনবাবু আসার ঠিক আগেই আরেকজন ভদ্রলোক এসেছিলেন। খুনটা তিনিও করে থাকতে পারেন।'

'কিন্তু পার্বতীবাবুকে মৃত দেখলে সাধনবাবু আর থাকবেন কেন?

'আপনি ত দেখেছেন ঘরটা; ও ত কিউরিওর দোকান মশাই। একজন লোক যদি অসৎ হয়, ও ঘরে ঢুকে মালিক মৃত দেখলে ত তার পোয়া বারো!'

'আপনি দেখলে বুঝতে পারবেন কোনো জিনিস গেছে কিনা?'

ফেলুদা প্রশ্নটা করল বর্তমান সেক্রেটারি হৃষিকেশ দত্তকে। ভদ্রলোক দশটার ঠিক আগে বেরিয়েছিলেন পোস্ট আপিসে দুটো জরুরী বিদেশী টেলিগ্রাম করতে। ফেরার পরেই আমাদের সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা হয়।

'তা হয়ত পারতে পারি,' বললেন হৃষিকেশবাবু। 'বাইরের যা জিনিস তা মোটামুটি সবই আমার জানা। ভিতরে আলমারি বন্দী জিনিসেরও একটা তালিকা একবার আমাকে দিয়ে করিয়েছিলেন মিঃ হালদার। তার কিছু জিনিস বোধ হয় আজ পেস্টনজীকে দেখাবার জন্য বার করেছিলেন। পেস্টনজী আসেন সাড়ে নটায়।'

'এই পেস্টনজীর সঙ্গে কি আগেই আলাপ ছিল পার্বতীবাবুর?'

'খুব। প্রায় দশ বছরের আলাপ। মাসে অন্ততঃ দুবার করে আসতেন। উনিও একজন কালেকটার। মিঃ হালদারের সংগ্রহে একটা চিঠি ছিল, সেটা দেখতেই ভদ্রলোক আসেন।'

'এটা কি সেই নেপোলিয়নের চিঠি?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা কি মিঃ হালদার বিক্রী করার কথা ভাবছিলেন?'

'মোটেই না। পেস্টনজীর খুব লোভ ছিল ওটার উপর। তিনি মোটা টাকা অফার করবেন, আর মিঃ হালদার রিফিউজ করবেন—তাতে পেস্টনজীর মুখের ভাবটা কেমন হবে সেটা দেখেই মিঃ হালদারের আনন্দ। এ ব্যাপারে ওনার একটা জিদও ছিল। এই চিঠিটা কেনার জন্য একবার এক আমেরিকান দাম চড়াতে চড়াতে বিশ হাজার ডলারে উঠেছিল। মিঃ হালদার ক্রমাগত মাথা নেড়ে গেলেন। সাহেবের মুখ লাল, শেষ পর্যন্ত মুখ খারাপ করতে আরম্ভ করল, আর সমস্ত ব্যাপারটা বসে বসে উপভোগ করলেন মিঃ হালদার। আজও পেস্টনজী গলা চড়াতে সুরু করেছিলেন সেটা আমি বাইরে থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম।'

'কিসের মধ্যে থাকত জিনিসটা?'

'একটা অ্যালক্যাথীনের খামে।'

'তাহলে বোধ হয় যায়নি চিঠিটা। কারণ খামটা টেবিলের উপরই রয়েছে। আর তার মধ্যে একটা সাদা ভাঁজ করা কাগজও দেখলাম।'

'না গেলেই ভালো। ও চিঠির মর্ম সকলে বুঝবে না।'

চুরি হয়েছে কিনা সেটা এখন জানা যাবে না, কারণ পুলিস ও ঘরে কাজ করছে; তাছাড়া পুলিশের ডাক্তার এইমাত্র এসেছেন, তিনি লাশ পরীক্ষা করছেন।

হৃষিকেশবাবু বললেন, 'আশ্চর্য। যে সময় সাধনবাবু গেলেন, প্রায় সে সময়ই আমি ফিরেছি। অথচ লোকটার

সঙ্গে দেখা হল না।'

'আপনি বেরিয়েছেন কটায়?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'ঠিক দশটা বাজতে পাঁচ। এখান থেকে পাঁচ মিনিট লাগে পোস্টাপিস যেতে। খোলার সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম-গুলো দিতে চেয়েছিলাম।'

'সে তো পাঁচ মিনিটের কাজ, তাহলে ফিরতে এত দেরি হল কেন?'

হৃষিকেশবাবু মাথা নাড়ালেন। —'আর বলবেন না মশাই। ঘড়ির ব্যাণ্ডের খোঁজ করছিলুম স্টেশনারি দোকানগুলোতে। দেখছেন না ডান হাতে ঘড়ি পরেছি। ব্যাণ্ডটা ঢিলে হয়ে গেছে। বাঁ কব্জি আমার ডান কব্জির চেয়ে প্রায় আধ ইঞ্চি সরু। ব্যাণ্ড ঢলঢল করে। কোনো লাভ হল না। সেই নিউ মার্কেট ছাড়া গতি নেই।'

ভদ্রলোক ডান হাতে ঘড়ি পরেন সেটা আগেই লক্ষ করেছি। সিঁথিও ডান দিকে। শতকরা নব্বই ভাগ পুরুষ মানুষ বাঁয়ে সিঁথি করে; কেন করে তা অবিশ্যি জানি না।

'আপনি এ বাড়িতেই থাকেন?' ফেলুদা জিগ্যেস করল। অমিতাভবাবু ভেতরে সামলাচ্ছেন, তাছাড়া উনি নিজেও বেশ ভেঙে পড়েছেন, তাই ফেলুদা হৃষিকেশবাবুর কাছ থেকে যা তথ্য পাওয়া যায় বার করে নিচ্ছে।

'হ্যাঁ, এ বাড়িতেই,' বললেন হৃষিকেশবাবু, 'একতলায়। ফ্যামিলি-ট্যামিলি নেই, তাই মিঃ হালদার বললেন এখানেই থাকতে; ঘরের ত অভাব নেই। সাধনবাবুও শুনেছি এ বাড়িতেই থাকতেন।'

'এ কাজ ত ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন আপনি। ভালো লাগছিল না বুঝি?'

'প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছিল মশাই। তাছাড়া উন্নতির সুযোগ আজকের দিনে কে ছাড়ে বলুন। মিঃ হালদার অবিশ্যি এমপ্লয়ার হিসেবে ভালোই ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই আমার।'

আরেকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে এর মধ্যে আলাপ হয়েছে, যদিও কথা হয়নি। তিনি হলেন অমিতাভবাবুর ছোট ভাই অচিন্ত্যবাবু। ভদ্রলোক বাড়িতেই ছিলেন, তাই বোধ হয় পুলিশ এখন তাঁকে জেরা করছে। ফেলুদা হৃষিকেশবাবুকেই জিগ্যেস করলেন ছোট ভাইয়ের কথা।

'অচিন্ত্যবাবু কী করেন?

'থিয়েটার।'

'থিয়েটার?'

আমরা তিনজনেই অবাক।

'পেশাদারী থিয়েটার? মানে থিয়েটার করেই ওঁর রোজগার?'

হৃষিকেশবাবুকে উত্তরটা দিতে যেন বেশ একটু ভাবতে হল। বললেন, 'এসব ভেতরের ব্যাপার। আর সত্যি, আমার পক্ষে বলাটা বোধ হয় খুব শোভা পায় না। এ ফ্যামিলিতে থিয়েটার করাটা বেমানান তাতে সন্দেহ নেই, তবে আমার একটা সন্দেহ হয়েছে যে অচিন্ত্যবাবুর মনে একটা বড় রকমের অভিমান ছিল। চার ভাইয়ের মধ্যে উনিই একমাত্র বিলেত যাননি পড়াশুনো করতে। আসলে বড় ফ্যামিলিতে ছোট ভাই অনেক সময় একটু নেগলেকটেড হয়। ওনার ক্ষেত্রে মনে হয় সেটাই হয়েছে। আমার সঙ্গে মাঝে মধ্যে কথাবার্তা থেকেও সেটাই মনে হয়েছে। চাকরি একটা করিয়ে দিয়েছিলেন মিঃ হালদারই, কিন্তু অচিন্ত্যবাবু সেটা ছেড়ে দেন। থিয়েটারের শখটা বোধ হয় এমনিতেই ছিল। বারাসতে একটা ড্রামাটিক ক্লাব নিয়ে খুব মেতে ওঠেন, কিন্তু তাতে মন ভরে না। এখন নবরঙ্গমঞ্চে ঘোরাঘুরি করছেন। দু একটা হিরোর পার্টও নাকি করেছেন। কালও দেখছিলাম পার্ট মুখস্থ করছেন।'

এবারে ইনস্পেক্টর হাজরা এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে। অচিন্ত্যবাবুর জেরা শেষ। তিনি গোমড়া মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। হাজরা বললেন, 'খুনটা হয়েছে দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে। পেস্টনজী ছিলেন সাড়ে ন'টা থেকে দশটার কিছু পর অবধি। সাধন দস্তিদার এসেছেন সোয়া দশটায়, গেছেন সাড়ে দশটায়। ছোট ছেলের ঘর থেকে বাইরের বারান্দা দিয়ে সোজা বাপের ঘরে যাওয়া যায়। বাড়ির ভেতরের লোক

দেখতে পাবে না। দশটা পাঁচ থেকে সোয়া দশটার মধ্যে অচিন্ত্যবাবু বাপের ঘরে এসে থাকতে পারেন। উনি বলছেন সারা সকাল পার্ট মুখস্থ করেছেন, কেবল সাড়ে দশটা নাগাৎ একবার ভাইপো অনিরুদ্ধর ডাক পেয়ে তার কাছে যান তার খেলার মেশিনগানটা দেখতে। তখনও তিনি বাপের মৃত্যু সংবাদ পাননি। যাই হোক্, মোটামুটি তিন জনেরই মোটিভ ছিল। ছেলের সঙ্গে বাপের বনত না, পেন্টনজী ছিলেন মিঃ হালদারের রাইভ্যাল, আর সাধন দস্তিদারের ছিল পুরোন আক্রোশ। এই হল ব্যাপার। এবার আপনি এসে একটু দেখে বলুন ত কিছু চুরি গেছে কিনা।'

শেষ অনুরোধটা করা হল হৃষিকেশবাবুকে। ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন স্টাডির দিকে, আমরা তাঁর পিছনে।

ঘরটায় ঢুকে হৃষিকেশবাবু একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন। মেক্যানিক্যাল জিনিসে পার্বতীবাবুর খুব শখ ছিল, কারণ বৈঠকখানায় দেখেছি একটা প্রথম যুগের সিলিণ্ডার গ্রামোফোন, আর এ ঘরে দেখছি একটা আদ্যিকালের ম্যাজিক ল্যানটার্ন। তাছাড়া ছোট ছোট মূর্তি, পাত্র, দোয়াত, কলম, পিস্তল, পুরোন ছবি, ম্যাপ, বই—এসব ত আছেই। বাইরের জিনিসপত্র দেখে, চাবি দিয়ে আলমারি, বাক্স, দেরাজ ইত্যাদি খুলে দেখে অবশেষে হৃষিকেশবাবু জানালেন যে কোনো জিনিস গেছে বলে ত মনে হচ্ছে না।

ফেলুদা বলল, 'আপনি অ্যালক্যাথীনের খামটা একবার দেখলেন না?'

'ওতে ত চিঠিটা রয়েছে বলেই মনে হচ্ছে।'

'তবু একবার দেখে নেওয়া উচিত।'

হৃষিকেশবাবুকে খামটা খুলে ভেতরের কাগজটা টেনে বার করতে হল। কাগজের রংটা দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল; পুরোন কাগজ কি এত সাদা হয়? ভাঁজ করা কাগজটা খুলে ফেলেই ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন।

'এ কী! এতো প্যাড থেকে ছেঁড়া হালদার মশাইয়ের

নিজের চিঠির কাগজ!'

অর্থাৎ নেপোলিয়নের চিঠি উধাও।

॥ ৩ ॥

আরো আধ ঘণ্টা ছিলাম আমরা হালদারবাড়িতে। সেই সময়টা ফেলুদা বাড়ির কম্পাউণ্ডটা ঘুরে দেখল। বাগানটা দেখা শেষ করে, কম্পাউণ্ড ওয়ালের কোনো অংশ নিচু বা ভাঙা আছে কিনা দেখে আমরা পুকুরের কাছে এলাম। ফেলুদার দৃষ্টি মাটির দিকে, জানি ও পায়ের ছাপ খুঁজছে। শুকনো মাটি, পায়ের ছাপের সম্ভাবনা কম, তবে পুকুরের পূর্ব পাড়ে একটা অংশ ফেলুদার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় সে থেমে গেল।

একটা ছোট্ট বুনো ফুলের গাছ যেন কিসের চাপে পিষে গেছে। আর সেটা হয়েছে কিছুক্ষণ আগেই।

ফেলুদা ফুলের আশপাশটা দেখে পুকুরের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এ পুকুর ব্যবহার হয় না, তাই জলটা পানার আবরণে ঢেকে গেছে। আমরা যেখানটা দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে হাত পাঁচেক দূরে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে পানা সরে গিয়ে জল বেরিয়ে পড়েছে।

কিছু ফেলা হয়েছে কি জলের মধ্যে? তাইত মনে হয়।

কিন্তু ফেলুদা এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করল না। যা দেখবার ও দেখে নিয়েছে।

বাড়ি ফেরার সময় লালমোহনবাবু হঠাৎ বললেন, 'বাগানে একটা চন্দনা দেখলুম বলে মনে হল। একটা পেয়ারা গাছ থেকে উড়ে একটা সজনে গাছে গিয়ে বসল।'

'তা সেটা আমাদের বললেন না কেন?' ধমকের সুরে বলল ফেলুদা।

'কী জানি, যদি বেরিয়ে যায় টিয়া! দুটো পাখি এত কাছাকাছি। তবে এ পাখিটা কথা বলে।'

'আপনি শুনলেন কথা।'

'শুনলুম বৈকি। আপনারা তখন বাগানের উল্টো দিকে। আমি আরেকটু হলেই একটা তেঁতুলে বিছের উপর পা ফেলেছি, এমন সময় শুনলুম "বাবু সাবধান।" আর মুখ তুলে দেখি পাখি।'

'পাখি বলল বাবু সাবধান?'

'তাই ত স্পষ্ট শুনলুম। আপনারা বিশ্বাস করবেন না বলেই বলিনি।'

বিশ্বাস করাটা সত্যিই কঠিন, তাই কথা আর এগোল না।

তবে এটা ঠিক যে এরকম একটা খুন আর এরকম চুরির পরেও ফেলুদার মন থেকে চন্দনার ব্যাপারটা যাচ্ছেনা! খুনের দুদিন পর, সোমবার সকালে চা খাওয়ার পর ফেলুদার কথায় সেটা বুঝতে পারলাম। ও বলল, 'পার্বতীবাবুর খুন আর নেপোলিয়নের চিঠি চুরি—এই দুটো ঘটনাই গতানুগতিক। কিন্তু আমাকে একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়েছে এই পাখি চুরির ব্যাপারটা।'

গতকাল অমিতাভবাবু ফোন করেছিলেন; ফেলুদা জানিয়ে দিয়েছে যে নেহাৎ দরকার না পড়লে এই অবস্থায় ও আর ওঁদের বিরক্ত করবেনা, বিশেষ করে পুলিশ যখন তদন্ত চালাচ্ছেই। লালমোহনবাবু বলছেন সোমবার হলেও আজ একবার আসবেন, কারণ কী ডেভেলাপমেণ্ট হচ্ছে না হচ্ছে সেটা জানার ওঁর বিশেষ আগ্রহ।

আমি বললাম, 'পাখির খাঁচার গায়ে রক্তটা পাখির না মানুষের সেটাত এখনো জানা গেল না।'

'ওটা যে মানুষের সেটা অ্যানালিসিস না করেই বলা যায়,' বলল ফেলুদা। 'কেউ যদি পাখিকে খাঁচা থেকে বার করতে যায় তাহলে সেটা সাবধানেই করবে, কিন্তু পাখি ছটফট করতে পারে, খামচাতে পারে, ঠোক্‌রাতে পারে। অর্থাৎ যে লোকে পাখিটাকে বার করেছে তার হাতে জখমের চিহ্ন থাকা উচিত।'

'সে জিনিস ও বাড়ির কারুর হাতে দেখলে?'

'উঁহু। অথচ সেটার দিকে আমি চোখ রেখেছিলাম। বাবু, চাকর কারুর হাতেই দেখিনি। অথচ টাট্‌কা জখম। অমিতাভবাবু বললেন পার্ক স্ট্রীটে আমাদের সঙ্গে দেখা হবার দুদিন আগে পাখিটা কিনেছিলেন। তার মানে ১৩ই ডিসেম্বর। খুনটা হয় ১৯শে ডিসেম্বর।...এই পাখির জন্য আমি অন্য ব্যাপারগুলোতে পুরোপুরি মনও দিতে

পারছিনা।'

'খুনের সুযোগ কার কার ছিল তার একটা লিস্ট করছিলে না তুমি কাল রাত্তিরে?'

'শুধু সুযোগ নয়, মোটিভও।'

ফেলুদার পাশেই সোফায় পড়েছিল খাতাটা। সে ওটা খুলে বলল, 'সাধন দস্তিদার সম্বন্ধে নতুন কথা বলার বিশেষ কিছু নেই। রহস্যটা হচ্ছে তার অন্তর্ধানে। এটা সম্ভব হয় একমাত্র যদি দারোয়ান মিথ্যে কথা বলে থাকে। সাধন তাকে ভালোরকম ঘুষ দিয়ে থাকলে এটা হতে পারে। সেটা পুলিশে বার করুক। মিথ্যেবাদীকে সত্যি বলানোর রাস্তা তাদের জানা আছে।

'দ্বিতীয় সাসপেক্ট—পেস্টনজী। তবে পেস্টনজীর সত্তর বছর বয়স; বুড়ো মানুষের পক্ষে এ খুন সম্ভব কিনা সেটা ভাবতে হবে। আঘাতটা করা হয়েছিল রীতিমতো জোরে। অবিশ্যি সত্তরেও অনেকের স্বাস্থ্য দিব্যি ভালো থাকে। সেটা ভদ্রলোককে চাক্ষুষ না দেখা পর্যন্ত বোঝা যাবে না।

'তৃতীয়—অচিন্ত্য হালদার। বাপের উপর ছেলের টান না থাকলেও খুন করার মতো আক্রোশ ছিল কিনা সেটা ভাবার কথা। তবে নেপোলিয়নের চিঠি হাতাতে পারলে ওর আর্থিক সমস্যা কিছুটা মিটত ঠিকই। আর কেউ না হোক, পেস্টনজী যে সে চিঠি কিনতে রাজি হতেন সেটা বোধহয় অনুমান করা যায়। চতুর্থ—'

'আবার আরো একজন আছে নাকি?'

'তাকে সাসপেক্ট বলে বলছিনা, কিন্তু অমিতাভবাবু সে সময়টা কী করছিলেন সেটা জানা দরকার বৈ কি। তাঁর জবানীতে তিনি বলেছেন সকালে তিনি বাগানে থাকেন। ওঁর খুব ফুলের শখ।' সেদিন দশটা পর্যন্ত তিনি বাগানে ছিলেন। মাঝে একবার আমাদের ফোন করতে নটার সময় তাঁকে নিচের বৈঠকখানায় আসতে হয়। তারপর আমরা আসার আগে আর দোতলায় যাননি। চাকর তাঁকে চা দিয়ে যায় দশটার সময় এক তলায় বাগানের দিকের খোলা বারান্দায়। আমাদের গাড়ির আওয়াজ পেয়ে তিনি সামনের দিকে চলে আসেন। দোতলায় যান তিনি একেবারে আমাদের নিয়ে তার আগে নয়।

'সব শেষে হলেন হৃষিকেশবাবু। ইনি দশটা বাজতে পাঁচে বেরিয়েছেন সেটা দারোয়ান দেখেছে, কিন্তু ফিরতে দেখেছে কিনা মনে করতে পারছেনা। দারোয়ানের কথাবার্তা খুব রিলায়েব্‌ল বলে মনে হয় না। চল্লিশ বছর চাকরি করছে বটে হালদার বাড়িতে, হয়ত এমনিতে বিশ্বস্ত, কিন্তু বয়স হয়েছে সত্তরের উপর, কাজেই স্মরণশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসা অস্বাভাবিক নয়। হৃষিকেশবাবু স্টেশনারি দোকানে অতটা সময় কাটিয়েছেন কিনা সেটা জানা দরকার। যদি সে ব্যাপারে মিথ্যেও বলে থাকেন, তার খুনের সুযোগ সম্বন্ধে সন্দেহ থেকেই যায়। একমাত্র নেপোলিয়নের চিঠি হাত করা ছাড়া মোটিভও খুঁজে পাওয়া যায় না।'

ফেলুদা খাতাটা বন্ধ করল। আমি বললাম, 'চাকর বাকরদের বোধহয় সব কটাকেই বাদ দেওয়া যায়!'

'শুনলিই ত চাকর সব কটাই পুরোন। তাদের মধ্যে বেয়ারা মুকুন্দ পার্বতীচরণের ঘরে কফি নিয়ে যায় পেস্টনজী ও পার্বতীবাবুর জন্য। পার্বতীচরণ একা থাকলেও রোজ দশটায় কফি খেতেন। এ ছাড়া আর কোনো চাকর ন'টার পর পার্বতীচরণের ঘরে যায়নি। বাড়িতে লোক বলতে আর আছে অমিতাভবাবুর স্ত্রী, অনিরুদ্ধ, পার্বতীবাবুর আশি বছরের বুড়ী মা, মালি, মালির এক ছেলে, ড্রাইভার ও দারোয়ান। অচিন্ত্যবাবু বিয়ে করেননি।'

ফেলুদা একটা চার মিনার ধরাবার সঙ্গে সঙ্গেই ফোন বেজে উঠল। ইনস্পেক্টর হাজরা।

'কী খবর বলুন স্যার,' বলল ফেলুদা।

'সাধন দস্তিদারের ঠিকানা পাওয়া গেছে।'

'ভেরি গুড।'

'ভেরি ব্যাড, কারণ সে ঠিকানায় ওই নামে কেউ থাকে না।'

'বটে?'

'এবং কোনদিন ছিলও না।'

'ত হলে?'

'তাহলে আর কি—যে তিমিরে সেই তিমিরে। মহা

ফিচেল লোক বলে মনে হচ্ছে।'

'আর হৃষিকেশবাবুর অ্যালিবাই ঠিক আছে?'

'উনি পোস্টাপিসে গিয়েছিলেন দশটায় এবং টেলিগ্রাম-গুলো করেছেন এটা ঠিক। তারপর স্টেশনারি দোকানে যাবার কথা যেটা বললেন সেটা ভেরিফাই করা গেল না, কারণ দোকানে কেউ মনে করতে পারল না।'

'আর পেস্টনজী?'

'অসম্ভব তিরিক্ষি মেজাজের লোক। প্রচণ্ড ধনী। দেড়শো বছর কলকাতায় আছে এই পার্সী ফ্যামিলি। এমনিতে বেশ শক্ত সমর্থ লোক, তবে কাবু হয়ে আছেন আরথ্রাইটিসে, ডান হাত কাঁধের উপর ওঠে না। ওনার পক্ষে এই খুন প্রায় ইমপসিব্‌ল। লর্ড সিন্‌হা রোডে গিয়ে রোজ সকালে আটটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত ফিজিও-থেরাপি করান। চেক করে দেখেছি; কথাটা সত্যি।'

'তাহলে ত সাধন দস্তিদারের সন্ধানেই লেগে থাকতে হয়।'

'আমার ধারণা লোকটা বারাসতেই থাকে, কারণ ওর অ্যাপ্লিকেশনের খামে বারাসতের পোস্টমার্ক রয়েছে।'

'সে কি, এত খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার।'

'আমরা খোঁজ করছি। এখানে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে বলে মনে হয় না। ও, ভাল কথা, খোকার ঘরে চোর এসেছিল।'

'আবার?'

'আবার মানে?'

হাজরা পাখির কথাটা জানেন না। ফেলুদা সেটা চেপে গিয়ে বলল, 'না, বলছিলাম—একটা চুরি ত হল বাড়িতে আবার চোর?'

'যাই হোক্, কিছু নেয় নি।'

'খোকা টের পেল কি করে?'

'সে বাবা-মায়ের পাশের ঘরে একা শোয়। বিলিতি কায়দা আর কি! তা কাল মাঝ রাত্তিরে নাকি খুটখাট শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। ছেলের সাহস আছে। 'কে' বলে চেঁচিয়ে ওঠে, আর তাতেই নাকি চোর পালিয়ে যায়। আমি খোকাকে জিজ্ঞেস করলুম—তোমার ভয় করল না? তাতে সে বললে যে বাড়িতে খুন হবার পর থেকে নাকি সে বালিশের তলায় মেশিন গান নিয়ে শোয়, আর সেই কারণেই নাকি তার ভয় নেই।'

দশটার সময় লালমোহনবাবু এসে হাজির। ফেলুদাকে গম্ভীর দেখে ভদ্রলোক ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।—'সে কি মশাই, আপনি এখনো অন্ধকারে নাকি?'

'কী করি বলুন—রোজ যদি একটা করে নতুন রহস্যের উদ্ভব হয় তাহলে ফেলু মিত্তির কী করে?'

'আবার রহস্য?'

'খোকার ঘরে চোর ঢুকেছিল কাল রাত্তিরে।'

'বলেন কি? চোরের কি কোনো বাছবিচার নেই? মুড়ি-মিছরি একদর?'

'এখন আপনার উপর ভরসা।'

'হুঁঃ—চন্দ্রসূর্য অস্ত গেল, জোনাক ধরে বাতি—ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেল, শল্য হল রথী! তবে হ্যাঁ—চন্দনার ব্যাপারটা কিন্তু আমায় হন্ট্ করছে। ওটা নিয়ে একটা আলাদা তদন্ত করা উচিত। আপনার সময় না থাকলে আমি করতে রাজ আছি। তিনকড়িবাবুর দোকানে আমার খুব যাতায়াত ছিল এককালে।'

'সে কি, এটা ত বলেননি আগে।'

'আরে মশাই, এককালে খুব পাখির শখ ছিল আমার। একটা ময়না ছিল, সেটাকে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম লাইন আবৃত্তি করতে শিখিয়েছিলাম।'

'জল পড়ে পাতা নড়ে দিয়ে শুরু করা উচিত ছিল আপনার।'

ভদ্রলোক ফেলুদার খোঁচাটা অগ্রাহ্য করে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'কী হে তপেশবাবু, যাবে নিউ মার্কেট?'

ফেলুদা বলল, 'যেতে হয় ত বেরিয়ে পড়ুন। আমি ঘণ্টা খানেক পরে আপনাদের সঙ্গে মীট করব।

'কোথায়?'

'নিউ মার্কেটের মধ্যিখানে, কামানটার পাশে। বিস্তর ঘোরাঘুরি আছে, বাইরে খাওয়া আছে।'

সপ্তাহে একদিন রেস্টুর্যাণ্টে খাওয়াটা আমাদের রেগুলার ব্যাপার।

লালমোহনবাবুর গাড়িতে করে বেরিয়ে পড়লাম।

নিউ মার্কেটের পাখির বাজারের জবাব নেই। তবে তিনকড়িবাবু যে জটায়ুকে চিনবেন না তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ ভদ্রলোক এ দোকানে শেষ এসেছেন সিকসটি এইটে। লালমোহনবাবু এক গাল হেসে 'চিনতে পারছেন?' জিগ্যেস করাতে তিনকড়িবাবু তাঁর মোটা চশমার উপর দিয়ে লালমোহনবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, 'চেনা মুখ ত ভুলি না চট করে। নাকু বাবু ত? আপনি কারবালা ট্যাঙ্ক রোডে থাকেন না?'

লালমোহনবাবুর চুপসোন ভাব দেখে আমিই কাজের কথাটা পড়লাম।

'আপনার এখান থেকে গত দিন দশেকের মধ্যে কি কেউ একটা চন্দনা কিনে নিয়ে গেছে? বারাসতের এক ভদ্রলোক?'

'বারাসতে কিনা জানি না, তবে দুখানা চন্দনা বিক্রী হয়েছে দিন দশেকের মধ্যে। একটা নিল জয়শক্তি ফিলিম কোম্পানির নেপেন বাবু। বলল চিন্ময়ী মা না মৃন্ময়ী মা কি একটা বইয়ের শুটিং-এ লাগবে। ভাড়ায় চাইছিল—আমি বললুম সেদিন আর নেই। নিলে ক্যাশ দিয়ে নিয়ে যান, কাজ হয়ে গেলে পর আপনাদের হিরোইনকে দিয়ে দেবেন।'

'আর অন্যটা যে বেচলেন, সেটা কোত্থেকে এসেছিল আপনার দোকানে মনে আছে?'

'কেন মশাই, অত ইনফরমেশনে কী দরকার?'

ভদ্রলোক একটু সন্দিগ্ধ বলে মনে হল।

'সেই পাখিটা খাঁচা থেকে চুরি গেছে অত্যন্ত রহস্যজনক ভাবে,' বললেন লালমোহনবাবু, 'সেটা ফিরে পাওয়া দরকার।'

'ফিরে পেতে চান ত কাগজে অ্যাডভারটাইজ দিন।'

'তা না হয় দেব, কিন্তু আপনার দোকানে কোত্থেকে এসেছিল সেটা—'

'অতশত বলতে পারব না। আপনি অ্যাডভারটাইজ দিন।'

'পাখিটা কথা বলত কি?'

মা দুর্গার হাসি

সুভাষপ্রসন্ন ঘোষ

ট্যাং ট্যাং ট্যাং বাজলো কাঁসি
ঢ্যাম কুড়কুড় ঢাক
সব ছাপিয়ে মাইকে তখন
হিন্দী গানের জাঁক।
সে গান শুনে দুর্গা মায়ের
কান যে ঝালা পালা,
লক্ষ্মী সরস্বতী গণেশ
কার্তিকও যে কালা।
হঠাৎ ওকি কাণ্ডটা কি
থামলো ভূতের গান!
মাইক বোবা লোডশেডিং-এ
বাঁচল সবার প্রাণ।
আবার বাজে ঢাকের বাজন
আবার বাজে কাঁসি।
সবাই দেখে দুর্গা মায়ের
ফুটল মুখে হাসি॥

'তা বলবে না কেন? তবে কী বলত জিগ্যেস করবেন না। সতেরোটা টকিং বার্ড আছে আমার দোকানে। কেউ বলে গুড মর্নিং, কেউ বলে ঠাকুর ভাত দাও, কেউ বলে জয় গুরু, কেউ বলে রাধাকেষ্ট—কোন্‌টা কোন্ পাখি বলে সেটা ফস্ করে জিগ্যেস করলে বলতে পারব না।'

আধ ঘটা সময় ছিল হাতে, তার মধ্যে লালমোহনবাবু একটা নখ কাটার ক্লিপ, আধ ডজন দেশবন্ধু মিলসের গেঞ্জি আর একটা সিগন্যাল টুথ পেস্ট কিনলেন। তারপর চীনে জুতোর দোকানে গিয়ে একটা মোকাসিনের দাম করতে করতে আমাদের অ্যাপয়ন্টমেন্টের সময় এসে

গেল। আমরা কামানের কাছে যাবার তিন মিনিটের মধ্যেই ফেলুদা হাজির।

'এবার কোথায় যাওয়া?' মার্কেট থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে জিগ্যেস করলেন লালমোহনবাবু।

'পার্সীরা প্রায় দুশো বছর ধরে কলকাতায় আছে সেটা জানতেন?'

'বলেন কি? সেই সিরাজদ্দৌলার আমল থেকে?'

'সেই রকম একটি প্রাচীন পার্সী বাড়িতে এখন যাব আমরা। ঠিকানা হচ্ছে'—ফেলুদা পকেট থেকে খাতা বার করল—

'একশো তেত্রিশের দুই বৌবাজার স্ট্রিট।'

॥ ৪ ॥

একশো তেত্রিশের দুই বৌবাজার স্ট্রীট দেড়শো বছরের পুরোন বাড়ি কিনা জানি না। তবে এত পুরোন বাড়িতে এর আগে আমি কখনো যাইনি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দুটো দোকানের মাঝখানে একটা খিলেনের মধ্যে দিয়ে প্যাসেজ পেরিয়ে কাঠের সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে তিন তলায় গিয়ে ডান দিকে ঘুরে সামনেই দরজার উপর পিতলের ফলকে লেখা আর ডি পেস্টনজী। কলিং বেল টিপতেই একজন বেয়ারা এসে দরজা খুলল। ফেলুদা তার হাতে তার নিজের নাম আর পেশা লেখা একটা কার্ড দিয়ে দিল।

মিনিট তিনেক পর বেয়ারা এসে বলল 'পাঁচ মিনিটের বেশি সময় দিতে পারবেন না বাবু।'

তাই সই। আমরা তিনজন বেয়ারার সঙ্গে গিয়ে একটা ঘরে ঢুকলাম।

বিশাল অন্ধকার বৈঠকখানা, তারই এক পাশে দেয়ালের সামনে সোফায় বসে আছেন ভদ্রলোক। সামনে টেবিলে রাখা বোতলে পানীয় ও গেলাস। গায়ের রং ফ্যাকাশে। নাকটা টিয়া পাখির মতো বাঁকা, চওড়া কপাল জুড়ে মেচেতা।

সোনার চশমার মধ্যে দিয়ে ঘোলাটে চোখে আমাদের দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'বাট ইউ আর নট ওয়ান ম্যান, ইউ আর এ ক্রাউড!'

ফেলুদা ক্ষমা চেয়ে ইংরাজিতে বুঝিয়ে দিল যে তিন জন হলেও, সে একাই কথা বলবে; বাকি দুজনকে ভদ্রলোক অনায়াসে অগ্রাহ্য করতে পারেন।

'ওয়েল, হোয়াট ডু ইউ ওয়ন্ট?'

'আপনি পার্বতী হালদারকে চিনতেন বোধহয়?'

'মাই গড, এগেন!'

ফেলুদা হাত তুলে ভদ্রলোককে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করে বলল, 'আমি পুলিশের লোক নই সেটা আমার কার্ড দেখেই নিশ্চয় বুঝেছেন। তবে ঘটনাচক্রে আমি এই খুনের তদন্তে জড়িয়ে পড়েছি; আমি শুধু জানতে চাই-ছিলাম—এই যে নেপোলিয়নের চিঠিটা চুরি হয়েছে, সেটা সম্বন্ধে আপনার কী মত।'

পেস্টনজী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'তুমি দেখেছ চিঠিটা?'

ফেলুদা বলল, 'কী করে দেখব, যেদিন ভদ্রলোকের মৃত্যু, সেদিনেই ত আমি প্রথম গেলাম তার বাড়িতে।'

পেস্টনজী বললেন, 'নেপোলিয়নের বিষয় পড়েছ ত তুমি?'

'তা কিছু পড়েছি।'

ফেলুদা গত দুদিনে নেপোলিয়ন, সম্বন্ধে আর পুরোন আর্টিস্টিক জিনিস সম্বন্ধে সিধু জ্যাঠার কাছ থেকে বেশ কিছু বই ধার করে এনে পড়েছে সেটা আমি জানি।

'সেণ্ট হেলেনায় তার শেষ নির্বাসনের কথা জান ত?'

'তা জানি।'

'কোন সালে সেটা হয়েছিল মনে আছে?'

'১৮১৫।'

ভদ্রলোকের ঠোঁটের কোনে হাসি দেখে বুঝলাম তিনি ইম্‌প্রেস্‌ড হয়েছেন। বললেন, 'এই চিঠি লেখা হয়েছিল ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে। সেণ্ট হেলেনায় যে ছ'বছর বেঁচেছিলেন নেপোলিয়ন সেই সময়টা তাঁকে চিঠি লিখতে দেওয়া হয়নি। তার মানে এই চিঠিটা তাঁর শেষ চিঠিগুলির মধ্যে একটা। কাকে লেখা সেটা জানা যায়নি—শুধু 'মঁশেরামী'—অর্থাৎ 'আমার প্রিয় বন্ধু।' চিঠির ভাব ও ভাষা অপূর্ব। সব হারিয়েছেন তিনি, কিন্তু এই অবস্থাতেও তিনি এক বিন্দু আদর্শচ্যুত হন নি। এ চিঠি লাখে এক। জুরিখ শহরে

এক সর্বস্বান্ত মাতালের কাছ থেকে জলের দরে এ চিঠি কিনেছিলেন পার্বতী হালদার। আর সে জিনিস আমার হাতে চলে আসত মাত্র বিশ হাজার টাকায়।'

'কি রকম?'—আমরা সকলেই অবাক—'মাত্র বিশ হাজার টাকায় এ চিঠি আপনাকে বিক্রী করতে রাজি ছিলেন মিঃ হালদার?'

পেস্টনজী মাথা নাড়লেন।—'নো নো। হি ডিডন্ট ওয়ণ্ট টু সেল ইট। হালদারের গোঁ ছিল সাংঘাতিক। ওঁর এদিকটা আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম।'

'তাহলে?'

পেস্টনজী গেলাসটা তুলে মুখে খানিকটা পানীয় ঢেলে বললেন, 'তোমাদের কিছু অফার করতে পারি? চ', বিয়ার—?'

'না না, আমরা এখুনি উঠব।'

'ব্যাপারটা আর কিছুই না' বললেন পেস্টনজী, 'এটা পুলিশকে বলিনি। ওদের জেরার ঠেলায় আমার ব্লাড প্রেসার চড়িয়ে দিয়েছিল সাংঘাতিকভাবে। ইউ লুক লাইক এ জেন্টলম্যান, তাই তোমাকে বলছি। কাল সকালে একটা বেনামী টেলিফোন আসে। লোকটা সরাসরি আমায় জিজ্ঞেস করে আমি বিশ হাজার টাকায় নেপোলিয়নের চিঠিটা কিনতে রাজি আছি কিনা। আমি তাকে গতকাল রাত্রে আসতে বলি। সে বলে সে নিজে আসবে না, লোক পাঠিয়ে দেবে, আমি যেন তার হাতে টাকাটা দিই। সে এও বলে যে আমি যদি পুলিশে খবর দিই তাহলে আমারও দশা হবে পার্বতী হালদারের মতো।'

'এসেছিল সে লোক?'—আমরা তিনজনেই যাকে

বলে উদ্‌গ্রীব, উৎকর্ণ।

পেস্টনজী মাথা নাড়লেন।—'নো। নোবডি কেম।'

আমরা তখনই উঠে পড়তাম, কিন্তু ফেলুদার হঠাৎ পেস্টনজীর পিছনের তাকের উপর রাখা একটা জিনিসের দিকে দৃষ্টি গেছে।

'ওটা মিং যুগের পোর্সিলেন বলে মনে হচ্ছে!'

ভদ্রলোকের দৃষ্টি উদ্ভাসিত।

'বাঃ, তুমি ত এসব জানটান দেখছি। এক্স্‌কুইজিট জিনিস।'

'একবার যদি···'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। হাতে নিয়ে না দেখলে বুঝতে পারবেনা।'

ভদ্রলোক উঠে গিয়ে জিনিসটার দিকে হাত বাড়িয়েই 'আউচ!' বলে যন্ত্রণায় কুঁচকে গেলেন।

'কী হল?' ফেলুদা গভীর উৎকণ্ঠার সুরে বলল।

'আর বোল না! বুড়ো বয়সের যত বিদ্‌ঘুটে ব্যারাম। আরথ্রাইটিস। হাতটা কাঁধের উপর তুলতেই পারি না।'

শেষকালে ফেলুদা নিজেই এগিয়ে গিয়ে তাক থেকে চীনে মাটির পাত্রটা নামিয়ে নিয়ে হাতে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে বার দু এক 'সুপার্ব' বলে আবার যথাস্থানে রেখে দিল।

'ভদ্রলোকের সত্যিই হাত ওঠে কিনা সেটা যাচাই করা দরকার ছিল' রাস্তায় এসে বলল ফেলুদা।

'ধন্যি মশাই আপনার মস্তিষ্ক! বলুন, এবার কোনদিকে?'

'বলতে সংকোচ হচ্ছে। এবার একেবারে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট।'

'কেন, সংকোচের কী আছে?'

'যা দাম হয়েছে আজকাল পেট্রোলের।'

'আরে মশাই, দাম ত সব কিছুরই বেশি। আমার যে বই ছিল পাঁচ টাকা সেটা এখন এইট রুপীজ। অথচ সেল একেবারে স্টেডি। আপনি ওসব সংকোচ-টংকোচের কথা বলবেন না।'

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের নতুন থিয়েটার নবরঙ্গমঞ্চে গিয়ে হাজির হলাম। প্রোপ্রাইটারের নাম অভিলাষ পোদ্দার। ফেলুদা কার্ড পাঠাতেই তৎক্ষণাৎ আমাদের ডাক পড়ল। দোতলার আপিস ঘরে ঢুকলাম গিয়ে।

'আসুন আসুন, কী সৌভাগ্য আমার, স্বনামধন্য লোকের পায়ের ধুলো পড়ল এই গরীবের ঘরে!'

নাদুস নুদুস বার্নিশ করা চেহারাটার সঙ্গে এই বাড়িয়ে কথা বলাটা বেশ মানানসই। হাতে সোনার ঘড়ি, ঠোঁট দুটো টুকটুকে লাল—এই সবে একখিলি পান পুরেছেন মুখে, গা থেকে ভুরভুরে আতরের গন্ধ।

ফেলুদা লালমোহনবাবুকে আলাপ করিয়ে দিল 'গ্রেট থ্রিলার রাইটার' বলে।

'বটে? বললেন পোদ্দার মশাই।

'একটা হিন্দি ফিল্ম হয়ে গেছে আমার গল্প থেকে,' বললেন জটায়ু 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে। নাটকও হয়েছে একটা গল্প থেকে। গড়পারের রিক্রিয়েশন ক্লাব করেছিল সেভেনটি এইটে।'

ফেলুদা বলল, 'আপনার জায়ান্ট অমনিবাস একটা পাঠিয়ে দেবেন না মিস্টার পোদ্দারকে।'

'সার্টেনলি, সার্টেনলি,' বললেন মিঃ পোদ্দার 'আমি নিজে অবিশ্যি বই-টই পড়িনা, তবে আমার মাইনে করা লোক আছে। তারা পড়ে ওপিনিয়ন দেয় আমাকে। তা বলুন মিঃ মিত্তির, আপনার কী কাজে লাগতে পারি।'

'আপনাদের একটি হিরো সম্বন্ধে একটু ইনফরমেশন চাই।'

'হিরো? মানস ব্যানার্জি?'

'অচিন্ত্য হালদার।'

'অচিন্ত্য হালদার? কই সেরকম নামে ত—ও হো, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই নামে একটি ছেলে ঘোরাঘুরি করছে বটে। একটা বইয়ে একটা পার্টও করেছিল। চেহারা মোটামুটি ভালো, তবে ভয়েসে গণ্ডগোল। বরং সিনেমা লাইনে কিছু হতে পারে। আমি সেই কথাই বলেছি তাকে। ইন ফ্যাক্ট, ছেলেটি আমাকে টাকা অফার করেছে।'

'মানে? হিরোর পার্ট পাবার জন্য?'

'আপনি আকাশ থেকে পড়লেন যে। এরকম হয় মিঃ মিত্তির।'

'আপনি আমল দেন নি?

'নো মিঃ মিত্তির। আমাদের নতুন কোম্পানি, এসব

ব্যাপার খুব রিস্কি। এ প্রস্তাবে রাজি হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ইয়ে—চা, কফি···?'

'নো, থ্যাঙ্কস।'

আমরা উঠে পড়লাম। দেড়টা বাজে, পেটে বেশ চন্‌চনে খিদে।

রয়েল হোটেলে খাবারের অর্ডার দিয়ে ফেলুদা চন্দনা চুরির ব্যাপারে একটা বিজ্ঞাপনের খসড়া করে ফেলল। ওর চেনা আছে খবরের কাগজের আপিসে. সম্ভব হলে কালকে না হয় লেটেস্ট পরশু কাগজে বেরিয়ে যাবে। গত দশ দিনের মধ্যে নিউ মার্কেটে তিনকড়িবাবুর দোকানে কেউ যদি একটা চন্দনা বিক্রী করে থাকেন. তাহলে তিনি যেন নিম্নলিখিত ঠিকানায়, ইত্যাদি।

বিরিয়ানি খেতে খেতে একটা নলী হাড় কামড় দিয়ে ভেঙে ম্যারোটা মুখে পুরে ফেলুদা বলল, 'রহস্য যেরকম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় বলা মুশকিল।'

'দাঁড়ান দাঁড়ান, দেখি গেস্ করতে পারি কিনা,' বললেন লালমোহনবাবু, 'এই নতুন রহস্য হচ্ছে—সেই লোক চিঠি নিয়ে আসবে বলে এলনা কেন, এই ত?'

'ঠিক ধরেছেন। আমার মতে এর মানে একটাই। সে লোক চিঠিটা পাবে বলে আশা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পায়নি।'

আমি বললাম, 'তার মানে যে চুরি করেছে সে নয়, অন্য লোক।'

'তাইত মনে হচ্ছে।'

'ওরে ব্বাস,' বললেন লালমোহনবাবু, 'তার মানে ত একজন ক্রিমিন্যাল বাড়ল।'

'আচ্ছা ফেলুদা'—এ প্রশ্নটা কদিন থেকেই আমার মাথায় ঘুরছে—'পেপারওয়েট দিয়ে মাথায় মারলে লোক মরবেই এমন কোনো গ্যারান্টি আছে কি?'

'গুড কোয়েশ্চন,' বলল ফেলুদা। 'উত্তর হচ্ছে, না নেই। তবে এক্ষেত্রে যে মেরেছে তার হয়ত ধারণা ছিল মরবেই।'

'কিম্বা অজ্ঞান করে জিনিসটা নিতে চেয়েছিল; মরে যাবে ভাবেনি।'

'রয়েলের খাওয়া যে ব্রেন টনিকের কাজ করে সেটাত জানতাম না। তুই ঠিক বলেছিস তোপ্‌সে। সেটাও একটা পসিব্‌ল ব্যাপার। কিন্তু সেগুলো জানলেও যে এ ব্যাপারে খুব হেল্‌প হচ্ছে তা ত নয়। যে লোকটাকে দরকার সে এমন আশ্চর্য ভাবে গা ঢাকা দিয়েছে যে ঘটনাটা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে।'

অবিশ্যি ভ্যানিশ যে করেনি সে লোক সেটা সন্ধেবেলা জানতে পারলাম, আর সেটা ঘটল বেশ নাটকীয় ভাবে।

সেটা বলার আগে জানানো দরকার যে সাড়ে চারটের সময় হাজরা ফোন করে জানালেন বারাসতে সাধন দস্তিদারের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি।

লালমোহনবাবু হোটেল থেকে আর বাড়ি ফেরেন নি। আমাদের পৌঁছে দিয়ে আমাদের এখানেই রয়ে গিয়েছিলেন। সাড়ে সাতটার সময় শ্রীনাথ আমাদের কফি এনে দিয়েছে, এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল। শীতকালের সন্ধে, পাড়াটা এর মধ্যেই নিঝুম তাই বেলের শব্দে বেশ চমকে উঠেছিলাম।

দরজা খুলে আরো এক চমক।

এসেছেন হৃষিকেশবাবু।

'কিছু মনে করবেন না—অসময়ে খবর না দিয়ে এসে পড়লাম—আমাদের টেলিফোনটা ফাঁকা পাওয়া যাচ্ছেনা মিঃ হালদারের মৃত্যুর পর থেকেই···'

শ্রীনাথকে বলতে হয় না, সে নতুন লোকের গলা পেয়েই আরেক কাপ কফি দিয়ে গেল।

ফেলুদা বলল, 'আপনাকে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে। বসে ঠাণ্ডা হয়ে কী ঘটনা বলুন।'

হৃষিকেশবাবু কফিতে একটা চুমুক দিয়ে দম নিয়ে বললেন, 'আপনি আমার এক তলার ঘরটা দেখেন নি, তবে আমি বলতে পারে ও ঘরটায় থাকতে বেশ সাহসের দরকার হয়। অতবড় বাড়ির এক তলায় আমি এক মাত্র বাসিন্দা। চাকরদের আলাদা কোয়ার্টারস আছে। এ ক'বছরে অভ্যেস খানিকটা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু পুরোপুরি হয়না। সন্ধে থেকে গাটা কেমন ছম ছম করে। যাই

হোক্, কাল রাত্তিরে, তখন সাড়ে দশটা হবে, আমি খাওয়া সেরে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে মশারিটা ফেলেছি সবে, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। সত্যি বলতে কি, নক্ করার লোক ও বাড়িতে কেউ নেই। যারা আমাকে চায় তারা বাইরে থেকে হাঁক দেয়—এমন কি চাকর বাকরও। কাজেই বুঝতেই পারছেন, আমার মনে বেশ একটু খট্‌কা লাগল। খোলার আগে জিজ্ঞেস করলুম, কে? উত্তরের বদলে আবার টোকা পড়ল। একবার ভাবলুম খুলব না। কিন্তু সারা রাত যদি ওই ভাবে খট্‌খট্ চলে তাহলে ত আরো গণ্ডগোল। তাই কোনোরকমে সাহস সঞ্চয় করে যা থাকে কপালে ক র দরজাটা খুললুম; খোলামাত্র একটি লোক ঢুকে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তখনও মুখ দেখিনি; তারপর আমার দিকে ফিরতে চাপ দাড়ি দেখে আন্দাজ করলুম কে। ভদ্রলোক আমাকে কোন কথা বলতে না দিয়ে সোজা গড়গড় করে তাঁর কথা বলে গেলেন এবং যতক্ষণ বললেন ততক্ষণ তাঁর ডান হাতে একটি ছোরা সোজা আমার দিকে পয়েণ্ট করা।'

বর্ণনা শুনে আমারই ভয় করছিল। লালমোহনবাবুর দেখলাম মুখ হাঁ হয়ে গেছে।

'কী বললেন সাধন দস্তিদার?' প্রশ্ন করল ফেলুদা।

'সাংঘাতিক কথা,' বললেন হৃষিকেশবাবু। 'মিঃ হালদারের কালেকশনে কী জিনিস আছে তা যেমন মোটা-মুটি আমি জানি, তেমনি ইনিও জানেন। বললেন বাহাদুর শা-র যে পান্না বসানো সোনার জর্দার কৌটাটা মিঃ হালদারের সংগ্রহে রয়েছে, সেটার একজন ভালো খদ্দের পাওয়া গেছে, সেটা তার চাই। আমি যেন আজ রাত্তিরে এগারোটার সময় মধুমুরলীর দিঘির ধারে ভাঙা নীলকুঠির পাশে শ্যাওড়া গাছটার নিচে ওয়েট করি—ও এসে নিয়ে যাবে।'

'এই যে কাজটা করতে বলেছে তার জন্য আপনার পারিশ্রমিক কী?'

'কচু পোড়া। এতো হুমকির ব্যাপার। বললে যদি পুলিশে খবর দিই তাহলে নির্ঘাৎ মৃত্যু।'

'রাত্তিরে দারোয়ান গেটে থাকে না?'

'থাকে বৈ কি, কিন্তু আমার ধারণা হয়েছে লোকটা পাঁচিল টপকে আসে।'

'আপনার ঘর চিনল কি করে?'

'সাধু দস্তিদারও ত ওই ঘরেই থাকত—চিনবে না কেন?'

'ভদ্রলোকের ডাক নাম সাধু ছিল বুঝি?'

'মিঃ হালদারকে ত সেই নামই বলতে শুনেছি!'

'আপনি তাকে কী বললেন?' জিজ্ঞেস করল ফেলুদা।

'আমি বললুম, এখন মিঃ হালদারের জিনিসপত্রে কড়া পাহারা, সে কৌটো আমি নেব কি করে? সে বললে চেষ্টা করলেই পারবে। তুমি মিঃ হালদারের সেক্রেটারি ছিলে; জরুরী কাগজপত্র দেখার জন্য তোমার সে ঘরে ঢোকার সম্পূর্ণ অধিকার আছে; ব্যস্—এই বলেই সে চলে গেল। আমি জানি আপনি ছি ছি করবেন, বলবেন পুলিশে খবর দেওয়া উচিত ছিল, অন্তত বাড়ির লোককে জানানো উচিত ছিল। কিন্তু প্রাণের ভয়ের মতো ভয় আর কী আছে বলুন। আপনার কথাটাই মনে হল। আপনিও যে তদন্ত করছেন সেটা আমার মনে হয় সাধু জানে না।'

'আপনি তাহলে কৌটো বার করেন নি।'

'পাগল!'

'আপনি কি প্রস্তাব করছেন যে আমরা সেখানে যাই?'

'আপনারা যদি একটু আগে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকেন—আমি গেলাম এগারোটায়—তারপর সে এলে যা করার দরকার সেত আপনিই ভালো বুঝবেন। এইভাবে হাতে নাতে লোকটাকে ধরার সুযোগ ত আর পাবেন না।'

'পুলিশকে খবর দেবনা বলছেন?'

'অমন সর্বনাশের কথা উচ্চারণ করবেন না, দোহাই। আপনি আসুন, সঙ্গে এনাদেরও নিতে পারেন। তবে সশস্ত্র অবস্থায় যাবেন, কারণ লোকটা ডেঞ্জারাস।'

'লেগে পড়ুন,' বিনা দ্বিধায় বললেন লালমোহনবাবু। 'রাজস্থানের ডাকাত যখন আমাদের পেছু হটাতে পারেনি, তখন এর কাছে কী ভয়? এতো নস্যি মশাই।'

'আমি অবিশ্যি জায়গাটা দেখিয়ে দেব,' বললেন হৃষিকেশ

বাবু; 'মেন রোড ছেড়ে খানিকটা ভেতর দিকে যেতে হয়। স্টেশন থেকে মাইল চারেক।'

ফেলুদা রাজি হয়ে গেল। হৃষিকেশবাবু কফি শেষ করে উঠে পড়ে বললেন, 'দশটা নাগাৎ তাহলে আপন রা মীট করছেন আমাকে।'

'কোথায়?'

'আমাদের বাড়ি ছাড়িয়ে দু ফার্লং গেলেই একটা তেমাথায় মোড় পাবেন। সেখানে দেখবেন একটা মিষ্টির দোকান। সেই দোকানের সামনে থাকব আমি।'

॥ ৫ ॥

রাত্রে বিশেষ ট্র্যাফিক নেই, তাও একঘণ্টা হাতে নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। খাওয়াটা বাড়িতেই সেরে নিলাম। এত তাড়াতাড়ি খাওয়া অভ্যেস নেই আমাদের; লালমোহনবাবু বললেন, 'খিদে পেলে ওই মিষ্টির দোকানে ঢুকে পড়া যাবে। কচুরি আর আলুর তরকারি নির্ঘাৎ পাওয়া যাবে।'

একটা সুবিধে এই যে লালমোহনবাবুর ড্রাইভার হরিপদ বাবু ফেলুদার ভীষণ ভক্ত। তার উপর বোম্বাই মার্কা ফাইটিং-এর ছবি দেখার সুযোগ ছাড়েন না কখনো। এরকম না হলে রাতবিরেতে বারাসতে ঠ্যাঙাতে অনেক ড্রাইভারই গজগজ করত; ইনি যেন নতুন লাইফ পেলেন।

ভি আই পি রোডে পড়ে লালমোহনবাবু গান ধরেছিলেন—'জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে,' কিন্তু ফেলুদা তাঁর দিক চাইতে অমাবস্যায় গানটা বেমানান হচ্ছে বুঝতে পেরে থেমে গেলেন।

আকাশে এক টুকরো মেঘ নেই। তারার আলো বলে একটা জিনিস আছে, সেটা হয়ত আমাদের কিছুটা হেল্প করতে পারে। ফেলুদার ফরমাশ অনুযায়ী গাঢ় রঙের জামা পরেছি। লালমোহনবাবুর পুলোভারটা ছিল হলদে, তাই তার উপর ফেলুদার স্নেনকোটটা চাপিয়ে নিয়েছেন। ভদ্রলোক এখন গাড়িতে বসা; যখন হাঁটবেন তখন একটা পকেট ভীষণ ঝুলে থাকবে, কারণ তাতে ভরা আছে একটা হামানদিস্তার লোহার ডাণ্ডা। ওয়েপন হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ভদ্রলোক ওটা চেয়ে নিয়েছেন শ্রীনাথের কাছে। ফেলুদার পকেটে অবশ্য রয়েছে তার কোল্ট রিভলভার।

গ্রহবৈগুণ্যে

শিবাশিস মুখোপাধ্যায়

শনিবার বারবেলা গ্রহবৈগুণ্যে
ঘটনাটা ঘটে গেল ঠিক মহাশূন্যে।
সূর্যকে ঘুরে যেত গ্রহদের দঙ্গল,
কিন্তু সবার আগে পৌঁছত মঙ্গল।
এই রাগে বুধগ্রহ কাছা-কোঁচা বাগিয়ে,
মঙ্গলে পিছে ফেলে যেতে গেল আগিয়ে।
বহুদিন ঘুরে ঘুরে দু'জনেই ক্লান্ত,
বেমক্কা ধাক্কায় দু'-টিরই প্রাণান্ত।
ক্ষতি নেই ছায়াপথে আরো ধুলো জমলে,
মজা হবে সপ্তাহে দু'-টো দিন কমলে।

আমাদের আন্দাজ ভুল হয়নি; দশটার কিছু আগে আমরা তেমাথায় পৌঁছে গেলাম। মিষ্টির দোকানের পাশেই একটা পানের দোকান—তার সামনে থেকে হৃষিকেশবাবু এগিয়ে এসে আমাদের গাড়িতে উঠে হরিপদবাবুকে বললেন, 'ডাইনের রাস্তাটা নিন।'

খানিক দূর যেতেই বাড়ি কমে এল। আলোও বেশি নেই; রাস্তায় যা আলো ছিল তাও ফুরিয়ে গেল বাঁয়ে মোড় নিতে। বুঝলাম এটা প্রায় পল্লীগ্রাম অঞ্চল। 'বারাসতেই ছিল প্রথম নীলকুঠি।' বললেন হৃষিকেশবাবু। 'এদিকটাতে এককালে অনেক সাহেব থাকত; দিনের আলোয় তাদের সব ভাঙা বাগানবাড়ি দেখতে পেতেন।'

মিনিট কুড়ি চলার পর একটা জায়গায় এসে গাড়ি দাঁড় করাতে বললেন হৃষিকেশবাবু।

'আসুন।'

গাড়ি থেকে নামলাম চার জনে। 'গাড়িটা এখানেই ওয়েট করুক,' বললেন হৃষিকেশবাবু, 'আমি আপনাদের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে আসি, তারপরে এই গাড়িই আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে আসবে। আমি সাইকেল রিকশা করে ঠিক এগারোটার সময় চলে আসব।'

লালমোহনবাবু হরিপদবাবুকে টাকা দিয়ে বললেন, 'তুমি এঁকে পৌঁছে দিয়ে ফেরার সময় কোনো দোকান-টোকান থেকে খাওয়াটা সেরে নিও। ফিরতে রাত হবে আমাদের।'

ঘাসের উপর দিয়ে মিনিট পাঁচেক হাঁটতে একটা জংলা জায়গা এসে পড়ল।

'এখানেই ছিল মধুমুরলীর দিঘি,' বললেন হৃষিকেশবাবু। 'আমাদের যেতে হবে ওইখানটায়।'

খুবই কম আলো, কিন্তু তাও বুঝতে পারছি যে গাছপালা ছাড়াও ওদিকে একটা দালানের ভগ্নস্তূপ রয়েছে। শীতকাল বলে রক্ষে, না হলে এ জায়গাটা হত সাপ ব্যাঙের ডিপো!

'এখন টর্চের আলোটা বোধহয় তেমন বিপদজ্জনক কিছু নয়,' বলল ফেলুদা।

'মনে ত হয় না,' বললেন হৃষিকেশবাবু।

ছোট্ট পকেট টর্চের আলোতে ঝোপঝাড় খানাখন্দ বাঁচিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম নীলকুঠির ভগ্নস্তূপের পাশে।

'ওই যে দেখুন শ্যাওড়া গাছ,' বললেন হৃষিকেশবাবু! ফেলুদা সেদিকে একবার টর্চ ফেলে সেটা নিবিয়ে পকেটে পুরল।

'আমি তাহলে আসি।'

'আসুন;'

'তিন কোয়ার্টার আপনাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে।'

আমরা যেদিক দিয়ে এসেছিলাম সেদিক দিয়েই চলে গেলেন হৃষিকেশবাবু। এক মিনিটের মধ্যেই তাঁর পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে গেল।

'ওডোমসটা লাগিয়ে নিন।'

ফেলুদা পকেট থেকে টিউব বার করে লালমোহনবাবুর দিকে এগিয়ে দিল।

'যা বলেছেন মশাই। ট্রপিক্যাল ডিজীজ শুনছি আবার খুব বেড়েছে।'

আমরা তিন জনেই ওডোমস লাগিয়ে নিয়ে একটা বড় রকম দম নিয়ে অপেক্ষার জন্য তৈরি হলাম। আমাদের কাউকেই দাঁড়াতে হবে না, কারণ ভগ্নস্তূপে নানান হাইটের ইটের পাঁজা রয়েছে, তাতে চেয়ার চৌকি মোড়া সব কিছুরই কাজ হয়। কথা বলতে হলে ফিস্ ফিস্ ছাড়া গতি নেই, তাও প্রথম দিকটায়। পরের দিকে কমপ্লীট মৌনী। অন্ধকারে চোখ সয়ে গেছে, এখন চারিদিকে চাইলে বট, অশ্বত্থ, আমগাছ, বাঁশঝাড়—এসব বেশ তফাৎ করা যায়। ঝিঁঝির শব্দ ছাড়াও যে অন্য শব্দ আছে সেটা বেশ বুঝতে পারছি। ট্রেনের আওয়াজ, সাইকেল রিকশার চড়া হর্ন, রাস্তার কুকুরের ঘেউ ঘেউ, এমনকি দূরের কোনো বাড়ি থেকে ট্যানজিস্টারের গান পর্যন্ত। ফেলুদার ঘড়িতে রেডিয়াম ডায়াল, তাই অন্ধকারেও টাইম দেখতে পারে।

শীত যেন মিনিটে মিনিটে বাড়ছে। শহরের চেয়ে নির্ঘাৎ পাঁচ সাত ডিগ্রী কম। লালমোহনবাবু তাঁর টুপি আনেননি, রুমাল সাদা, তাই সেটা বাঁধলেও চলেনা; নিরুপায় হয়ে দুহাতের তেলো দিয়ে টাক ঢেকেছেন। একবার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ করাতে ফেলুদা বলল, 'কিছু বললেন?' তাতে ভদ্রলোক ফিস্‌ফিস্ করে জবাব দিলেন, 'শ্যাওড়া গাছেই বোধহয় পেত্নী না শাঁকচুন্নি কী যেন থাকে।'

'শ্যাওড়া গাছের নামই শুনেছি,' ফিস্‌ফিসিয়ে বলল ফেলুদা, 'চোখে এই প্রথম দেখলাম।'

আকাশে তারাগুলো সরছে। একটু আগে একটা তারাকে দেখেছিলাম নায়কোল গাছের মাথার উপরে, এখন দেখছি গাছটায় ঢাকা পড়ে গেছে। কোনো চেনা কনস্টেলেশন আছে কিনা দেখার জন্য মাথাটা উপর দিকে তুলেছি, এমন সময় একটা শব্দ কানে এল। পায়ের শব্দ।

এগারোটা বাজেনি এখনো। ফেলুদা দুমিনিট আগে ঘড়ি দেখে ফিস্‌ফিস্ করে বলেছে, 'পৌনে'।

আমরা পাথরের মতো স্থির।

যেদিক দিয়ে এসেছি, সেদিক দিয়েই আসছে শব্দটা। ঘাসের উপর মাঝে মাঝে ইট পাটকেল রয়েছে, তার জন্যই শব্দ। তাও কান না পাতলে, আর অন্য শব্দ না কমলে শোনা যায় না। এখন ঝিঁঝির ডাক ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

এবার লোকটাকে দেখা গেল। সে এগিয়ে এসেছে শ্যাওড়া গাছটাকে লক্ষ করে।

এবারে তার হাঁটার গতি কমাল। আমরা মাটিতে ঘাপটি মেরে বসা, সামনে একটা ভাঙা পাঁচিল আমাদের শরীরের নীচের অংশটা ঢেকে রেখেছে। আমরা তার উপর দিয়ে দেখছি।

'হৃষিকেশবাবু—'

লোকটা চাপা গলায় ডাক দিয়েছে। হাঁটা থামিয়ে। তার দৃষ্টি যে শ্যাওড়া গাছটার দিকে সেটা মাথাটা দেখে আন্দাজ করতে পারছি, যদিও মানুষ চেনার কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

'হৃষিকেশবাবু—'

ফেলুদা ওঠার জন্য তৈরি। তার শরীর টান সেটা বেশ বুঝতে পারছি।

লোকটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে শুরু করল।

লালমোহনবাবুর ডান কনুইটা উঁচিয়ে উঠেছে। উনি পকেট হাতড়াচ্ছেন হামানদিস্তাটার জন্য।

লোকটা এখন দশ হাতের মধ্যে।

'হৃষিকেশ—'

ফেলুদা বাঘের মতো লাফিয়ে উঠতেই একটা রক্ত জল করা ব্যাপার ঘটে গেল।

আমাদের পিছন থেকে দুটো লোক এসে তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

ফেলুদার সঙ্গে থেকেই বোধহয় আমার নার্ভও শক্ত হয়ে গেছে। চট করে বিপদে মাথা গুলোয় না। আমি তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়লাম সামনের দিকে। ফেলুদার ঘুঁষি খেয়ে একটা লোক আমারই দিকে ছিটকে এসেছিল। আমি তাকে লক্ষ করে আরেকটা ঘুঁষি চালাতে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ঘাসের উপর।

কিন্তু এ কি, আরো লোক এসে পড়েছে পিছন থেকে! তার মধ্যে একটা আমায় জাপটে ধরেছে, আরো দুটো গিয়ে আক্রমণ করেছে ফেলুদাকে। ধস্তাধস্তির শব্দ পাচ্ছি। কিন্তু আমি নিজে বন্দী, যদিও তারই মধ্যে জুতো পরা ডানপাটা দিয়ে ক্রমাগত পিছন দিকে লাথি চালাচ্ছি।

লালমোহনবাবু কী করছেন এই চিন্তাটা মাথায় আসতেই থুৎনিতে একটা বিরাশি শিক্কা ঘা খেলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের অন্ধকার যেন আরো দশগুণ গাঢ় হয়ে গেল।

তারপর আর কিছু জানি না।

* * *

'কিরে, ঠিক হ্যায়?'

ফেলুদার চেহারাটাই প্রথম দেখতে পেলাম জ্ঞান হয়ে।

'ঘাবড়াসনি, আমিও নক-আউট হয়ে গেসলাম দশ মিনিটের জন্য।'

এবারে দেখলাম ঘরের অন্য লোকেদের। অমিতাভ বাবু তাঁর পাশে একজন মহিলা—নিশ্চয়ই তাঁর স্ত্রী—লাল মোহনবাবু, হৃষিকেশবাবু, আর দরজার মুখে দাঁড়িয়ে অচিন্ত্যবাবু। এ ঘরটা আগে দেখিনি; বাড়ির বত্রিশটা ঘরের কোনো একটা হবে।

আমি বিছানায় উঠে বসলাম। একটা কন্‌কনে ব্যথা থুৎনির কাছটায়। তাছাড়া আর কোনো কষ্ট নেই। ফেলুদা ঘুঁষিটা খেয়েছিল ডান চোখের নীচে সেটা কালসিটে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ব্ল্যাক-আই ব্যাপারটা অনেক বিদেশী ছবিতে দেখেছি; স্বচক্ষে এই প্রথম দেখলাম।

'একমাত্র জটায়ুই অক্ষত', বলল ফেলুদা।

সেকি। আশ্চর্য ব্যাপার ত!—'কী করে হল?'

'মোক্ষম ওয়েপন ওই হামানদিস্তা', বললেন লালমোহন বাবু, 'হাতে নিয়ে মাথার উপর তুলে হেলিকপটারের মত বাঁই বাঁই করে ঘুরিয়ে গেলাম। আমার ধারে কাছেও এগোয়নি একটি গুণ্ডাও।'

'ওরা গুণ্ডা ছিল বুঝি?'

'হায়ারড গুণ্ডাজ,' বললেন লালমোহনবাবু।

'বললাম লোকটা ডেঞ্জারাস,' বললেন হৃষিকেশবাবু। 'তবে ও যে এতটা করবে তা ভাবিনি। আমি ত গিয়ে অবাক। একজন শোয়া একজন বসা একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে মাটিতে। আর আসল যে লোক সে হাওয়া।'

ফেলুদা আর লালমোহনবাবু নাকি আমাকে ধরাধরি করে গাড়িতে এনে তোলেন। অমিতাভবাবু নিজে বেশ রাত অবধি পড়েন, তাই উনি জেগে ছিলেন। যে ঘরটায় আমরা রয়েছি সেটা একতলার একটা গেস্টরুম। বেশ বড় ঘর পাশেই বাথরুম। পুবে জানালা দিয়ে নাকি বাগান দেখা যায়। অমিতাভবাবুই জোর করলেন আজ রাতটা এখানে থাকার জন্য। অসুবিধা এইযে বাড়তি কাপড় নেই, যা পরে আছি সেই পরেই শুতে হবে। হৃষিকেশবাবুর

ভয়ের জন্যই এই গোলমালটা হল.' বললেন অমিতাভবাবু. পুলিশকে বলা থাকলে সাধু সমেত গুণ্ডারা এতক্ষণে হাজতে।

হৃষিকেশবাবুও অবিশ্যি অ্যাপলজাইজ করলেন। কিন্তু ভদ্রলোককেই বা দোষ দেওয়া যায় কি করে? ওরকম শাসানির পর যে কোনো মানুষেরই ভয় হতে পারে।

অমিতাভবাবুর স্ত্রীই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বললেন 'বাড়িতে এই দুর্যোগ, আপনাদের সঙ্গে বসে দুদণ্ড কথা বলারও সুযোগ হল না। এনার এত বই আমি পড়েছি—কী যে আনন্দ পাই তা বলতে পারি না।'

শেষের কথাটা অবিশ্যি লালমোহনবাবুকে উদ্দেশ্য করে বলা।

ফেলুদা বলল, 'কাল সকালে যাবার আগে আপনার ছেলের সঙ্গে একবার কথা বলে নেব। ঘরে চোর ঢোকার পরেও ও যা সাহস দেখিয়েছে তেমন সচরাচর দেখা যায়না।'

সাড়ে বারোটা নাগাৎ যখন আমরা শোবার আয়োজন করছি তখন ফেলুদা একটা কথা বলল।

'ঘুঁষিটাও যে ব্রেন টনিকের কাজ করে সেটা আজ প্রথম জানলাম।'

'কিরকম?' বললেন লালমোহনবাবু।

'সাধুবাবু ভ্যানিশ করার ব্যাপারটা বুঝতে পারছি এতদিনে।'

'বলেন কি!'

'তুখোড় লোক। তবে যার সঙ্গে মোকাবিলা করছে সেও ত কম তুখোড় নয়!'

এর বেশী আর ফেলুদা কিছু বললনা।

॥ ৬ ॥

অনিরুদ্ধ সকালে স্কুলে যায়, তাই চা খাবার আগেই ফেলুদা ওর সঙ্গে দেখা করে নিল।

চোর ঢোকার কথাটা আজ শুনে মনে হল ছেলেটি বেশী রকম কল্পনাপ্রবণ। পর পর দুবার! একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হল। ফেলুদা বলল, 'তুমি যে বন্দুকটা দিয়ে চোরকে মারবে ঠিক করেছিলে সেটাত আমাকে দেখালে না। শুনলাম তোমার ছোটকাকাকে দেখিয়েছ।'

অনিরুদ্ধ বন্দুকটা বার করে ফেলুদার হাতে দিয়ে বলল, 'এটা থেকে আগুনের ফুলকি বেরোয়।'

লাল প্লাস্টিকের তৈরি মেশিনগান, ট্রিগার টিপলে মেশিনগানের মতো শব্দের সঙ্গে নলের মুখ দিয়ে সত্যিই স্পার্ক বেরোয়।

ফেলুদা বন্দুকটা নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখে সেটার খুব তারিফ করে ফেরত দিয়ে বলল, 'তোমার যে ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে, দেখা যাক সেটা বন্ধ করা যায় কিনা।'

'তুমি চোর ধরে দেবে?'

'গোয়েন্দার ত ওই কাজ।'

'আর আমার চন্দনা যে চুরি করেছে সেই চোর?'

'সেটারও চেষ্টা চলেছে, তবে কাজটা খুব সহজ নয়।'

'খুব শক্ত?'

'খুব শক্ত।'

'দারুন রহস্য?'

'দারুন রহস্য।'

'আর সেদিন যে বললে খাঁচার দরজায় রক্ত লেগে

শরৎ

রথীন্দ্রনাথ রায়

মেঘের ভেলা যাচ্ছে ভেসে দূরে
হাওয়ায় চড়ে বেনীমাধব পুরে
সোনার ছবি সাদা মেঘের ফাঁকে
দূর পাহাড়ে কোন পটুয়া আঁকে?

রাংতা মোড়া রোদের সোনা দুপুর
রঙের কলস জলের বুকে উপুড়
কাশের বনে বাতাস খেলে ঢেউ
হিজল তলায় আঁকছে বসে কেউ?

আছে ?'

'ওটাইত ভরসা। ওটাইত ক্লু।'

'ক্লু মানে ?'

'ক্লু হল যার সাহায্যে গোয়েন্দা দুষ্টু লোককে জব্দ করে।'

লালমোহনবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, তোমার পাখিকে কথা বলতে শুনেছ ?'

'হ্যাঁ,' বলল অনিরুদ্ধ। 'আমি ঘরে ছিলাম, আর শুনলাম পাখিটা কথা বলছে।'

'কী কথা ?'

'বলছে 'দাদু ভাত খান, দাদু ভাত খান'। আমি তক্ষুনি বেরিয়ে এলাম' কিন্তু তার পর আর কিছু বললনা।'

লালমোহনবাবুর মুখে হাসি। অনিরুদ্ধ শুনেছে দাদু ভাত খান আর লালমোহনবাবু শুনেছেন বাবু সাবধান। মানতেই হয় দুটো খুব কাছাকাছি। পাখি নিশ্চয়ই ওই ধরনেরই কিছু বলছিল।

'আপনার এখানে পাখি ধরতে পারে এমন কেউ আছে ?' ফেলুদা অমিতাভবাবুকে জিজ্ঞেস করল।

'আমাদের মালির ছেলে আছে, শঙ্কর,' বললেন অমিতাভবাবু। 'এর আগে দু একবার ধরেছে পাখি। খুব চালাকচতুর ছেলে।'

'তাকে বলবেন একটু চোখ রাখতে। খুব সম্ভব চন্দনাটা আপনাদের বাগানেই রয়েছে।'

বারাসতে থাকতেই দেখেছিলাম যে খবরের কাগজে চন্দনার বিষয় বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে। সেটার কাজ যে এত তাড়াতাড়ি হবে তা ভাবতে পারিনি।

বারোটা নাগাৎ একটি বছর পঁচিশেকের ছেলে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। বেশ চোখাচোখা চেহারা, পরনে জীন্‌স আর মাথার চুলের কপাল-ঢাকা কায়দা দেখলেই বোঝা যায় ইনি হালফ্যাসানের তরুণ।

ফেলুদা বসতে বলতে ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, 'বসবনা! আজ একটা ইনটারভিউ আছে। ইয়ে, আমি আসছি ঐ পাখির ব্যাপারে কাগজে যে বিজ্ঞাপনটা দিয়েছেন সেইটে দেখে।'

'ওটা আপনাদের পাখি ছিল ?'

'আমাদের মানে আমার দাদুর। দাদু মারা গেছেন লাস্ট মানথ। তাই বাবা ওটাকে বেচে দিলেন। ওটার দেখাশুনা দাদুই করতেন। বাবা কোর্ট কাচারি করেন, মা বাতে ভোগেন, আর আমার ওসবে ইন্টারেস্ট নেই।'

'কদ্দিন ছিল আপনাদের বাড়ি ?'

তা বছর দশেক। দাদুর খুব পিয়ারের চন্দনা ছিল।'

কথা বলত ?'

'হ্যাঁ। দাদুই শিখিয়েছিলেন। খুব রসিক মানুষ ছিলেন। অদ্ভুত অদ্ভুত কথা শিখিয়েছিলেন।'

'অদ্ভুত মানে ?'

'এই যেমন—দাদুর পাশার নেশা ছিল; পাখিটাকে শিখিয়েছিলেন "কচে বারো" বলতে। তারপর ব্রিজও খেলতেন দাদু। খেলার সময় অপোনেন্টের তাস ভালো বুঝতে পারলে পার্টনারকে একটা কথা খুব বলতেন। সেটা পাখিটা তুলে নিয়েছিল।'

'কী কথা ?'

'সাধু সাবধান।'

'ঠিক আছে। অনেক ধন্যবাদ।'

'আর কিছু—?'

'না, আর কিছু জানার নেই।'

'ইয়ে, বিজ্ঞাপন দেখে বুঝতে পারিনি এটা আপনার বাড়ি।'

'সেটা না বোঝারই কথা।'

'আপনাকে মীট করে খুব ইয়ে হলাম।'

ঝাড়া পাঁচ ঘণ্টা তার ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থেকে বিকেলে চা খেতে বেরিয়ে এসে ফেলুদা হাজরাকে একটা টেলিফোন করল;

'কাল সকালে কী করছেন ?'

'কেন বলুন ত ?'

'হালদার বাড়িতে আসতে পারবেন—ন'টা নাগাৎ ? মনে হচ্ছে রহস্যের কিনারা হয়েছে। তৈরি হয়ে আসবেন।'

লালমোহনবাবুকে টেলিফোনে বলে দেওয়া হল আমরা

ট্যাক্সি করে চলে যাব তাঁর বাড়ি সাড়ে আটটায়। সেখান থেকে তাঁর গাড়িতে বারাসত।

'রহস্য আরো বৃদ্ধি পেল নাকি ?'

'না। সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত।'

সব শেষে অমিতাভবাবুকে ফোন করা হল।

'আপনাদের বাড়িতে কাল সকালে একটা ছোটখাটো মিটিং করব ভাবছি।'

'মিটিং ?'

'আপনাদের পুরুষ মেমবার যে কজন আছেন তাঁরা যেন থাকেন। আর হাজরাকে থাকতে বলেছি।'

'কটায় করতে চাইছেন ?'

'নটায় হাজিরা। আপনার কাজের হয়ত একটু দেরি হতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা জরুরী।'

অমিতাভবাবু রাজি হয়ে গেলেন। —'পুরুষ মেমবার মানে কি অন্যকেও চাইছেন ?'

'না। সে না থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। এটা শুধু প্রাপ্ত-বয়স্কদের জন্য।'

আমরা যখন পৌঁছলাম, তার আগেই হাজরার দল হাজির। ফেলুদা এরকম ধরণের মিটিং এর আগেও করেছে। প্রত্যেকবারই আমার মনের মধ্যে একটা চনমনে ভাব, কারণ জানিনা কী হতে চলেছে, কার ভাগ্যে হাতকড়া আছে, কী ভাবে ফেলুদা রহস্যের সমাধান করেছে। লালমোহনবাবু আমাকে বললেন, 'আমি চিন্তাটাকে স্রেফ অন্য পথে ঘুরিয়ে নিয়েছি। এ ব্যাপারে ব্রেন খাটিয়ে কোনো লাভ নেই, কারণ আমার ঘিলুতে অনেক ভেজাল, তোমার দাদারটা পিওর। নিজের তৈরি রহস্যের সমাধান এক জিনিস, আর অ্যাকচুয়েল লাইফে সমাধান আরেক জিনিস।'

নীচের বৈঠকখানা ঘরে সকলে জমায়েত হয়েছি। হৃষিকেশবাবুর দিল্লী যাবার সময় হয়ে এসেছে। বললেন, 'এ বাড়ি ছেড়ে যেতে পারলে বাঁচি মশাই। কাজ থাকলে তবু একটা কথা। এখন প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।'

অচিন্ত্যবাবুর সঙ্গে ভালো করে আলাপ হয়নি। তিনি আপত্তি করেছিলেন এই মিটিং-এ উপস্থিত থাকার ব্যাপারে। তাঁর নাকি একটা বড় পার্ট নিয়ে খুব পরিশ্রম করতে হচ্ছে। কালই নাকি নাটকটার প্রথম শো। ভদ্রলোক ফেলুদাকে বললেন, 'আপনার এ ব্যাপারটা কতক্ষণ চলবে ?'

ফেলুদা বলল, 'খুব বেশি ত আধ ঘণ্টা।'

ভদ্রলোক তাও গজগজ করতে লাগলেন।

কফি খাবার পর ফেলুদা উঠে দাঁড়াল। কালসিটে ঢাকার জন্য ও আজ কালো চশমা পরেছে। এটা ওর একেবারে নতুন চেহারা। হাত দুটোকে প্যাণ্টের পকেটে পুরে সে আরম্ভ করল তার কথা।

'পার্বতীচরণের খুনের ব্যাপারে আমাদের যেটা সবচেয়ে অবাক করেছিল সেটা হল সাধন দস্তিদারের অন্তর্ধান। দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে খুনটা হয়। সাধন দস্তিদার পার্বতীবাবুর ঘরে ছিলেন সোয়া দশটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত। সাড়ে দশটায় তাঁকে আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে যেতে দেখেছি; দশটা পঁয়ত্রিশে অনিরুদ্ধর সঙ্গে কথা বলে পার্বতীবাবুর ঘরে গিয়ে আমরা

ছড়া

বিশ্বপ্রিয়

মেঘ থম্‌থম্ আকাশ থেকে
বৃষ্টি ঝরে ঝম্‌ঝম্—
জলের ঢলে পথ ভেসেছে,
লোক হাঁটে তাই কম কম।
গাছের নিচে ভিজছে ঘোড়া,
দাঁড়িয়ে আছে টম্‌টম্,
খড়দা' ছেড়ে—বড় দা যাবেন
কেমন করে দমদম!

তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখি। তৎক্ষণাৎ সাধন দস্তিদারকে খোঁজা হয়, কিন্তু পাওয়া যায় না। দারোয়ান বলে তাঁকে গেট থেকে বেরোতে দেখেনি। বাগানে খোঁজা হয়, সেখানেও পাওয়া যায় নি। কম্পাউণ্ডের যে পাঁচিল, সেটা আট ফুট উঁচু। সেটা টপকানো সহজ নয়, বিশেষ করে হাতে একটা ব্রীফ কেস থাকলে। আমরা—'

এখানে অচিন্ত্যবাবু ফেলুদাকে বাধা দিলেন।

'সাধনবাবুর আগে যিনি এসেছিলেন তাকে কি আপনি বাদ দিচ্ছেন?'

'আপনার বাবাকে যেভাবে আঘাত করা হয়েছিল, সেটা শক্ত সমর্থ লোকের পক্ষেই সম্ভব। পেস্টনজীর আরথ্রাইটিস আছে, তিনি ডান হাত কাঁধের উপর তুলতে পারেন না। অবিশ্যি পেস্টনজী ছাড়াও একজন তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন যিনি পেস্টনজী ও সাধনবাবুর ফাঁকে পার্বতী-বাবুর ঘরে গিয়ে থাকতে পারেন।'

'তিনি কে?'

'আপনি।'

অচিন্ত্যবাবু সোফা ছেড়ে উঠে পড়েছেন।

'আ—আপনার কি ধারণা আমি—?'

'আমি শুধু বলেছি আপনার সুযোগ ছিল। আপনি খুন করেছেন সে কথা বলিনি।'

'তাও ভালো।'

'যাই হোক্—সাধনবাবুর অন্তর্ধান বিশ্বাসযোগ্য হয় এক যদি দারোয়ান ভুল বা মিথ্যে বলে থাকে। আর দুই, যদি সাধনবাবু এ বাড়ি থেকে না বেরিয়ে থাকেন।'

'কোনো চোরাকুঠুরিতে আত্মগোপন করার কথা বলছেন?' হৃষিকেশবাবু প্রশ্ন করলেন।

অমিতাভবাবু বললেন, 'সে রকম লুকোনোর কোনো জায়গা এ বাড়িতে নেই। একতলার অধিকাংশ ঘরই তালাচাবি বন্ধ। এক বৈঠকখানা খোলা, রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর খোলা আর হৃষিকেশবাবুর ঘর খোলা।'

'এবং সে ঘরে তাকে আমি আশ্রয় দিই নি সেটা আমি বলতে পারি', বললেন হৃষিকেশবাবু। 'শুধু তাই নয়, সাধনবাবু যখন আসেন তখন আমি ছিলাম না।'

'আমরা পোস্টাপিসে খোঁজ নিয়েছি,' বলল ফেলুদা। 'আপনি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন পোস্টাপিস খোলার সঙ্গে সঙ্গে। তখন দশটা। পাঁচ মিনিট লেগেছে আপনার টেলিগ্রাম করতে। তার পরেই আপনি—'

'তারপর আমি যাই ঘড়ির ব্যাণ্ড কিনতে।'

'দুঃখের বিষয় দোকানের লোক আপনাকে মনে করতে পারছে না।'

'মিঃ মিত্তির, দোকানের লোকের স্মরণশক্তির উপর নির্ভর করেই কি আপনি গোয়েন্দাগিরি করেন?'

'না, তা করি না। এবং তাদের কথায় আমরা খুব আমল দিই নি। আর আপনিও যে সত্যি কথা বলছেন সেটা আমরা মানতে বাধ্য নই।'

'কেন, আমি মিথ্যে বলব কেন?'

'কারণ সোয়া দশটার সময় আপনারও ত পার্বতী চরণের ঘরে যাবার প্রয়োজন হয়ে থাকতে পারে!'

'এসব কী বলছেন আপনি? আপনি নিজেই বলছেন সাধনবাবুকে বেরোতে দেখেছেন, আবার বলছেন আমি গিয়েছি?'

'ধরুন সাধন দস্তিদার যদি নাই এসে থাকেন। তার জায়গায় আপনি গেলেন।'

আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। ঘরে সবাই চুপ, তারই মধ্যে হৃষিকেশবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।

'মিঃ হালদার কি উন্মাদ না জরাগ্রস্ত, যে আমি দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকব আর তিনি আমাকে চিনবেন না?'

'কী করে চিনবেন, হৃষিকেশবাবু? আপনি যদি মাথার সিঁথিটাকে ডান থেকে বাঁয়ে করে, গোঁফ দাড়ি লাগিয়ে চোখের চশমাটা খুলে পোষাক বদলে তাঁর ঘরে ঢোকেন, তাহলে আপনাকে সাত বছর আগের সাধন দস্তিদার বলে কেন মনে করবেন না পার্বতীবাবু? আপনি আর সাধন দস্তিদার যে আসলে একই লোক! প্রতিশোধ নেবার জন্য চেহারা পাল্টে নাম পাল্টে সেই একই লোক যে আবার সেক্রেটারি হয়ে ফিরে এসেছে সেটা ত আর বোঝেন নি পার্বতীচরণ!'

হৃষিকেশবাবুর মুখের ভাব একদম পালটে গেছে। তাঁর ঠোঁট নড়ছে কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না। দুজন কনস্টেবল এগিয়ে গেল তাঁর দিকে।

ফেলুদার কথা এখনো শেষ হয়নি।

'খুনের পর কি আপনার ভাড়া করা কোটের পকেটে পেপার ওয়েট পুরে তার ওজন বাড়িয়ে আপনি পুকুরের জলে ফেলে দেননি? তারপর নিজের ঘরে গিয়ে আবার হৃষিকেশ দত্ত সেজে বেরিয়ে আসেননি?'

এই শীতকালেও হৃষিকেশবাবুর সার্টের কলার ভিজে গেছে।

'আরো একটা কথা,' বলে চলল ফেলুদা। 'সাধু সাবধান কথাটা কি চেনা চেনা লাগছে? অনিরুদ্ধের জন্য কেনা চন্দনার মুখে কি কথাটা শোনেননি আপনি সম্প্রতি? আর শুনে আপনার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে কি বিশ্বাস ঢোকেনি যে কথাটা আপনাকে উদ্দেশ্য করেই বলছে? আপনি সাধু সেজে মনিবের সর্বনাশ করতে যাচ্ছেন জেনেই পাখি এই সাবধানবাণী উচ্চারণ করছে? আপনিই কি এই পাখিকে খাঁচা থেকে বার করে বাগানে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেননি? এবং এই কাজটা করার সময় আপনাকেই কি পাখি জখম করেনি?'

হৃষিকেশবাবু এবার লাফিয়ে উঠলেন চেয়ার থেকে।

'অ্যাবসার্ড! অ্যাবসার্ড! কোথায় জখম করেছে? কোথায়?'

'ইনস্পেক্টর হাজরা, আপনার লোককে বলুন ত ওঁর ডান হাত থেকে ঘড়িটা খুলে নিতে।'

প্রচণ্ড বাধা সত্ত্বেও ঘড়ি খুলে এল।

কব্জিতে প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা একটা আঁচড়ের দাগ, সেটা দিব্যি ঘড়ির ব্যাণ্ডের তলায় লুকিয়ে ছিল।

'আমি খুন করতে যাইনি—দোহাই আপনার—বিশ্বাস করুন!'

হৃষিকেশবাবুর অবস্থা শোচনীয়।

'সেটা অবিশ্বাস্য নয়,' বলল ফেলুদা, 'কারণ আপনার আসল উদ্দেশ্য ছিল নেপোলিয়নের চিঠিটা নেওয়া। পেস্টনজী বড় রকম দর দিয়েছেন সেটা আপনি জানতেন। মিঃ হালদার বেচবেন না সেটাও আপনি পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন। কিন্তু জিনিসটা চুরি করে ত পেস্টনজীর কাছে বিক্রী করা যায়! তাই—'

'আমি না, আমি না!' মরিয়া হয়ে প্রতিবাদ জানালেন হৃষিকেশবাবু।

'আগে আমার কথা শেষ করতে দিন। ফেলু মিত্তির আধাখাঁচড়া ভাবে সমস্যার সমাধান করে না। এ ব্যাপারে আপনি একা নন সেটা আমি জানি। চিঠিটা বার করে এনে নিজের ঘরে গিয়ে মেক-আপ বদলে আপনি যান আরেকজনের কাছে চিঠিটা দিতে। কিন্তু বাড়িতে খুন হয়েছে, খানাতল্লাসী হবে, সেটা জেনে এই দ্বিতীয় ব্যক্তিও সাময়িকভাবে চিঠিটাকে অন্য জায়গায় চালান দেন। তাই নয়, অচিন্ত্যবাবু?'

প্রশ্নটা একেবারে বুলেটের মতো। কিন্তু লোকটার আশ্চর্য নার্ভ। অচিন্ত্যবাবু ঠোঁটের কোনে হাসি নিয়ে দিব্যি বসে আছেন সোফায়।

'বলুন বলুন কী বলবেন,' বললেন ভদ্রলোক, 'আপনি ত দেখছি সবই জেনে বসে আছেন।'

'আপনি সাড়ে দশটায় একটু পরে একবার আপনার ভাইপোর ঘরে জাননি।'

'গিয়েছিলাম বৈ কি। আমার ভাইপোর ঘরে যাওয়ায় ত কোনো বাধা নেই। সে কদিন থেকেই বলছে তার নতুন খেলনা দেখাবে, তাই গিয়েছিলাম।'

'আপনার ভাইপোর ঘরে গতকাল এবং তার আগের রাত্রে একজন চোর ঢুকেছিল। সে যা খুঁজছিল তা পায়নি। আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন যে সে চোর আপনিই এবং আপনি খুঁজতে গিয়েছিলেন নেপোলিয়নের চিঠি—যেটা আপনিই তার ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলেন? চিঠিটা পাবেন এই বিশ্বাসে আপনিই পেস্টনজীকে ফোন করে অফার দিয়েছিলেন, তারপর সেটা না পেয়ে আর পেস্টনজীর ওখানে যেতে পারেন নি?'

'আমিই যখন লুকিয়েছিলাম, তখন সেটা আমি কেন পাব না সেটা বলতে পারেন?'

'কারণ যাতে লুকিয়েছিলেন সেটা ছিল খোকার

বালিশের তলায়। এই যে।'

ফেলুদা মিঃ হাজরার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। হবি সেণ্টার থেকে কেনা লাল প্লাস্টিকের মেশিন গান চলে এল ফেলুদার হাতে। তার নলের ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে টান দিতে বেরিয়ে এল গোল করে পাকানো নেপোলিয়নের চিঠি।

'হৃষিকেশবাবুর মেক-আপের ব্যাপারে আপনিই মাল-মশলা সাপ্লাই করেছিলেন বোধহয়?' প্রশ্ন করল ফেলুদা, 'ভাগ বাঁটোয়ারা কিরকম হত? ফিফ্‌টি ফিফ্‌টি?'

* * *

মালির ছেলে শঙ্কর চন্দনাটা ধরতে পেরেছিল ঠিকই, যদিও পাখি ফেরত পাওয়ার পুরো ক্রেডিটটা তার খুদে মক্কেলের কাছে ফেলুদাই পেল।

অমিতাভবাবু ফেলুদাকে অফার করেছিলেন পার্বতী-চরণের কালেকশন থেকে একটা কোনো জিনিস বেছে নিতে। ফেলুদা রাজি হল না। বলল, 'এই কেসটায় আমার জড়িয়ে পড়াটা একটা আকস্মিক ঘটনা। আসলে আমি এসেছিলাম আপনার ছেলের ডাকে। তার কাছ থেকে ত আর ফী নেওয়া যায় না!'

ঘটনার দুদিন পরে শনিবার সকালে লালমোহনবাবু এসে বললেন 'জলের তল পাওয়া যায়, মনের তল পাওয়া দায়। আপনার অতলস্পর্শী চিন্তাশক্তির জন্য আপনাকে একটি অনরারি টাইটেলে ভূষিত করা গেল।—এ বি সিডি।'

'এ বি সি ডি?'

'এশিয়াজ ব্রাইটেস্ট ক্রাইম ডিটেক্টর।'

বিনা মেঘে

মৃত্যুঞ্জয় কুণ্ডু

ফিষ্টিতে কি কি এলো
হাতে নিয়ে লিষ্টি।
সকলে মেলায় বসে
খোলা রেখে দৃষ্টি।
চাল ডাল আলু তেল
নুন আর লঙ্কা।
সব কিছু মিল করে
এনেছে যে বঙ্কা।
ডিম এলো সিম এলো
এলো মাছ মুরগী।
পায়েসের চাল এলো
এলো দুধ গুড় ঘি।
শহরের থেকে দূরে
ঘেরা বন পাহাড়ে।

ফিষ্টিটা জমে যাবে
নানাবিধ আহারে।
চারিদিকে কি বাহার
জন-প্রাণী-শূন্য।
জমকালো দিবাহার
হবে পেট পূর্ণ।
এইবার এইবার
শুরু হবে রান্না?
বিনা মেঘে বাজ নাকি!
চোখে কেন কান্না?
হায়! হায়! একি ভুল
টান ধরে নাড়ীতে।
ঘুঁটে কাঠ কয়লার
বস্তাটা বাড়িতে!!

এবার পুজোয় যে-বই নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে

সত্যজিৎ রায়ের

নতুন এক-ডজন গল্পের বই

আরো বারো

দাম ১২·০০

সত্যজিৎ রায় ফেলুদার রহস্য উপন্যাস যেমন দুর্ধর্ষ লেখেন, ফেলুদাকে নিয়ে গল্পগুলোও তেমনই দুর্ধর্ষ স্বাদের। কোথায় রয়েছে সেই সব গল্প? রয়েছে 'এক ডজন গপ্‌পো' তে, 'আরো এক ডজন'-এ, আর এই নতুন-বেরুনো গল্পের বই 'আরো বারো'তেও রয়েছে ফেলুদার রহস্য গল্প। তবে শুধু ফেলুদার গল্পই নয়, সত্যজিৎ রায়ের প্রত্যেকটি গল্পই অসাধারণ। ভাবো তো, 'সেপ্টোপাসের ক্ষিদে,' 'খগম,' 'পটলবাবু ফিল্মস্টার' বা 'সমাদ্দারের চাবি' জাতীয় গল্পগুলোর কথা। কী অদ্ভুত সুন্দর। তাই না? 'আরো বারো'তেও নতুন বারোটি গল্প। তার মধ্যে একটি আবার আরো নতুন, বইতে বেরুবার আগে কোনো পত্র পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং 'আরো বারো'র আকর্ষণ আরো বেশি, ঢের ঢের বেশি। এ-বইয়েরও পাতায় পাতায় সত্যজিৎ রায়ের ছবি, চোখ-ভোলানো মলাট, সত্যজিৎ রায়েরই আঁকা।

সত্যজিৎ রায়ের অন্যান্য বই: হত্যাপুরী ৮·০০ ছিন্নমস্তার অভিশাপ ৮·০০ স্বয়ং প্রোফেসর শঙ্কু ৮·০০ গোরস্থানে সাবধান ৮·০০ মহাসংকটে শঙ্কু ৮·০০ ফেলুদা এণ্ড কোং ১০·০০ ফটিকচাঁদ ১০·০০ জয় বাবা ফেলুনাথ ৮·০০ আরো একডজন ১২·০০ রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৭·০০ সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৮·০০ কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৭·০০ বাক্স রহস্য ৭·০০ সোনার কেল্লা ৭·০০ গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৭·০০ প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ড কারখানা ৮·০০ এক ডজন গপ্‌পো ১২·০০ বাদশাহী আংটি ৮·০০।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯।
ফোন ৩৪-৪৩৬২

ভূতের জামীন

প্রভাতমোহন বন্দোপাধ্যায়

অস্ত'চল দস্তিদার—
পোস্ত খেয়ে অস্থি সার
শ্মশানেতে যে মস্ত বট
অবস্থান-ধর্মঘট
ম'রেও নেই স্বস্তি তাঁর ;
দেহ হলেও চিতায় ছাই,—
—পেত্নীভূত বহু বিকট
করছে সেথা,—নেই রেহাই।

বস্তুতই ছিল না তাঁর
মরার পরে বেঁচে থাকার
নাস্তিকের মতোই দিন
পঞ্চভূতে শরীর ক্ষীণ
বস্তু দেহ ছেড়ে এখন
অনেকে আশ্বস্ত হন
মোটে তা'ন'ন দস্তিদার,
বিদেহিদল শাস্তি তাঁর
ফ্যাসাদে তিনি পড়ে গেছেন,
হেসে তাদের উড়িয়েছেন
'দেহের অতিরিক্ত প্রাণ
পেত্নীভূত বিদ্যমান
ভূতেরা শুনে বেঁধেছে জোট
বিধান দেছে বিদেহী কোর্ট
জীবনে করেছেন যে পাপ,—
তাহার তরে চাইয়ে মাফ
কুৎসা যত সস্তা তাঁর
সমস্তই, হস্ত চার
প্রস্তুতি তো ভূত হবার ;
শাস্ত্রমতে আস্থাহীন
কেটেছে জানি' হবে বিলীন
মরণ হলে। দৈবাধীন
দেখেন তিনি লুপ্ত নন !
জীবাত্মার অমরতায়,—
বট গাছের বস্তিটার
করছে দাবী। এক কথায়
ভূতের দলে চটিয়েছেন,
প্রকাশ্যেই জীবনভোর।
অবাস্তব, নেই প্রমাণ।
কল্পনায়।' সে কথা ওঁর
হারিয়েছেন তাদের ভোট।
—তাঁহাকে বয়কট করে,—
তাদের দিয়ে মনস্তাপ—
এখন গলবস্তরে—
করানো চাই প্রত্যাহার
দেওয়ানো চাই নাকখৎ-ও,

উল্টো গাধায় করে সওয়ার
ঘোরানো চাই, ভূতসভার
অতঃপর বেঁধে তাঁকে,—
ডোবানো চাই পচা পাঁকে
ফিরিস্তিটা কিছু শুনেই
পরাস্ত যে তিনি জেনেই
তুলে বলেন যেন বেজায়
ভূতসভার। আমার গায়
মজাটা, প্রেত যোনিতে আর
ঘাঁটাতে মোরে পুনর্বার।'
কোথায়? 'আছো একশ' ভাই,
সবার আজ।' শুনে সবাই

রাস্তা দিয়ে সাতটা গাঁর
জুড়োবে তাতে বাক্ ক্ষত।
বেলেস্তারা দিয়ে নাকে,—
ক্যানেস্তারা বাজিয়ে জোর।
অস্তাচল নিজেতে নেই,
সপ্তমেতে কণ্ঠ ওঁর
রুষিয়া 'আমি মানিনে রায়
যে দেবে হাত টের পাবে
হবে না কভু সাহস তা'র
তেজটা নাস্তিকের যাবে
ভূত হবার ট্যাক্সো চাই
অবাক্। বলে, 'সে কি আবার?'

অস্তাচল বোঝেন ভয়
শাস্তি দেওয়া সব সময়,
'সনদ বিনা যম রাজার
বসেছ জুড়ে হাটবাজার
বাড়িতে গাছে শহরে গাঁয়;
সবারে ধরে নিয়ে না যায়।
বলেছিলেন, 'ধরায় যাও,
মরলে পরে যে কটা পাও
কে কোথা ভূত ঘুরে বেড়ায়,—
শুনেছি নাকি প্রেত পাড়ায়
হানাবাড়ি ও নানা গাছে
ভালো না এ-তো! তুমি কাছে
খবর দিও।' কী অদ্ভুত!
'মুষলধারী শমন দূত
এত গুলিকে কাছে পেলাম,
এখন বলো কার কি নাম,—
পুণ্যবান্ স্বর্গে যাক;
রৌরবেতে র'বে বেবাক

ধরেছে, কল, সহজ নয়
আছেন বাবা জেনো বাবার।
রয়েছে ভূত বহু হাজার,
যমপুরীরে দিয়ে ফাঁকি—
যমদূতেরা কুঁড়ে বেজায়,—
ধর্মরাজ মোরে ডাকি'
নাস্তিকের ভাব দেখাও
হদিস দেবে বেওয়ারিশী
শাসন মোর ছলে এড়ায়।
সাধু ও পাপী মেশামিশি
গতি না পেয়ে ব'সে আছে;
সবারে ছলে ক'রে জড়ো
কূটনীতিতে নেইকো খুঁত।
আসতে দেরি নেই বড়ো।
পূর্ণ মোর মনস্কাম।
জীবনে ছিল কী পরিচয়?
অবীচি, পুৎ, কুম্ভীপাক
কুণ্ড ফাঁকা? তাও কি হয়?

যথাস্থানে গেলে সবে
বলিল সকরুণ রবে
সবার মুখপাত্র সে,
পড়েছি রাজদূত-রোষে,
ছোক্‌রাগুলো অর্বাচীন,—
না বুঝে ত্রুটি করেছে হীন
দেখিয়ে, প্রভু, দয়া করুন ;
স্বর্গে পাঠাতে না পারুন
দেবেন নাকো—মিনতি এই।
যে কথা, তাতে প্রত্যেকেই
দিতে হবে তা' দিন ব'লে
বাঁচান রেখে পদতলে।'

অস্তাচল বলেন, 'হায়!
মস্তকেতে ন্যস্ত দায়
করেছি, ছাড়ি কী ক'রে আজ?
কঠিন বটে নরকমাঝ
দগ্ধ সন্দংশিকায়
জ্বলা,—কম না বিভীষিকায়
তীক্ষ্ণ করাতে কর্তন,—
সর্পগুহা-নিক্ষেপণ।
অগ্নিধূমে ভরা সেদেশ,
যমদূতের দয়ার লেশ
ফেলতে তোমাদের তো মন
ভাবছি। প্রেত প্রেতিনীগণ
কান্না জোড়ে উচ্চরোল।
দস্তিদার ক'ন, 'পাগল
চলবে না কো হলে অধীর ;
সাহায্যেতে টেলিপ্যাথির
তোমরা—মোর ছুটি হবে।'
বৃদ্ধ ভূত এক তখন—
'বুঝেছি বুদ্ধির দোষে
ক্ষমা করুন, হে মহাজন।
এদের কথা ছেড়েই দিন,
শাস্তি ভয় আপনারে
নরক শুনি অতি দারুন,
নরকে ঠেলে একগাড়ে
বলেছিলেন পূর্বেতেই
রয়েছি রাজি। ট্যাক্স কত
নিরাশ্রয় প্রেতদলে
যেন বড়োই বিব্রত
পড়ছ মিছে আমার পায় ;
সুষ্ঠু ভাবে প্রায় উদ্ধার
কী ক'বে শুনে ধর্মরাজ?
লৌহমুষলের প্রহার,
ছেঁড়া, নরকানলশিখায়
চূর্ণ হওয়া উদুখলে,—
তপ্ত তেলে নিমজ্জন,—
আর্তনাদ শুধু চলে,
সাংঘাতিক, শাস্তিক্লেশ,
নেই মোটেই। বিপদে সেই
চায়না। কী যে করি এখন?
ভয়ব্যাকুল চার পাশেই
'এ ও তো ভারী গণ্ড গোল!',
করবি তোরা আমাকে কি!
দরবারেতে আছে খাতির ;
ধর্মরাজে ব'লে দেখি—

যদিই হয় করুণা তাঁর।'
বসিলা ধ্যানে—প্রেতসভার
করিতে ; তাঁর দেবতা 'বস্',—
করেন কৃপা। মিনিট দশ
জড়িত চোখ খুলিয়া, 'ঢের
করিতে হ'ল মহারাজের
শেষটা এই দেছেন রায়,
দণ্ডদান-অভিপ্রায়
নয়কো জেনে ভূত সবে
তাদের ছেড়ে রাখা হ'বে
দেখিয়ে ভয় কারও ঘাড়
করবে না, সুগন্ধ বা'র
হ্যাংলাপনা করবে না,
দিনে বা রাতে পড়বে না
করবে আগে অঙ্গীকার,
থাকবে তুমি জামীনদার।
কুক্ষণেতে তোদের দায়
করবি তোরা কে কী কোথায়,
অন্ধকারে নৃত্য গীত
কম্প। দুর্জন-সহিত
জানিনা কতদিন যাপন
স্বজন ত্যজিঃ—সিংহাসন-
মহোৎসাহে প্রেত প্রবীণ
আমরা দে'ব রাত্রিদিন
সর্বনাশে পরিত্রাণ
রাখবে তাঁর, দেবে প্রমাণ—

চক্ষু মুদি' দস্তিদার
পক্ষ হয়ে আরজি পেশ
যদিই তাঁর ভক্তিবশঃ—
অন্তে কন স্বপ্নাবেশ-
কান্নাকাটি লাগি' তোদের
গলেছে মন। ভক্তাধীন
না জেনে অপরাধ করায়
নেই কো তাঁর, তবে স্বাধীন
থাকলে নিরুপদ্রবে
বাইরে ঘোর যমপুরীর
ভাঙবে না কো, অত্যাচার
হ'লেও মাছ অম্বুরীর,
কারও ঘাড়ে চড়বে না,
কারও বাড়ি মল বা ঢিল—
প্রেতগণের ভদ্রতার,
ছাখ্ তো দেখি কী মুস্কিল !
গেল যে চেপে নিজ মাথায় ;
—সামলানো কি সহজ কাজ ?
জুড়লে হবে আমারি হৃৎ-
জড়িয়ে শেষে পাব কি লাজ ?
করতে হবে হেথা আপন
পার্শ্বে স্থান ছেড়ে।' তখন
কন কজন 'আদেশ দিন,
পাহারা। প্রেত প্রেতিনীগণ
পেয়েছে যাঁর কৃপায়—মান
ভূতেরা অকৃতজ্ঞ নয়।'

পক্ষ হয়ে প্রেতসভার
কণ্ঠে দিলা পুষ্পহার,—
জয়ধ্বনি দিল সবাই।
শুনে তা ভাবে শিউরে 'যাই

ব্রহ্মদৈত্যজী তাঁহার
কপালে ফোঁটা। সেই সময়
দস্তিদার-বাড়ি ক'ভাই
বাবার মত থাক, না থাক,—

শ্রাদ্ধ হবে, ঘাট-কামান,—
গয়ায় পরে যথা বিধান।'

টেবিলে রাখা খাতায় গেছে
দেহটা বটে, রয়েছি বেঁচে
হাজির র'ব শ্রাদ্ধে স্বীয়,
বন্ধু জনে খাওয়ায়ে দিও।
এড়িয়ে সাজা—হয়েছি হেথা
রয়েছি যে কী ঝঞ্ঝাটে তা'
সঙ্গে দিনু পৃষ্ঠা-চার
পদাশ্রিত,—জামীনদার
পিণ্ড দিতে আমায় স্থির
নামেও দিও; দুর্গতির
অন্ত। নেবে আমার মতো
জন্ম। এই ভাগ্যহত
বিদেহে বাঁচা সুখের নয়,
বোধহয় এতে সুরাহা হয়
দেহান্তেতে সুকৃতি-হেন
সুপথে থেকো, আশিস্ জেনো

লোকখাওয়ানো পিণ্ডদান

পরের দিন সবে অবাক্,

কখন বাবা লিখে, 'মরেছে
দিব্যি, গেছে ব'দলে মত।
খাদ্য মোর যা ছিল প্রিয়
ঘটতেছিল ঘোর বিপদ,
বুদ্ধি বলে ভূতের নেতা,
ব'লব কা'কে? চিঠিতে এই
নাম যাদের—এরা আমার
এদের আমি। গয়া যাবেই
করেছ জানি,—এই গুলির
হয়তো হবে তা'তে এদের
অন্য দেহে ইতস্তত:
সত্তা নিয়ে জ্বালা খেদের
দেখলে পায় স্বজন ভয়;
পাপ ক্ষয় হ'য়ে যাবার।
বন্ধু নেই। শাস্ত্র মেনো,
নিত্য-শুভকামী বাবার।'

মেকআপ

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

এ্যাডভেঞ্চার শুরু হয় হালকা হাসির কথার ছলে। পাহাড়ী সান্ন্যাল পানের ডিবে খুলে ঠান-দিদির মতো জমিয়ে বসে গল্প করছিলেন। মোটর গাড়ী সারাবার কোলাহলমুখর কারখানায় এতবড় সঙ্গীত-বিদ ও নামকরা অভিনেতা কেমন করে মন বসাতেন আমি ভেবেই পেতাম না।

সেদিন উঠি উঠি করছি এমন সময় সান্ন্যাল মশাই বললেন, 'ছদ্মবেশের কথা বলছিলেন? ওই দেখুন ছোট্ট একটা বাক্স হাতে যে লোকটা পালিতের সঙ্গে কথা বলছে—ওর মত গুণী 'মেক-আপ-ম্যান' ভূ-ভারতে আর পাবেন না। নিউ থিয়েটার্সে হাত পাকিয়েছে। ঐ পেটিটি হচ্ছে ওর কারখানা। লোকটি কয়েক মিনিটের মধ্যে এমন ভোল পালটে দিতে পারে যে আপনার গিন্নীও আপনাকে চিনতে পারবেন না।'

মাথায় একটা দুর্বুদ্ধি চাড়া দিয়ে উঠল, বললাম, 'আলাপ করিয়ে দিন—ইস্টারের ছুটিতে গিন্নী মেয়েকে নিয়ে শিলং যাচ্ছেন। তাঁদের সঙ্গে ডক্টর সুধীর সেন যাচ্ছেন সপরিবারে। আমি যদি পোড়াদা পর্যন্ত ওঁদের সঙ্গে এক কামরায় গিয়ে সেখান থেকে গাড়ি বদল করে খোকসায় নেমে বাসে করে জানিপুরে নৌকা ধরি তাহলে রাত নটা নাগাদ হিজলাবটের কুঠিতে পৌঁছে যেতে পারি। দুটো কাজই একসঙ্গে হবে, প্রথমে দেখব এই দুই পরিবারের কেউ এক কামরায় থেকে আমাকে চিনতে পারে কিনা আর তার পরে অধ্যক্ষ হেরম্ব মৈত্র মশায়ের কুঠিবাড়িতে সমবেত ইস্টারের ছুটি কাটাবার দলটি আমাকে চিনতে না পারলে তাদের নিয়ে অনেক মজা করা যেতে পারে।

পাহাড়ীর ডাকে ছদ্মবেশ-শিল্পী কাছে এলেন। আমার প্রস্তাব শুনে বললেন, 'আসাম-মেল ছাড়ে দিনের বেলায় যখন সূর্যের আলো সবচেয়ে প্রখর। এই সময় কোনো পরচুলের ব্যবহার বা কোনো রং-এর প্রলেপ চলবে না। বুঝছেনই তো, একে যুদ্ধের ডামাডোল, তার ওপর স্বদেশী সন্ত্রাস আর সাম্প্রদায়িক হানাহানির জন্যে পুলিশের তৎপরতা খুব বেড়ে গেছে। ছদ্মবেশে গেলে গেট থেকেই গোয়েন্দা পিছু নেবে। তার চেয়ে আমরা দুজনে প্ল্যাটফর্মে গাড়ি দেবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে বাথরুমের মধ্যে ভোল বদল করে দিতে পারি। কিন্তু পারিশ্রমিক লাগবে ২৫, টাকা।'

কেবলমাত্র মজা করবার জন্যে এত টাকা খরচ করবার মতো সামর্থ্য ছিল না আমার। কিন্তু সান্ন্যাল মশাই বলে কয়ে পাঁচ টাকা কমিয়ে দেওয়াতে আমার পিছিয়ে আসবার উপায় রইল না।

এইসব ব্যাপারে গৃহিনীর বান্ধবী, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকারীদের আশ্রয়-দাত্রী সুহাসিনী গাঙ্গুলীর কাছ থেকে উৎসাহ পেতাম। এবার তিনি কেবলমাত্র পরামর্শ দিয়ে ক্ষান্ত হলেন না। আমাকে বললেন তিনিও হেরম্ববাবুর দৌহিত্র হিরণকুমার সান্ন্যালের কাছ থেকে হিজলাবটে ছুটি কাটাবার নিমন্ত্রণ পেয়েছেন। অতএব আমার সঙ্গে যাবেন। তাঁর ছদ্মবেশের দরকার হবে না যেহেতু বোরখা ধারণ করলেই চলবে।

শেষ পর্যন্ত শিল্পীকে অগ্রিম কিছু টাকা দিয়ে জানিয়ে দিলাম আমাকে একজন বিহারী অন্ধ মুসলমান করকোষ্ঠী পাঠক সাজিয়ে দিতে হবে। আমার পরিচয় পত্রে লেখা থাকবে হাতের রেখার উপর আঙুল চালিয়ে ভূত ভবিষ্যত বলে দিতে পারি। আমার সঙ্গে থাকবেন বোরখাধারিনী ভগ্নী। দুজনের পোশাকের ব্যবস্থা আমিই করব। তাঁকে কেবল আমার চেহারা পাল্টে দিতে হবে।

তখন ছিল এপ্রিল মাসের গোড়ার দিক। ইস্টারের ছুটির মাত্র কয়েকদিন বাকি। ইতিমধ্যে আমরা হিজলাবটের কুঠি বাড়িতে নিমন্ত্রিত আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের একটি তালিকা যোগাড় করে ফেললাম। দেখলাম দলের মধ্যে আছেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকার, সিটি কলেজের অধ্যক্ষ সুরেশবাবু, ডঃ জ্যোতিপ্রকাশ সরকার, মিরাট ষড়যন্ত্র কেসের আসামী রাধারমণ মিত্র ও আরও পরিচিত অনেকে। হিরণ তো বাড়ির ছেলে অতএব তাঁরও থাকবার কথা।

ক'দিন সুকৌশলে এই সব লোকেদের বিগত জীবনের ঘটনাবলীর খবরাখবর সংগ্রহ করে আমরা দুজনেই মুখস্থ করে ফেললাম।

আমার অফিসের একজন মুসলমান সহকর্মীর কাছ থেকে যোগাড় হল ফেজ্ টুপি, উর্দু খবরের কাগজ, দু জোড়া করে চোগা চাপকান বোরখা। কার্ড ছাপানো হল ইংরেজি ভাষায়। বদরুদ্দীন আমেদ, ঠিকানা গয়া জেলার একটি গ্রাম। কুষ্টিয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের একটি জাল প্রশংসা পত্র তৈরী করিয়ে নিলাম। স্থির হল সুহাসিনী ও আমি আলাদা আলাদা কামরায় গিয়ে পোড়াদায় নেমে মিলিত হব। তারপর সেখান থেকে গাড়ি বদল করে খোকসায় যাব।

এদিকে বাড়ির লোকেরা জানল যে একটি লোহা বোঝাই করার জন্যে জাহাজ এসে যাওয়ায় আমার স্টেশনে যাওয়াও সম্ভব হবে না। দেখতে দেখতে বৃহস্পতিবার এসে গেল। পরের দিন গুড ফ্রাইডে। আমি ডকে যাবার নাম করে সরে পড়লাম।

মনে ছিল না আসাম মেলে কামরার সংলগ্ন শৌচাগার থাকে না। করিডর ট্রেন। আমরা রিসার্ভ করা কামরা থেকে কিছু দূরে একটি পায়খানায় ঢুকে পড়লাম। শিল্পী আমাকে কোমডের উপর বসিয়ে কাজে লেগে গেলেন। তাঁর বাক্সর মধ্যে থেকে বার হল একটি ছোট সাইজের চকচকে ইস্পাতের ক্লিপ, একশিশি স্পিরিট গাম ও সদ্য কেটে আনা এক জোড়া ছাগলের ল্যাজ। সে দুটি ছিল রক্তাক্ত গামছায় মোড়া।

আমাকে বিচলিত হতে দেখে শিল্পী বললেন, 'মশাই এ দুটোকে সদ্য সদ্য কালিঘাট থেকে কাটিয়ে আনতে হয়েছে। একমাত্র নাট্যমঞ্চে ছাড়া আর কোথাও দিনের আলোতে পরচুল চলে না। সদ্য কেটে আনা ছাগলের ল্যাজের আগায় মানুষের স্বাভাবিক চুলের চিকন থাকবে।'

এরপর তিনি আমার মুখের উপর স্পিরিট গামের প্রলেপ দিয়ে দিয়ে কাঁচি দিয়ে কেটে কেটে জুড়ে দিতে লাগলেন সেই মোটা চুল। দুর্গন্ধে আমার নাড়িভুঁড়ি, তোলপাড় করে উঠল কিন্তু আড়ষ্ট হয়ে বসে সহ্য করা ছাড়া উপায় ছিল না। আড় চোখে দেখা গেল ছোট ছোট গুচ্ছগুলো ক্রমশঃ স্পিরিট গাম প্রলেপনে ঘন হয়ে আসছে। তারপর তিনি ক্লিপ নিয়ে দক্ষ ভাস্করের ছেনি চালনার মতো করে ছাঁটার কাজ চালিয়ে গেলেন। সময় খুব বেশি ছিল না কারণ ইতিমধ্যে ট্রেনযাত্রীদের কোলাহল কানে আসছিল। আরশি ছিল আমার পিছন দিকে অগত্যা কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। ক্রমশঃ ছাগলের দুর্গন্ধ স্পিরিট গামের তীব্র মদো গন্ধে ঢাকা পড়ে গেল। আমিও দুটি চড়া গন্ধে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম।

টাক মাথা ঢাকা পড়ল লাল ফেজ টুপিতে। ঝুলপির সাদা চুলে পড়ল কলপের প্রলেপ। চোখের কোনে খানিকটা হাল্কা কাজল বুলিয়ে কোটরগত ভাব আনা হল। তার উপর পরলাম একজোড়া হাল্কা কালো রঙের চশমা। ঝরে পড়া ছাগল-চুলগুলিকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে শিল্পী বললেন, 'এবার উঠে দাঁড়িয়ে

দেখুন নিজেকে চিনতে পারেন কিনা।' আমি তো অবাক। মনে হল আয়নায় যে মুখ প্রতিফলিত সেটা আমার হতেই পারে না।

শিল্পী এবার বললেন, 'আমার কাজ শেষ হল, কিন্তু এর পর আপনার নিজের চেষ্টায় চলন বলনে কিছুটা বদল আনতে হবে। আমার কথামত একটা আলু দু টুকরো করে এনেছেন নিশ্চয়?' আমি পকেট থেকে বার করে দ্বিখণ্ডিত আলুটি দেখাতে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এই ঠিক মাঝারি সাইজের—বেশি বড় হলে চলতো না। এই দুটিকে আলাদা করে দু গালে দুটো পুরে ফেললে আপনার মুখের ঠোঁটে টান পড়বে একটু দাঁত বেরিয়ে থাকবে আর দেখবেন কণ্ঠস্বর বদলে যাবে। তবে এখন থেকে মুখের মধ্যে পুরলে মাড়িতে ঘা হয়ে যেতে পারে। আপাততঃ যে ছদ্মবেশ করে দিয়েছি তাতে কেউ চিনতে পারবে না।'

ততক্ষণে যাত্রী সমাগম বেড়ে গেছে। আমি বন্ধুবর সুধীর সেনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে আর ইতস্ততঃ করলাম না।

শিল্পীকে বাকি টাকা দিয়ে বিদায় দিলাম। সে চলে যাবার পরে ধীরে সুস্থে ব্যাগ হাতে বেরিয়ে এসে করিডরের ভিড়ের মধ্যে পড়লাম। তখনও স্পিরিট গামের তীব্র মদো গন্ধ বার হচ্ছিল, কিন্তু যাত্রীরা এতই ব্যস্ত যে আমার দিকে বিশেষ নজর পড়ল না। আমি সোজা রাত্রের জন্যে রিসার্ভ কামরায় ঢুকে গৃহিণী, কন্যা ও বন্ধুপত্নীর পাশ কাটিয়ে প্ল্যাটফর্ম-এর দিকের একটি জানলা দখল করে বসে গেলাম। সেটা হয়ত সেন সাহেবের বসবার জন্যে খালি রাখা ছিল। দেখলাম তিনি নেমে গিয়ে কোনো বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। আমি গ্যাঁট হয়ে বসে উর্দু কাগজখানি খুলে মুখ ঢেকে দৃষ্টি রাখলাম প্ল্যাট ফর্মের ওপর। একটু পরে দেখি সুহাসিনী হাতে একটি ও কাঁধে ঝুলিয়ে আর একটি বোঝা নিয়ে প্রতিটি কামরা দেখে দেখে এগিয়ে চলেছেন। আমার চোখে চোখ পড়তে একটু হাসলাম কিন্তু সে ইঙ্গিত চাপ দাড়িতে ঢাকা পড়ে থাকবে। দেখেও না দেখে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ফিরতে হল গৃহিণীর হাঁক ডাকে—'পুটু, পুটু কোথায় যাচ্ছ? উঠে এস—'

সুহাসিনী কামরায় ঢুকে বললেন, 'তোমরা আজকে যাচ্ছ জানতাম কিন্তু আমার যাবার কোন ঠিক ছিল না—হঠাৎ যেতে হচ্ছে পোড়াদায়—কিন্তু আমার ত' ইণ্টার ক্লাসের টিকিট, তাছাড়া একজন সঙ্গী আছে।'

সেন-জায়া কমলার সঙ্গেও সুহাসিনীর সৌহার্দ্যের সম্বন্ধ। দুই বান্ধবী একসঙ্গে বললেন, পোড়াদা পর্যন্ত বাড়তি ভাড়া তাঁরা দিয়ে দেবেন—সঙ্গীকে পোড়াদায় নেমে খুঁজে নিলেই হবে।

চলন্ত গাড়িতে আমার পদস্পর্শে সুহাসিনী বুঝে নিলেন সঙ্গী তাঁর কাছেই আছে। আমি একজন কেজ ধারী মৌলবীর ছদ্মবেশে যাব সে কথা জানা ছিল তাঁর কিন্তু কতখানি অপরূপ দেখতে হতে পারি সে সম্বন্ধে ধারণা ছিল না বলে হাসি গোপন করতে বেগ পেতে হল।

ডক্টর সেন একটি মোটা গোছের গ্রন্থ খুলে বসতে নিশ্চিন্ত হলাম। মহিলারা অনর্গল গল্পের মধ্যে অবাঞ্ছনীয় সহযাত্রীর জন্যে অস্বস্তি ভুলে গেলেন। একবার টিকিট চেকার ও আর একবার খানা কামরার খানসামার সঙ্গে উর্দু ভাষায় কথা বলে বুঝলাম ছদ্মবেশে উত্তীর্ণ হয়েছি।

বিপদ হল যখন পোড়াদা স্টেশনে ঢোকবার মুখে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে গেল। গাড়ির গতি মন্থর হয়ে এলে আমি কাগজখানা ভাঁজ করে হাতের ব্যাগের মধ্যে পুরে করিডরে বেরিয়ে এলাম। কালো চশমা পরাই ছিল। মাথার টুপির জন্যে অত্যধিক লম্বা দেখিয়ে থাকবে। দেখি অনেকের দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ।

এপ্রিল মাসে ছাতা নিয়ে আসবার কথা মনেও হয় নি। জল মাথায় করে নেমে আমরা দুজনেই চায়ের স্টলের দিকে ছুটলাম। সেখানে আশ্রয়প্রার্থীদের ভিড়ে ঠাসাঠাসি অবস্থা। আমার দাড়ি গোঁফের স্পিরিট গাম জলে ভিজে এমন উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে গেল যে সেখানে বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ মনে হল না। তার ওপর দেখি বুকের ওপর বেশ কয়েকটি টুকরো টুকরো চুল খসে পড়েছে!

সৌভাগ্য শতঃ সকলেই নিজেদের জামা কাপড় আর বিক্রির পণ্যকে জলের ঝাপট থেকে বাঁচাতে ব্যস্ত।

একজন ফেরিওয়ালা আমাকে বিদেশী ভেবে সন্দিগ্ধ ভাবে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, 'মিয়া সাহেবের কোথায় যাওয়া হবে?'

উত্তর দিলেন সুহাসিনী, 'আমরা খোক্‌সা যাব।'

'খোক্‌সার গাড়ি ত' এখনই ছাড়বে—ঐ ত' ঐ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে।'

ততক্ষণে বৃষ্টির প্রকোপ কমে গেছে। চক্ষের নিমেষে রেলপথের ওপর নেমে লাইন পার হয়ে সুহাসিনী আর একটি প্ল্যাটফর্মে উঠে পড়তে আমিও লাফ দিয়ে ছুট দিলাম। আমি তখন নিয়মিত ফুটবল খেলি, দৌড় ঝাঁপে অভ্যস্ত কিন্তু সুহাসিনীর তৎপরতায় আশ্চর্য হয়ে গেলাম। খোকসার গাড়ি ছাড়বে বলে গার্ডের বাঁশি কানে এল। সামনের বড় ইণ্টার ক্লাস কামরার জানালার ধারে প্রতিটি যাত্রীর দৃষ্টি আমাদের দিকে। সুহাসিনী তখনও বোরখা পরেন নি, তবে তিনি চওড়া পাড় অথবা রঙিন শাড়ি পরতেন না আর হাত ঘড়ি ছাড়া আর কোনো অলঙ্কার ধারণ করতেন না বলে কোন্ সম্প্রদায়ের লোক বোঝা যেত না। কিন্তু ঐ রকম করে দুটো বোঝা সমেত লাফিয়ে ওঠা দেখা যায় না বড় একটা। আমরা কামরায় ওঠা মাত্র গাড়ি ছেড়ে দিল। দুজন কামরার দু প্রান্তে ভিজা কাপড়ে আলাদা আলাদা বসে গেলাম। ভাবখানা যেন পরস্পরের কাছে অপরিচিত। বসে হাঁপাতে হাঁপাতে হঠাৎ চোখে পড়লো ছাগলের ল্যাজের চুলে আমার চাপকানের বুকটা প্রায় ভরে গেছে। ব্যাগ হাতে ঢুকে পড়লাম পাশের শৌচাগারে।

আর এক প্রস্ত চোগা চাপকান বার করে পরে নিলাম। ছোট আয়না বার করে দেখলাম ছদ্মবেশ ঠিকই আছে তোয়ালে দিয়ে চেপে চুপে শুকিয়ে নিতে গন্ধর উগ্রতা কমলো। বৃষ্টি থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির গতিও মন্থর হয়ে এল। স্টেশনে থামতে বেরিয়ে এসে দরজা খুলে নেমে পড়লাম।

শুনেছিলাম খোক্‌সা পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। এতগুলো সন্দিগ্ধ চোখের সামনে বসতে ভরসা হল না। এগিয়ে গিয়ে দেখি গার্ড এসে ফার্স্ট ক্লাস কামরা খুলে দিচ্ছেন। আর একটি পরিবারের সঙ্গে আমরাও দুজন উঠে পড়লাম।

সঙ্গিনী তাঁর ভিজা কাপড় বদল করতে ব্যাগ হাতে বাথরুমে ঢুকতে আমি তোয়ালে বার করে গোঁফ দাড়ি চেপে বসে বসে ঘুমিয়ে পড়বার ভান করে ঢুলতে লাগলাম। দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে এল। প্যাসেঞ্জার ট্রেনের কামরায় আলো জ্বলছিল মিট মিট

করে। সহযাত্রীরা আমাদের দিকে ভাল করে তাকিয়েও দেখলেন না। গার্ডকে বলা ছিল। টিকিট চেকার এসে সুহাসিনীর টিকিট বদল করে দিল।

খোকসায় নামবার সময় সুহাসিনীর ব্যাগটা হাতে করে দিতে গিয়ে তার ওজন দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কেবলমাত্র কাপড় চোপড়ের বোঝায় এত ভারী হতে পারে না। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি হেসে বললেন, 'আপনার ত কাঁচা লোহা পাথর নিয়ে কারবার আর আমরা হচ্ছি বোমা বন্দুকের পসারী।'

আমি ভাল করেই জানতাম যে তিনি জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর সন্ত্রাসের রাজনীতি ছেড়ে সমাজ সেবার কাজে নেমেছিলেন। তাছাড়া ও ভার লোহার নয়—মনে হল গোটা দুই মোটা বই নিয়ে চলেছেন। লোক দেখিয়ে বই পড়া বা বই পড়ানো তাঁর স্বভাব নয়। তখনকার মত কৌতূহল দমন করে যাত্রী বোঝাই বাসে না উঠে আমরা দুজন একটি একা ভাড়া করে জানিপুর নদীর ঘাটের দিকে রওনা হলাম।

চালক আমাদের প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করে দিল। ইতিমধ্যে ট্রেনে থাকতেই সুহাসিনী বোরখা বার করে পরে নিয়ে মুখখানা মাত্র অনাবৃত রেখেছিলেন আর আমাকে এক ফাঁকে মনে করিয়ে দেন যে আমি হচ্ছি বিহার থেকে নবাগত সুতরাং আমার উর্দু ছাড়া আর কোনো ভাষা জানা থাকবার কথা নয়। উপরন্তু চক্ষুহীন বলে তাঁর কাঁধে হাত রেখে চলতে হবে।

একা চালকের প্রশ্নের উত্তর তিনিই দিচ্ছিলেন। শুনলাম তিনি হচ্ছেন খুলনার এক হাকিমের মেয়ে। আমি আরও বড় হাকিম বলে আমাকে গয়া থেকে আনা হয়েছে কুঠি বাড়ির কোনো মহিলার দুরারোগ্য অসুখের চিকিৎসার জন্যে। চলেছি হিজলাবটে।

দেখতে দেখতে নৌকাঘাটে পৌঁছে গেলাম। সুহাসিনী একা ভাড়া মিটিয়ে আমাকে বোঝা তিনটির পাশে বসিয়ে আবছা অন্ধকারের মধ্যে নোঙর ফেলা নৌকাগুলির কাছে নেমে গেলেন। তাঁর ভারী ব্যাগটি দেখলাম তালা বন্ধ।

কিছুক্ষণ পরে আমাকে মাল সমেত নৌকায় তোলা হলে মাঝিদের কথা শুনে বুঝলাম যে পরদিন ভোরবেলা কুঠি বাড়ি থেকে দুজন বাবুকে আনতে হবে বলে বায়না নেওয়া আছে বলে নৌকা ভাসাতে রাজী হয়েছে নতুবা অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ভাটার সময় যেতে চাইত না। নৌকা চলেছিল ধীর গতিতে। আমরা দুজন একটি দরমার ছাউনির মধ্যে লণ্ঠনের আলোতে মাদুরের ওপর গুছিয়ে বসে সুহাসিনীর কাঁধের থলি থেকে খাবার বার করলাম। ফ্লাস্কে করে গরম চা এনেছিলেন। হাতে সন্দেশ নিয়ে দেখি স্পিরিট গাম শুকিয়ে মুখের চামড়ায় এমন টান ধরেছে যে হাঁ করবার উপায় নাই।

সুহাসিনী খুব আমুদে মেয়ে। তিনি হেসেই কুটি পাটি। বললেন, তাঁর যে প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে তাতে দুজনের ভাগ অনায়াসে খেয়ে ফেলতে পারবেন।

দেখতে দেখতে আকাশ জল ও দুই নদীতট ঘোর অন্ধকারে একাকার হয়ে গেল। দাঁড় টানার শব্দ ও মাঝি মাল্লার আলাপ ছাড়া সব পরিচিত আওয়াজ পিছনে ফেলে এসেছি বেশ কিছুক্ষণ। একবার ছাউনির বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম দূরে একদিকের তটে লণ্ঠনের আবছা আলো দেখা যায়। ফিরে এসে শুকিয়ে নেবার জন্যে ব্যাগ থেকে ভিজা কাপড় বার করতে যাচ্ছি এমন সময় প্রচণ্ড ঝাঁকানিতে লণ্ঠনটা নড়ে উঠলো। সুহাসিনী বললেন, 'চড়ায় নৌকা লেগেছে। আমি যাই—দেখি। মনে থাকে যেন আপনি অন্ধ—এক পাও নড়বেন না।'

আমি লণ্ঠনটা কাছে টেনে নিয়ে ছোট আয়না বার করে পকেট থেকে অর্ধেক করে কাটা আলুর টুকরো নিয়ে মুখ ফাঁক করে পুরে দিয়ে দেখি সত্যিই ত চেহারা পাল্টে গেছে। ভাবলাম সুহাসিনীকে চমকে দেবো কিন্তু তিনি ঝড়ের মত এসে কোনো কিছু লক্ষ্য না করে কানে কানে বললেন, 'মনে হচ্ছে ডাঙা থেকে সঙ্কেত পেয়ে এরা ইচ্ছে করে চড়ায় নৌকো আটকেছে। হয়ত কুষ্টিয়া থেকে পুলিশের লঞ্চ আসবে সার্চ করতে—আপনি যে অন্ধ ও উর্দুভাষী সে কথা ভুলে যাবেন না।

তারপর তিনি তাঁর ব্যাগটা তুলে নিয়ে আমার দিকে পিছন করে কি যেন ভারী মত জিনিস বার করে নিয়ে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম সুহাসিনীর অনুমানই ঠিক। বিপরীত দিক থেকে সার্চলাইটের উজ্জ্বল আলো এসে পড়লো। মোটর লঞ্চের শব্দ শুনলাম। তারপর সুহাসিনী খালি হাতে ফিরে এসে খাবার থলিটা বার করে ছড়িয়ে বসলেন। আমাকে বললেন 'খেতে পারুন বা না পারুন অন্ততঃ ভান করুন খাচ্ছেন।'

লঞ্চ থেকে নৌকা নামিয়ে জন কয়েক পুলিশের লোক এসে নাম ধাম জিজ্ঞাসাবাদ করে আমাদের জিনিসপত্র খুলে তন্ন তন্ন করে দেখলো। কাপড় চোপড় ও খাদ্য সামগ্রী ছাড়া কিছু পাওয়া গেল না। স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেটের পরিচয়-পত্রের ছাপা শিরোনামা দেখে অফিসারটি আমাদের আদাব জানিয়ে বিদায় নিলেন।

তারপর চড়া থেকে নৌকা বার করতে মাঝিরা লগা নিয়ে হিম্‌সিম খেয়ে যাচ্ছে দেখে সুহাসিনী তাঁর বোরখা ফেলে দিয়ে জলে নেমে গেলেন। আমি এ ব্যাপারে একেবারে আনাড়ি। সাঁতারও জানি না তাছাড়া যখন অন্ধর ভূমিকা নিয়েছি তখন আমার কিছু করাও সম্ভব ছিল না। বাধ্য হয়ে ছাউনির মধ্যে গিয়ে অপেক্ষা করতে হল। শেষ পর্যন্ত সুহাসিনীর নির্দেশ মত আর বোধ করি কিছুটা তিনি ঠেলাঠেলিতে সাহায্য করায় নৌকা ভাসানো সম্ভব হল। আমি বুঝলাম তাঁদের কথাবার্তা শুনে। নৌকা গতিশীল হলে আমি লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে আসছি দেখে সুহাসিনী আমার হাত ধরে বসিয়ে দিয়ে চাপা কণ্ঠে বললেন, 'আমার বোরখা আর ব্যাগটা বার করে দিন।' দেখলাম তাঁর কাপড় চোপড় জবজবে হয়ে ভিজে গেছে।

এবার যখন ব্যাগ হাতে দিলেন দেখি সেটা আগের মত ভারি। ইতিমধ্যে ভিজা কাপড় নিঙড়ে জল বার করে নিয়েছেন ও তার ওপর বোরখা চাপিয়ে ছাউনির মধ্যে ফিরে এলেন।

সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে নৌকা এসে লাগলো হিজলাবটের ঘাটে। গোরাই নদী থেকে খাড়া মাটির কিনারায় ধাপ কেটে নীল পচাবার পরিত্যক্ত হৌজের পাশ দিয়ে যে পথ উঠেছে সেটা আমার পরিচিত কিন্তু মাঝিদের মলিন লণ্ঠনের স্বল্পালোকে কিছুই ঠাহর হচ্ছিল না। দিনের আলোতেই ঝোপঝাড়পূর্ণ বিরাট বিরাট হৌজগুলি নিশাচর বুনো জানোয়ার ও সাপ খোপের বিশ্রামের জায়গা বলে কুখ্যাত ছিল। 'সুহাসিনী' তাঁর ব্যাগের মধ্যে থেকে একটি ছোট টর্চ বার করা মাত্র মাঝি দুজন ভাড়া আদায় করে নৌকার দিকে নেমে গেল। আমরা দেখি টর্চের ব্যাটারি এমন ক্ষীণ যে দু হাতের বেশি দূর দেখা যায় না। তাছাড়া যে-কোনো মুহূর্তে নিয়ে যেতে পারে। ভরসার মধ্যে একপা একপা করে এগিয়ে মোড় ফিরতেই কুঠিবাড়িতে সমাগত অতিথিদের কলরব কানে এল। এবার আমি চোখে চশমাখানি পরে নিয়ে সুহাসিনীর বোরখা ঢাকা কাঁধের ওপর হাত রাখলাম। তিনিই আমার পথ-প্রদর্শক হয়ে শব্দ অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে হঠাৎ চোখে পড়লো আকাশের অনেকখানি ঢেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুর্গের মত বিরাট ইমারত। কুঠির পিছনে এসে গেছি দেখে সুহাসিনী তল্পি-তল্পা-গুলি একটা বড় তেঁতুল গাছের তলায় রেখে ব্যাগ থেকে মোটা মতো একটা মোড়ক বার করে নিলেন। সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখি উজ্জ্বল আলোতে উদ্ভাসিত দোতলার বারান্দা থেকে অনেকে ঝুঁকে পড়ে আমাদের দেখে কি যেন বলাবলি করছেন।

সুহাসিনী ততক্ষণে তাঁর হাতের বোঝা সমেত সর্বাঙ্গ ঢেকে নিয়েছেন বোরখায় ও আমিও কাটা আলু দুটি মুখের মধ্যে পুরে গাল ফুলিয়ে নিয়েছি। অদ্ভুত কণ্ঠে চিৎকার করে জানিয়ে দিলাম কুষ্টিয়ার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের চিঠি নিয়ে বাবুদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

যে দলটি লাঠি-সোঁটা ও বড় বড় টর্চ হাতে নেমে এল তাদের অগ্রভাগে ছিলেন আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিরণকুমার সান্যাল ও তাঁর ছোট মামা লোহারাম। তাঁরা পরিচয় পত্র পড়ে বললেন, চলুন আপনাদের মসজিদে নিয়ে

যাই—সেখানে খাবার ও থাকবার ব্যবস্থা হবে। তারপর কাল সকালে এসে আমাদের হাত দেখে দেবেন।

আমি চোস্ত উর্দু ভাষায় বললাম, আমাদের অনেক জায়গা ঘুরে ঘুরে আসতে হয়েছে—তার ওপর চড়ায় নৌকা আটকে পড়ায় বড় হয়রানি হতে হয়—বড় ক্লান্ত আর এক পাও নড়বার সামর্থ্য নাই। যা হোক কিছু খেতে দিন—এই তো আপনাদের একতলার এই বড় ঘরে তক্তাপোশের ওপর শতরঞ্জি পাতা রয়েছে। এরই ওপর আমার বোন ও আমি একটা রাত কাটিয়ে দেবো।

হিরণ ও তাঁর ছোট মামা লোহারাম উর্দুভাষা বুঝলেও কথা বলায় অভ্যস্ত নন। সম্ভবতঃ আমার সব কথা বুঝতে পারেন নি। তাঁরা গিয়ে সুরেশবাবুকে ডেকে আনলেন। তিনি আগ্রায় ছিলেন অনেক বছর। তাঁর সঙ্গে আর একজন উর্দু জানা লোক এলেন রাধারমণ মিত্র। তাঁরা নেমে আসবার সময় নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বুঝেছিলাম যে মহিলা অতিথিদের মধ্যে সুহাসিনীর বোরখা ঢাকা শরীরের বহর দেখে সন্দেহ হয়েছে যে তিনি হচ্ছেন সশস্ত্র পুরুষ—ডাকাত দলের অগ্রদূত। যে পুরুষের দল লাঠি সোঁটা হাতে নেমে এসেছিলেন তাঁদের পিছনে দেখলাম সুশোভনবাবু নিরুদ্বেগে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন, 'ওঁরা এই ঘরে থাকতে চান, থাকুন না।'

হিরণ তবু আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসার মৌলবী হচ্ছেন অতিথিপরায়ণ লোক—কোনো অসুবিধা হবে না। খাবার না হয় বাড়ি থেকেই পাঠিয়ে দেবেন। বাড়ির চাকর বাকররা ত' সবাই মুসলমান।

খাবার কথায় আমার খিদে তেষ্টার কথা মনে পড়ে গেল। খপ্ করে তাঁর হাতখানা ধরে ফেলে বলে দিলাম, 'আপ্‌কা পিয়ারকা কুত্তা আপু গুজর জানে সে দিল্‌কা এক বাড়া হিস্‌সা জখম পায়া।'

রাধারমণবাবুর কণ্ঠস্বর শুনেই বলে দিলাম, 'উও আদমি ইংরাজ সারকারকা সাথ মোকাবলা করনে কোসিস্ কিয়া থা মাগার কোই ফায়েদা নাহি হুয়া—মেল্‌মে জানে পাড়া—'

সুরেশবাবুর প্রশ্ন উপেক্ষা করে আগ্রা সহরে প্লেগ সংক্রমণের সময় তাঁর এক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলে দিলাম।

'আশ্চর্য ক্ষমতা', 'আশ্চর্য ক্ষমতা,' বলতে বলতে দলটি উপরে উঠে যেতে আমরা দুজন তক্তাপোশের ওপর বসে গেলাম। দেখি রাধারমণবাবু এবার একলা নেমে এসেছেন। আমার কাছে এসে উর্দু ভাষায় আমাকে বললেন, 'আপনার ক্ষমতা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমাকে আপনার শাগরেদ করে নিন। আপনি ত সবই জানতে পারেন। জানেন ত' সংসারে আমার কোনো

দায়-দায়িত্ব নেই—বিয়ে করিনি কৃচ্ছ্রসাধনা করা অভ্যাস আছে।' আমি বললাম, 'গায়া জিলাকা গারমীকা তেজ আপকো মালুম হ্যায়—'

আমার কথা শেষ করা হল না। সুহাসিনী আমার জামার এক প্রান্ত টেনে ধরে বাইরে বার করে এনে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'আর দেরি করলে চলবে না—ওঁর কাছে পরিচয় জানিয়ে বলুন আমরা কে আমি মাসীমার সঙ্গে গোপনে দেখা করতে চাই।'

আমি ফিরে এসে দেখি রাধারমণবাবু উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন। আমি এবার যতদূর সম্ভব নিজের কণ্ঠস্বরকে স্বাভাবিক করে বাংলা ভাষায় বললাম, 'পুটুর বোধ হয় বাথরুমে যাবার দরকার, আপনি মাসীমাকে আলাদা ডেকে নিয়ে বলুন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

মহাবিস্ময়ে বড় বড় চোখ করে রাধারমণবাবু যখন দুড় দুড় করে চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন তখন খেয়াল হল তাইত নিজের পরিচয় দেওয়া হয় নি। যাই হোক, ওঁর পিছন পিছন উঠে গিয়ে বারান্দা থেকে প্রশস্ত হল ঘরের মধ্যে দেখি দুখানা শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপর ছড়িয়ে রাখা হয়েছে বন্দুক, লাঠি, সড়কি ও আরও কত কি অস্ত্র! ভীত সন্ত্রস্ত উদ্বিগ্ন মুখে দেওয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে গেছে মহিলা ও শিশুরা। পুরুষেরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে জটলা করছে। সুশোভনবাবুর দলে হিরণ, লোহারাম, আর তরুণদের মধ্যে প্রায় সকলে। তাঁরা বলছেন ওদের নিচের তলায় আশ্রয় দিয়ে সিঁড়ির দরজা বন্ধ রাখলেই হবে। সত্যসখা মৈত্র, জ্যোতিপ্রকাশ, সরকার, সুরেশবাবু মহিলাদের আতঙ্ক উপেক্ষা করতে চান না বলেই বোধ করি নিরপেক্ষ। আর এক দল বলছিলেন, 'বেশ ত, একটু বিশ্রাম করে চলে যাক। দরকার কি ঝক্কি নিয়ে? বোরখা পরা লোকটার বগলে একটা কিছু আছে বলে মনে হয়।'

হঠাৎ তাঁদের নজর পড়লো রাধারমণ-এর প্রতি। তিনি কয়েক মুহূর্ত দম নিয়ে দুহাত তুলে উচ্চৈস্বরে বলে উঠলেন, 'আশ্চর্য, আশ্চর্য—এবার কিন্তু লোকটা পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বললে—'

কে একজন প্রশ্ন করলেন, 'কি বললে?'

আমি অন্ধকারে কিছুটা এগিয়ে এসেছিলাম—দেখি তিনি দুই চোখ বিস্ফারিত করে বললেন, 'বললে, মাসীমাকে আলাদা করে খবর দিন, পুটু গোপনে দেখা করতে চায়—আমার নামটাও বলে দিল। আশ্চর্য!'

সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতৃজায়া উষা চট্টোপাধ্যায় হচ্ছেন হেরম্ববাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রী হিরণের, ও সেই সুবাদে, তাঁর সব বন্ধুদেরও মাসীমা।

হিরণেরই প্রথমে খটকা লাগলো—তিনি বললেন, 'চলত ছোট মামা, নিশ্চয় চেনা কেউ।'

মাসীমা তখন খাবার-ঘরে কাকে কোথায় বসানো হবে তার তদবির করছিলেন। এদিকে যে দুজন মানুষের আবির্ভাবে হুলস্থুল পড়ে গেছে তার কিছুই জানতেন না।

হিরণকে দলবল নিয়ে টর্চ আর লাঠি সংগ্রহ করতে দেখে আমি নিঃশব্দে নেমে এসে এক বিরাট দরজার কপাটের আড়ালে সুহাসিনীকে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজেও লুকিয়ে পড়লাম।

এবারের দল ঘরের এধার ওধার বাইরের চত্বর সব জায়গায় টর্চের আলো ফেলে বিস্ময় বিহ্বল কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ভ্যানিসড ভ্যানিসড্!'

সুহাসিনী আর থাকতে না পেরে মুখের ওপর থেকে বোরখা তুলে ফেলে হাসতে হাসতে উপরে উঠে গেলেন। তিনি হিরণ, সুশোভন ও আরো অনেকের খুবই পরিচিত।

আমিও পিছন পিছন উঠে গেলাম কিন্তু আমি যে কে সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তিনি আমার হাত ধরে সোজা মাসীমার কাছে হাজির হয়ে বললেন, 'হাকিম বদরুদ্দীন আমেদ সাহেব-এর ভরসায় গুণদির দেওয়া ডায়েরী দু খণ্ড এনেছি। এই নিন, আমরা এবার দায়িত্ব থেকে খালাস! ভাগ্যিস ওয়াটার-প্রুফ মোড়কে সীলমোহর করা ছিল তাই রক্ষা পেয়েছে। পুলিস হামলা করলে জলের মধ্যে ফেলে রাখতে হয়। বদরুদ্দীন

সাহেবের দাঁতে ব্যথা, খাবেন না। ওঁর ভাগটা আমাকে দিলেই হবে।'

মাসীমাকে অবাক করে দিয়ে আমি মুখের ভিতর থেকে আলুর টুকরো দুটো বার করে নিয়ে দাড়ি ছিঁড়তে শুরু করে দিলাম। সুহাসিনী আমার মাথা থেকে কেজ ফেলে দিয়ে দরজা খুলে দিতে হিরণ আমাকে চিনতে পেরে খিলখিল করে হাসতে লাগলেন। সুশোভনবাবু সব শুনে বললেন, 'এ পাকে'ক্ট প্ল্যান, পাকে'ক্টলি ক্যারেড আউট।' কিন্তু মাসীমা ছাড়া ডায়েরীর কথা কেউ জানলো না। তিনি সেদুটি নিজের ঘরে বাক্সে বন্ধ করে রেখে এসে সকলকে খাবার ঘরে ডাক দিলেন।

এক প্রস্ত খাওয়ানো হয়ে গিছলো। রাত প্রায় সাড়ে দশটার সময় বাকি সকলে হই হুল্লোড় করে খেয়ে নিলাম।

কয়েক বছর পরে মাসীমা ও সুহাসিনী দুজনেরই মৃত্যুর পরে, স্বাধীনতা লাভ ও দেশ বিভাগের আঠারো বছর পরে হায়দ্রাবাদে গুণদির সঙ্গে দেখা হলে তিনি বললেন, 'ডায়েরী' দুটি পুলিসের হাতে পড়লে অনেক দেশ-প্রেমিক ভাল লোকের হয়রানির অন্ত থাকতো না।'

কার ডায়েরী, কোথায় আছে, সে প্রশ্নের উত্তর পাইনি।

কাঁঠালতত্ত্ব

সচ্চিদানন্দ রায়

রাজামশাই বললে ডেকে মন্ত্রীকে,
'রাজ্যে আমার থাকতে যদি চাও টিঁকে
দশটি হাজার কাঁঠাল কিনে
করবে দেখা পরের দিনে
লোকলস্কর দাও পাঠিয়ে চারদিকে'

মন্ত্রী বলেন, 'এতে আবার ভাবনা কি ?
চাইছে রাজা মিলছে না তা-হয় নাকি ?
শুধাই তবু অভয় পেলে
দশটি হাজার কাঁঠাল খেলে
মহারাজার মহান পেটে সয় তা কি ?

রাজা বলেন, 'সত্যি দেখি যাই রটে
সবাই বলে 'বুদ্ধু তুমি,-তাই বটে
কেমন করে এইটি ভাবো—
দশটি হাজার কাঁঠাল খাবো
বুদ্ধি কি আর একটুও নেই ঐ ঘটে ?
পণ্ডিতেরা গেছেন লিখে খুব করে
প্রত্যেকে পর, নয়কো আপন কেউ তোরে
আবার কিছু বইতে মেলে
পাকা কাঁঠাল কোথাও পেলে
পরের মাথায় ভাঙ্গতে হবে খুব জোরে।
দশটি হাজার প্রজা আমার রাজ্যেতে,
প্রত্যেকে পর, তাদের কাছেই চাই যেতে
প্রত্যেকটির মাথার পরে
ভাঙ্গবো কাঁঠাল একটি করে
ধন্য হব শাস্ত্র মত কার্যেতে—'

ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়

পুলিস নাকাল

পুলিসকে লোকে ভয় পায়, কারণ যেমন প্রবাদ আছে 'বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা', তেমনি বাড়িতে পুলিসের প্রবেশ ঘটলেও তার ঘা সারতে চায় না, অনেক দিন তার জের চলতে থাকে। কিন্তু পুলিস ভয় পেয়ে নাকাল হয়ে গেছে এমন দু'একটা ঘটনাক্ষেত্রের কাহিনী আমি বলতে পারি।

যেমন ধরো বাদুড়বাগানের চাটুজ্যেবাড়িতে। সেকালের বড় তেতলা বাড়ি। আগে অনেক লোক ছিল, এখন নানা কারণে সে বাড়ি প্রায় শূন্য। তিন তলায় বিধবা সেজগিন্নী একলা থাকেন। তিনি নিঃসন্তান। দোতলায় বিধবা ন'গিন্নীও একাই থাকেন। তাঁর ছেলে নেই, দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। কখনো কখনও তারা এবং নাতি নাতনীরা কিছু দিনের জন্য এসে থেকে যায়। একতলাটায় একজন ভদ্রলোক স্ত্রী-পুত্রকন্যা নিয়ে ভাড়া থাকেন।

সেদিন বেলা আটটার সময় ন'গিন্নী যখন তাঁর ঠাকুরদের দেয়াল আলমারী খুলে ছোট, বড়, মেজ,-সেজ—নানারকম ঠাকুরদের কাউকে সিংহাসন থেকে তুলে—কাউকে ছোট্ট খাটের মশারির ভিতর থেকে বার করে স্নান করাচ্ছিলেন গঙ্গাজল দিয়ে—, তখন নিচের ভাড়াটেদের একটি ছেলে এসে খবর দিল, 'ন'দিদিমা, পুলিস এসেছে, বাড়ি সার্চ করবে। এখানে নাকি বোমা তৈরি হচ্ছে।' 'ন'গিন্নী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'বাড়ি সার্চ করবে করুক, কিন্তু আমি এখন উঠতে পারব না। সবে ঠাকুরদের গায়ে জল ঢেলেছি। মুছব, চন্দন দেব, সিংহাসন-খাট ঝাড়ব মুছব, তারপর পুজোতো সবটাই বাকী, অনেকক্ষণ যাবে আমার। এখন আবার পুলিসের জন্য দাঁড়িয়ে থাকলে আজ আর রান্না চড়বে না। খাইতো দুটো আলু সেদ্ধ ভাত, তাও জুটবে না। তুই, কি তোর দাদা, কেউ দাঁড়িয়ে সার্চ করাগে যা ওদিকের সব খোলা আছে। ট্রাঙ্ক আলমারীর চাবি চায় তো আমার কাছে চাস্।' এই রকম ঢালা হুকুম দিয়ে ন'গিন্নী বিরক্তিভরে স্তোত্র আওড়াতে আওড়াতে ঠাকুর সেবা করতে লাগলেন। যখন কর্তারা বেঁচে ছিলেন, বাড়িতে ছেলেরা ছিল, তখন দু'একবার বাড়ি সার্চ তিনি দেখেছেন, কাজেই সার্চ তাঁর কাছে নতুন কিছু নয়, তবে ভারী হাঙ্গামার, বিরক্তিকর ও তছনছের ব্যাপার তা' তিনি জানতেন। তবে ভয়ডর তাঁর চরিত্রে বিশেষ ছিল না। ছেলেটি তিনতলায় খবর দিতেই সেজগিন্নী একেবারে তেড়ে উঠলেন। 'বটে? সার্চ করবে? থাকিতো বাড়িতে দুটো বিধবা বুড়ি, আমরা বোমা তৈরি করব না তো করবে কে? নিয়ে আয় ডেকে তোর পুলিসের দারোগাকে, একেবারে ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দি।'

ছেলেটি 'কাপড় নয়, প্যাণ্ট' বলেই নিচে পালাল। সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার সময় সেজগিন্নী হাঁক দিয়ে বললেন, 'শিবু, একটু আগে থাকতে খবর দিস, কাপড়খানা পরব তাহলে।' শুচিবাবু

প্রাপ্ত মানুষ, সকালটা প্রায় গামছা পরেই কাটান। ঘরদোর মোছেন, প্রত্যেক টেবিল, খাট, পালঙ্ক আলমারি, ড্রেসিং টেব্‌ল্ ঝাড়ন দিয়ে ঝেড়ে মুছে চকচকে করেন ঐ বেশেই। অনেক বেলায় কাজ শেষ ক'রে স্নান ক'রে থান কাপড় পরেন।

দোতলার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে পুলিসের কর্তা শুনতে পাচ্ছিলেন বোধ হয় কিছু কিছু। শিবু তাঁকে দোতলায় নিয়ে এল। জন দুই কনস্টেবল নিয়ে তিনি সব ঘর ঘুরে ফিরে জিনিস পত্র নেড়েচেড়ে দেখলেন, তারপর বারান্দা দিয়ে গটমট করে বুটের শব্দ তুলে ন'গিন্নীর ঘরের সামনে এলেন। তিনি তখনও তেমনি সব ছড়িয়ে ব'সে ঠাকুরসেবা করছিলেন। দারোগা আসতেই 'হাঁ হাঁ' ক'রে উঠলেন। 'জুতোটা খুলে ঢুকুন, রাস্তার জুতো চামড়ার জুতো—দেখছেন না—ঘরে ঠাকুর রয়েছেন?'

দারোগাবাবু থমকে থেমে গেলেন, কনস্টেবলরাও তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে গেল। কে এখন বুটজুতো খুলছে? দারোগাবাবু বাইরে থেকে কপাটের দু'দিক ধরে দেহটা ঝুঁকিয়ে ঘরের ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করলেন। খাট আলমারী টেবিল ছাড়া বিশেষ কিছু নেই; তবু একবার ঢুকে দেখা উচিত ছিল কিন্তু জুতো খোলা? না:, —দরকার নেই। ন'গিন্নী এই সময় 'জয়-গুরু' ব'লে একটা বিশেষ ভঙ্গীতে মাথার উপর দু'হাত তুললেন, অমনি দারোগাবাবুর মুখ থেকেও 'জয় গুরু' কথাটা যেন আপনা থেকে বেরিয়ে এল এবং হাত দুটোও সেই কায়দায় মাথায় উঠল। তাই দেখে ন'গিন্নী এক মুহূর্ত অবাক্ হয়ে চেয়ে থেকে বলে উঠলেন, 'অ্যাঃ, আপনি গুরু ভাই? আসুন, আসুন, জুতো খুলে বসুন ভাল ক'রে। আজ গুরুবার, বেস্পতিবার, বিশেষ করে গুরু পুজো করতে হয়।'

দারোগাবাবু এবার সোজা পিছন ফিরে পালালেন; ডিউটির সময় এখন ও সব করা যাবে না, ব'লতে ব'লতে তিনতলার সিঁড়ির খানিকটা উঠলেন তিন জনে গটগট করে, কিন্তু ভিজে গামছায় উপর কোনমতে কাপড় জড়িয়ে যে দশাসই মূর্তি তিন তলায় ঢোকার দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁকে দেখেই এবং তাঁর ঝেড়ে কাপড় পরানোর প্রতিশ্রুতি স্মরণ ক'রে ভদ্রলোক বেজায় দমে গেলেন। বেচারা নতুন দারোগার পদে ঢুকছেন বেশিদিন নয়; কিন্তু ডিউটি যখন, তখন সার্চ তাঁকে করতেই হবে। তিনি চোখকান বুজে উঠতে লাগলেন; দু'ধাপ উঠতেই ছলাৎ করে খানিকটা জল তাঁর মাথায় প'ড়ল তারপর ছিটে ছিটে কোট প্যান্ট জুতো মোজা সবের ওপর পড়তে লাগল। ...'দাঁড়াও বাছা। গঙ্গাজল নিয়ে তবে ঢোকো। ছত্রিশ জাত ঘেঁটে আমার জিনিষপত্তরে হাত দেবে,—তা হবে না।'

সেজগিন্নীর জল ছিটানোর চোটে দারোগাবাবুর জামা জুতো গেল ভিজে। 'কি মুশ্‌কিল! করেন কি, করেন কি? আর জল দেবেন না, আমরা আপনার সব কিছু ছোঁব না।' ব'লতে ব'লতে কোন মতে তিনতলার ঘর ক'টা ঘুরলেন তিনি, একবার ওপরে-ওপরে চোখ বুলিয়ে দায় সারলেন, পালাতে পারলে বাঁচেন। সঙ্গের কনস্টেবলরা বুড়িমায়েদের প্রতি খুশিই হয়েছিলেন নিশ্চয়—তাদের পরিশ্রম কমিয়ে দেওয়ার জন্য।

বাবুনের চিঠি ও খেলনা মোটরগাড়ি

বিশ্বরূপ মণ্ডল

কাল বিকালে গণেশদাদার পেলাম চিঠিখানা
ইঁদুর নেবে পুজোয় ছুটি, মানবে না সে মানা,
নাতি পুতির যত্ন পেতে যাবে মুলুক পানে,
ছাখো না মা গণেশদাদা লিখেছে এইখানে।

আজ সকালে কার্তিকেয়র পেলাম টেলিগ্রাম
ভায়ার মনে ভাবনা বড়, কপাল ভরা ঘাম,
বর্ষা শেষে ময়ুরদাদু যাবেন বেয়াই বাড়ি
এখন থেকেই পেশ করেছেন আর্জিখানা তারি।

দুর্গাপুরের বাবুন লিখি দাদাভায়ার কাছে
ইঁদুর-ময়ুর ছুটি নেবেন, ভাবনা কি তার আছে?
বাবা দিলেন কিনে আমায় খেলনা মোটর গাড়ি
তাতেই চড়ে চলে এসো পুজোয় মোদের বাড়ি।

লাঞ্জিবর্ণার সেই ভালুক

গঙ্গেশ বিশ্বাস

লাঞ্জিবর্ণা (Lanjibarna) নামটা যেমন বিদ্‌ঘুটে! এই নামের জায়গাটার চেহারাও তেমনি অদ্ভুত। মাইলের পর মাইল লালচে পাথুরে মাঠ; মাঝে-মাঝে মহুয়া-গাছ, আর পাহাড়ে-টিলা। বেশির ভাগ টিলাই ন্যাড়া; এখানে-সেখানে দু'একটার মাথায় এক-মানুষ দেড়-মানুষ সমান ঘাস। মাঠের মধ্যে জলাশয় বলতে ছিল না কিছুই। মাঠের বাইরে তিন-চার মাইল দূর দিয়ে বয়ে গিয়েছে শঙ্খনদী। মাঠের কোন ফাঁক-ফোকর দিয়ে নিচের দিকে বৃষ্টির জল ঢুকে পড়লে, মাটি খুঁড়ে ভাল জল পাওয়া যেত কোথাও-কোথাও। গোটা অঞ্চলটা ছিল শক্ত চুনাপাথরে ভর্তি।

উড়িষ্যার রাজগাংপুর রেল-স্টেশনের কাছে যে বিখ্যাত সিমেন্ট-কারখানা আছে, তার কাঁচামাল, অর্থাৎ লাইমস্টোন আসে লাঞ্জিবর্ণার ওপেনকাস্ট খনি থেকে। খোলা পুকুরের ধরনের খাদ, পায়ে হেঁটেই সরাসরি নেমে যেতে পারা যায় দেড়'শ দু'শ ফুট খনির গভীরে। একটা রেল-লাইনও নেমে গেছে খনির মধ্যে। খনি যত ছড়াচ্ছে, খনির ভেতরের লাইনের শাখা-প্রশাখাও তত বাড়ছে। খনি থেকে কারখানায় কাঁচামাল বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে পনের মাইলে লম্বা একটা ন্যারো-গেজের রেল-লাইন পাতা ছিল সেখানে। একটা মান্ধাতার আমলের এঞ্জিন সেই লাইনে চালাত কতক-গুলো খেলার গাড়ীর মতো মাল-বওয়া ট্রলি।

চুনাপাথর ভীষণ শক্ত। ডিনামাইট দিয়ে ফাটিয়ে নিতে হয় খনির এক-একটা অংশ। ভারী-ভারী পাথরের চাঁই ভেঙে পড়লে, দশ-বার পাউণ্ড ওজনের বড়-বড় হাতুড়ী দিয়ে সেগুলি আবার ভেঙে আট-দশ সেরের মতো এক-একটা ছোট টুকরো তৈরী করে হ্যামারম্যানরা। পাথর ভাঙা, মাল-বওয়া প্রভৃতি কাজের জন্যে থাকে সাত জনের এক-একটা দল। দলে থাকে তিনজন রেজা, দু'জন হ্যামারম্যান, আর দু'জন হোলার। মেয়ে-কুলিদের ওখানে রেজা বলে। হোলারদের কাজ হল বেশি-বড় পাথরের চাঁইয়ের মধ্যে লোহার শাবলের মতো একটা যন্ত্র চালিয়ে আট-দশ ইঞ্চি গর্ত করা, যাতে তার মধ্যে আবার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পাথরের সাইজ দরকার মতো ছোট করা যায়।

কুলি-কামিনদের বস্তি ছিল খনি-এলাকা থেকে তিন-চার মাইল দূরে-দূরে। এক-একটা বস্তিতে লোক বাস করত পনর-কুড়ি ঘর। সকলেই আদিবাসী। দু'জাতের লোক তারা কিষাণ আর সাত্রি। খনি-এলাকার মধ্যে ছিল বাবুদের ক্যাম্প। ক্যাম্পে যারা বাস করত, তাদের মধ্যে ছিল মাইনসম্যানেজার, মাইনিং সুপারভাইজার, ফোরম্যান, ব্লাস্টার, টাইম-কিপার প্রভৃতি পদের লোক।

ক্যাম্প থেকে আট-দশ মাইল পশ্চিমে ছিল মহাবীর পাহাড় নামে একটা পাহাড়ে বন। শাল, বেল, বাঁশ, আমলকি আর নানারকম ঝোপঝাড়ে ভর্তি ছিল বনটা জঙ্গলে চিতা, হরিণ, ভালুক, বনমোরগ, আর তিতির

ছিল অঢেল। একটু সুযোগ পেলেই ক্যাম্পের মাইনিং-সুপারভাইজার, দেবব্রত, বন্ধুবান্ধব নিয়ে শিকার করতে চলে যেত মহাবীর পাহাড়ে।

ক্যাম্পে বন্দুক ছিল একমাত্র তারই। একটা বার-বোরের দোনলা জার্মান জেকো হ্যামারলেস—সুইচ টিপে একটু ঠেলে দিয়ে আলগা করতে হয় তার লক। দেবু বড় লোকের ছেলে। শিকারের নেশায় একটা জিপই কিনে ফেলেছিল সে। তার ইচ্ছে সে জিপে করেই ঘুরে দেখবে দেশের সব বন-জঙ্গল। জিপ নিয়ে মহাবীর পাহাড় থেকে মেরে আনত জংলী-মুরগি, তিতির, হরিণ, এইসব।

জঙ্গলের এখানে-সেখানে দেখা যেত বিরাট-বিরাট উই-ঢিবি। এক একটা সাত-আট ফুট উঁচু। উই ভালুকের বড় প্রিয়—খাদ্য! বনের কোথাও উই-ঢিবি নজরে পড়লেই ধারাল নখের থাবড়া মেরে, নয়ত মুখ থেকে জোরে বাতাস বের করে ঢিবি ভেঙে টপাটপ খেতে থাকে উইপোকা। ভালুক ইলেকট্রিক হোয়ারের মত মুখ থেকে ভীষণ জোরে ফুঁ দিতে পারে।

চৈত্র বৈশাখ মাসে মহুয়া-ফুল ফুটতে সুরু করলে সেদিকের ভালুকরা পেয়ে যায় ভারী মজা। মহুয়ার ফুলও ভালুকদের খুব প্রিয়। সমস্ত রাত ধরে পড়তে থাকে ফুল। সকালের দিকে দেখা যায় কতকটা পাকা গোলাপজামের রঙের অজস্র ফুলে গাছের তলাটা ছেয়ে গিয়েছে। ফুলের নিচের দিকটা খেতে বেশ মিষ্টি আর সুন্দর একটা মিষ্টি গন্ধও আছে তার। শুকিয়ে নিলে একটা বড় কিশমিশের ধরনের হয় ফুলের তলার দিকটা। সমস্তটা বসন্তকাল, আর গ্রীষ্মের কিছুদিন মহুয়া ফুলের মন-মাতান গন্ধে ভরে থাকে সেদিকের আকাশ-বাতাস।

মহুয়া ফুল খেতে-খেতে সময়-সময় মহাবীর পাহাড় থেকে গোদা-গোদা মন্থর-ভালুক চলে আসত লাজিবর্ণার বস্তি-এলাকার মধ্যে। এমন উটকো ভালুক বাগে পেলে আক্রমণ করে বসত কোন বস্তিঅলার নাকে-মুখে চোখে; যা বিষাক্ত হলে মানুষ মারাও যেত তার ফলে। তাই ভালুক সম্বন্ধে বিশেষভাবে সতর্ক থাকত সেদিকের আদিবাসীরা! ওরা ভালুকের লোম দিয়ে তৈরী করে মাদুলী—ওদের বিশ্বাস, ভালুকের জ্বর, অর্থাৎ কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসার ব্যারাম ভাল হয়ে যায় এই মাদুলী পরলে। ভালুকের মাংস নাকি তারা খায়ও।

তীর-ধনুকে ভালুক শিকার করা কঠিন। সামনা-সামনি এগিয়ে গিয়ে বল্লম দিয়ে গেঁথে ভালুক মারাও সহজ নয়। ওদের ভালুক শিকারের কায়দাটা ভারী মজার। মহুয়া ফুল ফোটা আরম্ভ হলেই রাতের দিকে বস্তি এলাকায় চলতে থাকে ভালুকদের আনাগোনা। বস্তির আশ-পাশে মহুয়া গাছের ভিড় একটু বেশি। অনেক সময় গাছে উঠে ডাল ভেঙে মহুয়া ফুল খায় ভালুক। বস্তিঅলারা মহুয়া-গাছের ওপরে ক্যানেস্তারা-টিন বেঁধে রাখে; টিনটা একটা লম্বা দড়ি দিয়ে বেঁধে দড়িটা টেনে নিয়ে যায় দূরে। গাছের তলায় পুঁতে রাখে কতকগুলো ছুঁচাল বাঁশের খুঁটি। ভালুক খুঁটির ভেতর দিয়ে এঁকে-বেঁকে অনায়াসে গাছে উঠে পড়ে। আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারে না মোটেও; গাছের ডাল ভেঙে মহুয়া ফুল খেতে থাকলে পাহারার লোকগুলো বুঝতে পারে গাছে ভালুক এসেছে। তখনই লোকেরা দড়ি টেনে-টেনে গাছের ওপরে ঢন-ঢন শব্দ করতে থাকে, আর নিচেও মশাল জেলে টিন পিটিয়ে হৈ-হৈ করতে করতে এগিয়ে যেতে থাকে গাছের দিকে। ভয়ে পড়ি-মরি করে অন্ধকারের মধ্যে গাছ থেকে লাফ দিয়ে পালাতে চেষ্টা করলে ভারী শরীর নিয়ে ভালুক-মশাই গেঁথে যান খুঁটির ডগায়। সেই অবস্থায় লাঠি-সোঁটা চালিয়ে লোকেরা তাকে সাহায্য করে তাড়াতাড়ি যমের-বাড়ি যেতে। ভালুকের মাংসে তখন ভোজ লাগায় বস্তিসুদ্ধ লোক।

রোজ সকালেও দিকে খাবার-দাবার বেঁধে নিয়ে রেঞ্জাকুলি চলে আসত খনিতে; পাকা আট ঘণ্টা খাটুনি খেটে সন্ধ্যার দিকে ফিরে যেত গাঁয়ে। একবার বোশেখ মাসে প্রচুর মহুয়া-ফুল ফুটল লাজিবর্ণার গাছে গাছে। ফুলের গন্ধে ভরে গেল সেদিকের আকাশ-বাতাস। কেমন যেন নেশা ধরে যায় সে গন্ধে, ঘুমিয়ে পড়তে

ইচ্ছে হয় মহুয়া-গাছের ছায়ায়। আর-সব দিনের মতই সেদিনও কিষাণ আর সাত্রি আদিবাসীরা দল বেঁধে ভোর-ভোর বেরিয়ে পড়েছিল খনিতে আসবে বলে। একটা দল থেকে আর একটা দল বিশ-ত্রিশ গজ আগে-পিছে।

খনি-এলাকার মধ্যে পা দেবার মাইল খানেক আগে তাদের যেতে হত কয়েকটা টিলার ধার দিয়ে। গ্রাম থেকে মাইল-দেড়েক চলে আসার পর সাত্রিদের একটা দল দেখতে পেল প্রায় পঞ্চাশ-গজ দূরে বিরাট একটা কালো কম্বলের স্তূপ যেন নড়াচড়া করছে কয়েকটা মহুয়া গাছের ভেতরে। তাদের বুঝতে দেরি হয় না যে সেটা কি।

পাছে জানোয়ারটা কোন বস্তিতে গিয়ে রাত-বিরেতে হাঙ্গামা বাধায়, সেই ভয়ে লোকগুলো চেয়েছিল সেটাকে সেই তল্লাট থেকে দূরে হটিয়ে দিতে। ভালুক-টাকে দেখতে পেয়েই লোকগুলো হৈ-হৈ করতে করতে তাড়া করল সেটাকে। বিপদ বুঝে জন্তুটা একটা চাপা গর্জন করতে-করতে চার পায়ে ফদাকার ভঙ্গিতে ছুটতে লাগল কোণাকুণি দূরের দিকে। ইতিমধ্যে আদি-বাসীদের আরো অনেকে জড়ো হয়েছে সেখানে। দূর থেকে সকলে এবার তাড়া করে যেতে লাগল ভালুকটার পিছে-পিছে।

জানোয়ারটা এমনি চালাক যে, ছুটতে-ছুটতেই লক্ষ্য করেছিল তার আশপাশের কোন টিলাটা ন্যাড়া, আর কোনটার মাথায় ঘাস-জঙ্গল আছে। দু'শ গজের মতো ছুটে, ডাইনে-বাঁয়ে কয়েকটা ন্যাড়া টিলার পাশ কাটিয়ে চটপট একটা ঘাসঅলা টিলার মাথায় উঠে গা ঢাকা দিল জন্তুটা। লোকগুলোর তখন আর করার থাকল না কিছুই, কেবল টিলার চারদিকে ঘুরে-ঘুরে দেখতে চেষ্টা করছিল ভালুকটাকে কোন দিক থেকে দেখা যায় কি-না।

ভালুক-পুঙ্গব বোধহয় তখন ধুঁকতে-ধুঁকতে ভাবছিল, দিনটা সেখানে কোন-রকমে কাটিয়ে রাতারাতি সরে পড়বে দূরে কোথাও। করতও তাই, কিন্তু গোল বাধাল আদিবাসী লোকগুলো। তাদের কয়েকজন খনির ক্যাম্পে ছুটে গিয়ে দেবুকে খবর দিল, 'ভালু আয়া থেরে।' দেবব্রত, ওরফে দেবু, আগে থেকেই সকলকে বলে রেখেছিল, কোথাও জন্তু-জানোয়ার হানা দিলে তাকে যেন খবর দেয় তারা।

দেবু ভালুকটার খবর পেয়ে তার বন্দুক, কয়েকটা অ্যাল্‌ফামেক্স এল-জি কার্তুজ, আর রেমিংটন-এক্সপ্রেস বুলেট সঙ্গে নিয়ে সাইকেলে চেপে ছুটল সেই ঘাসঅলা টিলার দিকে। তেলেঙ্গা নামে কিষাণদের এক আদি-বাসী কাজ করত দেবুর কাছে। সেও সাইকেলের কেরিয়ারে চেপে দেবুর সঙ্গ নিল ভালুক মারা দেখবে বলে। আধ-ঘণ্টার মধ্যে টিলাটার কাছে পৌঁছে দেবু দেখল সেখানে ষাট-সত্তর জন আদিবাসী জটলা করছে। সাইকেল থেকে নেমে তাদের সুধাল,

'ভালু কুথা রে?'

লোকগুলোর মধ্য থেকে কয়েকজন এক সঙ্গে বলে উঠল, 'হোথা টিলার মাথায় ঘাসের ভিতরকে লুকাই রইছেন। মোরা হেরেছি বাবু'।—লোকগুলো দু-তিন রকম ভাষায় কথা বলে। কোথায় ভালুকটা ছিল, কি-ভাবে টিলার মাথায় উঠল সেটা, সব কথা দেবুকে বুঝিয়ে দিল তারা। দেবু ওদের উদ্দেশ্যে বলল, 'তোরা পনর কুড়ি মরদ আমার সাথ উপরকে যাবি চল। তোরা টিলার ওপরে উঠে এক ধারে দাঁড়িয়ে তাড়া দিতে থাকবি, আমি আর এক দিকে দাঁড়িয়ে গুলি চালাব জানোয়ারটা দেখতে পেলেই।'

কিন্তু অনেক অনুরোধ উপরোধেও কেউ-ই ওপরে যেতে রাজী হল না, এমন কি দেবুর তেলেঙ্গা পর্যন্ত না। তখন দেবু তার বন্দুকে দুটো এল-জি পুরে নিয়ে একলাই উঠতে লাগল ওপরে। টিলাটা উঁচু ছিল একশ ফুটের মত; ঘাসে ভর্তি মাথাটা ছিল আধখানা বড় ফুটবল মাঠের সাইজের। ওপরে ওঠার সময় দেবু ওদের বলে গেল, সে হাত তুললেই যেন তারা পাথর ছুঁড়তে থাকে টিলার মাথায়।

ভালুকটা ওপরে উঠেছিল টিলার গা দিয়ে একটু তেড়চা ভাবে, খাড়া উঠতে পারে নি ভারি শরীর নিয়ে।

টিলার অর্ধেকের কিছুটা বেশি উঁচু পর্যন্ত দেবুও উঠল কতকটা সেইভাবে। একটা সুবিধা মতো জায়গায় দাঁড়িয়ে বাঁ-হাত তুলে ইঙ্গিত করল ঢিল ছুঁড়তে। দশ-পনেরটা ঢিল পড়লেও কিন্তু ভালুকটার কোন সাড়া মিলল না। টিলার ওপর আরো কিছু পাথর বৃষ্টি হতে এক সময় দেখা গেল ওপরের এক-জায়গার ঘাস নড়ে উঠল, আর ঢেউয়ের মতো ঘাসের সেই আন্দোলন ক্রমশঃ এগিয়ে যেতে লাগল টিলার এক ধারের দিকে।

ঢেউয়ের গতিপথের এক পাশে এবার হাঁটু গেড়ে বসল দেবু। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দেবু দেখতে পেল একটা মস্ত বড় কালো লোমে ভর্তি মাথা বেরিয়ে আসছে ঘাসের বাইরে। কিন্তু দেবু তার হ্যামারলেস বন্দুকের সুইচ ঠেলে গুলি করার জন্য সেটাকে রেডি করতে গিয়ে খুট করে একটা শব্দ করে ফেলল আর তাতেই ভালুকটা ঝট করে তার মাথাটা টেনে নিল জঙ্গলের ভেতরে।

ভালুকের চোখ আর কান প্রায় বাঘের মতই তীক্ষ্ণ। বন্দুকের নলটা আরো আগে আলগা করে রাখা উচিত ছিল ভেবে মনে-মনে আপসোস, করতে লাগল দেবু। বেলা তখন সাড়ে আটটা কি ন'টা। এরই মধ্যে আগুনের হলকার মত গরম বাতাস সাঁ-সাঁ শব্দে বইতে সুরু করেছে মাঠের ওপর দিয়ে। রোদের তাতে নিচের দিকের বাতাস তখন বেতপাতার মত কাঁপছে এক নাগাড়ে। দেবুর মাথায় ছিল একটা সোলার হ্যাট, পরনে খাকি প্যাণ্ট, আর গায়ে শুধু একটা হাতাকাটা গেঞ্জি। শুকনো আবহাওয়া বলে রোদের তাত থাকলেও, তখনো একেবারে অসহ্য হয়ে ওঠেনি।

ঘাস-জঙ্গলের ওপর আর কয়েকটা ঢিল পড়ল, কিন্তু জানোয়ারটা আর বাইরে বেরোলই না। ভালুকটা বেশ খেলোয়াড় বুঝতে পেরে একটা মতলব এঁটে নিচে নেমে এল দেবু। জন্তু জানোয়ার শিকার করতে গিয়ে শিকারীরা যে কখন কি করে বসে অনেক সময় আগে থেকে তা বোঝার উপায় থাকে না। সে লক্ষ্য করেছিল আদিবাসীদের কারো-কারো কাঁধে তীর-ধনুক আছে। নিচে নেমে দেবু প্যাণ্টের পকেটের রুমালটা একজনের তীরের ফলার সঙ্গে চটপট জড়িয়ে বেঁধে ফেলল; তারপর তার সিগারেট-লাইটারের সবটা পেট্রল তাতে ঢেলে দিয়ে ভিজিয়ে নিল সেটা। ধনুকঅলা এই—লোকটাকে অনেক বলে-কয়ে নিয়ে গেল টিলার অর্ধেকটা ওপরে। তাকে বলে দিল, দেবু হাত তুললেই সে যেন দেশলাই জ্বেলে পেট্রল-ভেজা রুমালে আগুন দিয়ে সেটা ধনুক থেকে ছুঁড়ে দেয় টিলার ঘাসের মধ্যে; ব্যবস্থা হল সেই ইঙ্গিতেই আবার আগের মত ঢিল ছুঁড়তে থাকবে নিচের লোকেরাও।

সব ঠিকঠাক করে দেবু গিয়ে দাঁড়াল প্রথম বারের জায়গা থেকে একটু নিচুতে। দেবু জায়গামতো দাঁড়িয়ে ইঙ্গিত করতেই ধনুকঅলা লোকটা তীরে বাঁধা রুমালে আগুন লাগিয়ে সেটা ধনুক থেকে ছুঁড়ে দিল টিলার ওপরে। কিন্তু সেটা কোথায় পড়ল তা লক্ষ্য না করেই পালিয়ে গেল নিচে।

সঙ্গে সঙ্গে ঢিলও পড়তে লাগল ঘাসের ওপর। দেবু এর মধ্যে বন্দুকের লকটা আলগা করে নিল; তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগল জানোয়ারটা কি করে। ঘাসের ভেতরে পড়ে গিয়েও জ্বলতেই থাকল রুমালটা, সেই সঙ্গে জ্বলতে লাগল ঘাস-জঙ্গলের আরো কিছু কাঁচা-পাকা ঘাস। ভালুক আগুনকে ভীষণ ভয় পায়। ঘাস-জঙ্গল ঘন হলেও, তার ভীষণ বিপদ বুঝতে পেরে জন্তুটা এবার একটা ঘর-ঘর শব্দে গর্জাতে-গর্জাতে ঘাস-জঙ্গল থেকে রুখে বেরিয়ে এল দেবুর দিকেই। এক মুহূর্তের জন্য আঁতকে উঠল দেবু, কিন্তু কঠিন নার্ভের লোক সে। এবার সে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। ভালুকটা দেখার পরের-মুহূর্তেই চট করে খানিকটা সরে গিয়ে তার মুখ লক্ষ্য করে কষে দিল একটা গুলি। ভয়ঙ্কর একটা চিৎকার ছেড়ে ভালুকটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল টিলার গায়ে, ঘাস-জঙ্গলের তিন-চার হাতের মধ্যে। কিন্তু পড়ে গিয়েও সেটা নড়াচড়া করছে দেখে আর একটা গুলি চালিয়ে দিল আবার তার নাক-মুখ লক্ষ্য করেই। দুটো এল-জি'র আঠারটা সীসের বলের ঘা জানোয়ারটার নাক, মুখ, কপালের সব কিছু দিল গুঁড়িয়ে,

বন্ধ হল তার নড়াচড়া।

জন্তুটা নিকেশ হতে দেবু নিচের লোকদের ইশারা করল ওপরে উঠে আসতে। এবার লোক গুলো মহা উৎসাহে ছুটে এল ওপরে। ভালুকটা টিলার ওপরে থাকতে-থাকতেই সুরু হয়ে গেল তার লোম ছেঁড়া। দু'জন জোয়ান কুলি ভালুকটাকে একটা বাঁশে বেঁধে বয়ে নিয়ে এল ক্যাম্পে। ক্যাম্পে পৌঁছে দেখা গেল ভালুকটার গায়ে লোম বলতে আর নেই কিছুই। নাকের ডগা থেকে ছোট্ট ল্যাজের ডগা পর্যন্ত সেটা ছিল পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি। ভালুকের চামড়াটা তার আর কোন কাজেই লাগবে না দেখে দেবু ভালুকের গোটা শরীরটাই দিল আদিবাসীদের হাতে, তাদের সেবার জন্য। বদলে তারা দুগণ্ডা মুরগি উপহার দিল ক্যাম্পের বাবুদের।, সভ্য সমাজের অনেক মানুষের থেকে ভদ্র বলতে হবে আদিবাসীরা।

সাজার মজা

সুনির্মল বসু

কাবুলী বিড়াল ছিল আমাদের বাড়িতে
চুপে চুপে মুখ দিল মাংসের হাঁড়িতে
তাই দেখে তেড়ে গেল আমাদের পাচকে
হাতা ছুঁড়ে মারে তারে লাগে তার বাঁ চোখে
মেউ মেউ কাঁদে আর ছটফট করে সে
ভোঁদা ছিল চটপট আঁকড়িয়ে ধরে সে,
মাংস খেয়েছে পুষী আরো চাই সাজারে
পটকিয়ে ফ্যাল ওরে উঠানের মাঝারে
কান ধরে পটাপট চড় লাগা দু-হাতে
থোঁতা মুখ ভোঁতা হবে সাজা হবে উহাতে,
হাবুল এসে বলে বগলটা বাজায়ে
দাঁড়া দাঁড়া দেব ওরে সং আজ সাজায়ে
আলকাতরার ভাঁড় রাখা আছে ভাঁড়ারে
গায়ে দিয়ে সাজা দেব ও লক্ষ্মীছাড়ারে
চটচটে কালো রং গায়ে তার ফিরালে
বুঝবে তখন ঠ্যালা লটখটে বিড়ালে
এই ভেবে দুইজনে সেই দিন জাঁকিয়ে
আলকাতরার কালি ঠেসে গায়ে মাখিয়ে
ছেড়ে দিল হাবু ভোঁদা আহ্লাদ না ধরে
ছুটে পুষী উঠে বসে পাচকের চাদরে
তাড়া খেয়ে ছুটে যায় এধারে ও ওধারে
লাগাম না পায় তার হাবুল ও ভোঁদারে
কালি মেখে গায়ে পুষী, ঘোরে সারা বাড়িটা
ঠাকুমার নামাবলী পিসিমার শাড়ীটা
দিদির সেমিজ আর বৌদির তোয়ালে
আলকাতরার রঙে সবই বুঝি খোয়ালে
দাদার নতুন সাদা সোয়েটার, লপেটা
গরদের পাঞ্জাবী কিনেছে যা ন জ্যেঠা
দাদুর ফতুয়া জামা বিছানা ও তাকিয়া
বিদঘুটে হলো সব কালো কালি মাখিয়া
খিড়কী দুয়ার দিয়ে এসেছিল ধোপা সে
মাথায় কাপড় দিয়ে দাঁড়ায়েছে ও পাশে,
হঠাৎ বিড়াল এসে মাথে তার পড়ে যে
আলকাতরায় সব মাখামাখি করে যে
হৈ-হৈ চৈ চৈ লাগে সারা বাড়িতে
খড়ম ছুঁড়িল কাকা পুষীটারে মারিতে
খড়ম লাগিয়া ভাঙ্গে আয়নাটা দেয়ালে
মিউ মিউ ডাকে পুষী আপনার খেয়ালে,
লাঠি নিয়ে ছুটে হায় ভোঁদা আর হাবুলই
বাড়ী ছেড়ে চম্পট দিল পুষী কাবুলী

টুলটুল, ফুলফুল আর বুলবুল

নবনীতা দেব সেন

গল্প বলনা, মা, একটা গল্প বল? ভালো গল্প!

—আগে চোখ বন্ধ কর, বলছি। এক বনে দুই ভাইবোন ছিল। একজনের নাম টুলটুল, আরেকজনের নাম ফুলফুল।

—দুই ভাইবোন বনে থাকে কেন মা? ওদের বাড়ি নেই?

—বাড়িটাই তো বনের মধ্যে! মস্ত বড়ো বাড়ি। কিন্তু বাড়িতে জনপ্রাণী নেই। কত খাট পালঙ্ক। তাতে বিছানা নেই। কত দোর জানলা পর্দা টাঙানো নেই, ভারী ভারী কত সিন্দুক, তাদের তালার চাবি নেই।

—চাবি কী হলো মা?

—সেই তো মজা। চাবি হারিয়ে গেছে।

—আর বিছানা? পর্দা? সব ছিঁড়ে গেছে বুঝি?

—স-ব ছিঁড়ে গেছে।

—ভাইবোন একলা একলা থাকে? বাড়িতে কে-উ নেই?—টিকটিকি?—চড়াইপাখিও নেই? কে-উ না?

—মাকড়সা?—পিঁপড়ে?

—উঁহু—চড়াইপাখিও নেই, টিকটিকিও নেই, মাকড়সাও নেই, পিঁপড়েও না। কিন্তু একটা বিরাট পাহারাদার কুকুর আছে। মোটাসোটা কালো চকচকে ভেলভেটের মতন তার গায়ের লোম। কেবল মাথার ওপরটা সোনালি ছোপ ছোপ—আর খুব তেজী। আর আছে একটা পুষি বেড়াল নরম তুলতুলে, শাদা ধবধবে, গোলগাল, আর খুবই আহ্লাদী। মোটা লেজটি কমলা রঙের। টুলটুল যেখানে যায় পেছু পেছু কুকুরটা ঘোরে, আর ফুলফুল যেখানে যায় পেছু পেছু ঘোরে মিনিবেড়াল।

—ওদের নাম নেই?

—হ্যাঁ—কৃষ্ণচন্দ্র, আর কমলিকা।

—কুকুরের নাম কৃষ্ণচন্দ্র, আর পুষির নামটা কমলিকা না মা, ওদের আর কী ছিল, পাখি ছিল? টিয়া? চিনিয়া-মুনিয়া?

—নাঃ। পাখি ছিল না। পাখির খাঁচাটা খালি ছিল।

—লালমাছ ছিল না?

—নাঃ; শ্বেতপাথরের চৌবাচ্চা শূন্য পড়ে ছিল। লালমাছ ছিল না।

—ওদের গরু ছিল না, মা?

—গোয়াল ছিল, গরু ছিল না—তক্‌তকে নিকোন শূন্য গোয়াল।

—কিন্তু ভাই বোনেরা তো ছোটো ছেলে মেয়ে, ওরা দুধ খেত না?

—তা খেত। গরুর নয়. ওরা খেত বাঘের দুধ। বনটাই যে ছিল বাঘের বন। এক বাঘিনী মাসি রোজ এসে ওদের চারজনকেই দুধ খাইয়ে যেতো আদর করে। সেই দুধটুকু খেয়েই ওরা বেঁচে-বর্তে বড় হয়ে উঠছিল।

—বাঘের দুধ, বলে কথা! খুব গায়ে জোর ছিল নিশ্চয়ই ভাই বোন দুজনেরই?

—হ্যাঁ, তা ছিল।

—টারজানের মতন? না, রাজার মতন?

—ওই হলো। একই রকম। তবে অরণ্যদেবের মতন অতটা নয়। ওরা তো ছোটো?

—বাঘেরা ওদের কেন খেয়ে ফেলতনা মা?

—বাঃ, ওদের বুকে যে বজ্রমাণিকের মালা দুলছে, বজ্রমাণিকের মালা যার গলায় থাকে জগতে কেউ তার কোনো ক্ষতি করতে পারে না।

—তাকে বাঘে খায় না?

—তাকে বাঘে খায় না, হাতীতে পিষে ফেলেনা, বাইসনে গুঁতিয়ে দেয় না, সাপে কামড়ায় না, ঈগলে ছোঁ মারে না।

—তাদের মশায় কামড়ায় না? বোল্‌তা? মৌমাছি? কাঠ পিঁপড়ে?

—তা অবিশ্যি কামড়াতে পারে। ছোটোখাটো লোক সান আটকায় না। কেবল বড় বড় লোকসান আটকায়। যেমন, ওরা জলে ডোবেনা, আগুনে পোড়ে না, ওদের মাথায় বাজ পড়ে না, ওদের—

—ওরা গাছে চড়তে পারে?

—তা পারবেনা? বনের মধ্যে বাস তাদের। গাছই তাদের সঙ্গী।

—গাছ থেকে পড়ে গেলে হাত পা ভাঙবে না?

—নাঃ। ছড়ে-টড়ে যেতে পারে অবশ্য।

—মা, আমাকে একটা বজ্রমাণিকের মালা এনে দেবে?

—পারলে কি আর দিতুম না ধন? কিন্তু সে-মালা কেবল বিধাতার কাছে থাকে। জন্মের সময়েই কারুর গলায় তিনি পরিয়ে দেন। ভগবানের আশীর্বাদ।

—মা, ভগবান আমাদের কেন আশীর্বাদ করেন নি?

—ছি, ছি, বাবা, ওকথা বলতে নেই। কে বললে ভগবান আশীর্বাদ করেন নি? না করলে কি এমন করে মায়ের কোলে শুয়ে গল্প শুনতে পারে কেউ?

—তা বটে। ঠিক কথা।

—তবে? বজ্রমাণিক নাই বা হোলো, তোমাদের বুকে অন্য একটা তাবিজ আছে, সেটাও খুব শক্তিমান।

—কী মা? কী তাবিজ? কৈ, দেখিনি তো একদিনও?

—দেখা যায় না যে বাবা, অদৃশ্য তাবিজ। আর নামটা মুখে উচ্চারণ করলেই তার সব ম্যাজিক নষ্ট হয়ে যায়—

—থাক, থাক, বলতে হবেনা। অদৃশ্য তাবিজটা কে দিয়েছিল আমাকে মা? তুমি দিয়েছ?

—ভগবানই দিয়েছেন বাবা। তাঁর আশীর্বাদ, কিন্তু তুমি এত প্রশ্ন করলে আমি আর গল্প বলব না।

—স্যরি মা স্যরি। বল, গলাটা বল। আচ্ছা, ফুলফুল নিশ্চয়ই বোনের নাম? টুলটুল হচ্ছে ভাই? না? কে বড়, কে ছোট, মা?

—ঠিক তাই। ওরা কেউ বড়-ছোটো নয়, যমজ।

—মা, ওদের বাবা-মা কৈ?

—সেই তো মজা। ওদের মনেও ঐ একই প্রশ্ন। একদিন ফুলফুল টুলটুল দু'জনে মিলে ঠিক করলে।

—চলো, আমরা বরং বনদেবতাকে জিজ্ঞেস করি, আমাদের কি মা-বাবা নেই?

—বনদেবতা কোথায় থাকতেন? মন্দিরে?

—বনের লতায়-পাতায় ঘাসে। প্রশ্ন-শুনে বনদেবতা ঝোড়ো বাতাসের শন শন শব্দে জবাব দিলেন "হ্যাঁ! তোমাদের বাবা-মা আছেন; তোমাদের বাবা-মা আছেন!"

—'কোথায়? কোথায়?'

—'কাছাকাছিই! কাছাকাছিই!' এই টুকুনি বলেই বনদেবতা চুপ করে গেলেন। আর উত্তর নেই ঝড় থেমে গেল। বন নিস্তব্ধ।

—তা হোক, তবু তো কিছুটা জানা গেল?

তা গেল। তাতেই খুশি হয়ে আনন্দে নাচতে নাচতে দুই ভাইবোনে নদীতে নাইতে গেল। গিয়ে দেখে নদীর স্রোতে চমৎকার একটা চন্দন কাঠের নৌকা ভেসে যাচ্ছে। আহা কী তার সুরভী, আর কি চমৎকার কারুকার্য তাতে! হাতীর দাঁতে, রুবিপান্নায়, সোনারুপোয় মিলিয়ে। দেখে দেখে চোখ ফেরেনা। ওরা সাঁতরে গিয়ে নৌকোটাকে ধরলো।

—জলে কুমীর নেই!

—নাঃ। থাকলেও ওদের কিছু বলতো না তো।

—তা বটে। নৌকাতে মাঝি টাঝি কেউ ছিল না।

খালি নৌকা।

—ঘড়া ঘড়া ঘী, বৈয়াম বৈয়াম মধু, থলি থলি মোহর, থালা থালা মেঠাই-মণ্ডা, ঝুড়ি ঝুড়ি বাদামপেস্তা, ধামা ধামা খৈ-মুড়কি, চমৎকার খেলনাপাতি, গাঁঠরি গাঁঠরি রেশমি কাপড়—ওঃ সে সাত রাজার ধন-সম্পদ! আর, এক কোনে একটা সোনার খাঁচা। তার ভেতরে কী! না একটা ছোট্ট বুলবুলপাখি। বসে বসে কী সুন্দর করুণ সুরেই না গান গাইছে! মাথায় ভেলভেট-লাল ঝুঁটি, কিন্তু পায়ে শক্ত সোনার শেকল। বুলবুলপাখি বললে—

—ভাই ফুলফুল, যদি আমাকে তুমি মুক্ত করে দাও, নৌকো সুদ্ধু এই সব জিনিসপত্তর আমি তোমাকে দিয়ে দেবো।

শুনে ফুলফুল মাথা নেড়ে বললে—জিনিসপত্তর আমার চাইনে বাছা, এসো, তোমাকে খুলে দিচ্ছি।'

তারপর যেই না খাঁচাটা খুলে দিয়েছে—অমনি বুলবুল পাখিটা হীরের গয়নায় আর বালুচরী শাড়িতে ঝল্‌মল্ করতে করতে পরমা সুন্দরী এক রাজকন্যা হয়ে বেরিয়ে এলো। টুলটুলকে ডেকে সেই কন্যা বললে,—পায়ের শিক্‌লিটা যদি খুলে দাও টুলটুলবাবু, তাহলেই আমি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি—'

'ওমা, বিয়ে করবে কি? ওরা না ছোটো?'

—ছোটোই তো। টুলটুল শিকলি খুলে দিয়ে তাই জন্যে বললে—'আমি কাউকে বিয়ে-টিয়ে করতে পারবো না বাপু, তুমি তোমার নৌকায় চড়ে যেখানে যাচ্ছিলে সেখানে চলে যাও।' সেই শুনে কী হলো বলো তো? সেই সুন্দরী মেয়েটা না, আকাশপাতাল জুড়ে এ্যাত্তো বড়ো এক হাঁ করে টুলটুল আর ফুলফুলকে খেয়ে ফেলতে তেড়ে এলো। কী বড়ো বড়ো দাঁত তার! মনুমেণ্টের মতন লম্বা লম্বা! আর কী লাল জিভ্! ওই যে লালঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল যায়, সেইরকম টকটকে লাল—

—অ্যাঁ? সে কী কথা? ওটা যে তবে ডাইনি-বুড়ি গো? ওদের খেয়ে ফেললে?

—আরে শোনোই না। বুকে বজ্রমাণিক থাকতে খাবে কী? নদী যেই দেখলে এতো বিষম বিপদ? বাচ্চাদের রক্ষে করতে সে তক্ষুনি ডাইনির পায়ের নিচের বালিটুকুকে গভীর চোরাবালি বানিয়ে দিলে, আর ডাইনিও ভুস্ করে চোরা বালির মধ্যে হাতপাসুদ্ধু গলা পর্যন্ত ডুবে গেল। বাইরে জেগে রইলো কেবল অ্যাত্তোবড়ো হাঁ করা তার মুণ্ডুখানা। টুলটুল-ফুলফুলের প্রহরী কুকুর সেই কৃষ্ণচন্দ্র তখন তেড়ে এসে ঘ্যাঁক করে ডাইনির নাক আর কান দিল কামড়ে। আর সেই মিষ্টি পুষিবেড়াল কমলিকা এসে ডাইনির জ্বলন্ত লোহার ভাঁটা চোখদুখানা নোখ দিয়ে আঁচড়ে দিলে। "বাপরে গেলুমরে" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে দুষ্টু ডাইনি বুড়িটা যেই মরলো অমনি দেবতারা আনন্দে শঙ্খধ্বনি করলেন। আকাশ বাতাসে কাড়া-নাকড়া ভেরী তূর্য বীনা-স্বরোদ কত কী বাজনা বেজে উঠল,—সারাটা বনই যেন উৎসবে মেতে উঠলো। আর বাঘেরা সবাই বন থেকে বেরিয়ে দলে দলে নদীর তীরে এসে ঝপাঝপ জলে ঝাঁপিয়ে

পড়তে লাগল আর জল থেকে উঠে আসতে লাগলো নতুন পোষাকপরা একের পর এক হাসিখুশি মানুষজন, সেপাই মন্ত্রী, চাষী মজুর, কোটাল মন্ত্রী, বনিক্-পুরুত।

—সে কি? বাঘেরা আসলে মন্ত্রপড়া মানুষ ছিল বুঝি! ওই ডাইনি তাদের গুণ করেছিলো? কেন করেছিলো মা!

—ডাইনি যে ওদের দেশের সব ধন সম্পত্তি নিজে নিয়ে নিয়ে, ওদের সব জীবজন্তু করে দিয়েছিলো। কিন্তু ওখানে এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি উল্টে মন্ত্র পড়ে ডাইনিকেই বুলবুলপাখি করে, করলেন কি পায়ে শিকলি বেঁধে খাঁচায় পুরে ভাসিয়ে দিলেন। অন্যের জিনিস সে যাতে কিছুই ভোগ করতে না পারে। কিন্তু সন্ন্যাসী তো বুড়ো মানুষ? দেশ শুদ্ধু লোকের এই দুঃখু সইতে না পেরে তিনি প্রাণত্যাগ করলেন ডাইনিও উদ্ধার পায়নি দেশও আর উদ্ধার হয়নি। এতদিনে এল মুক্তি।

—টুলটুল ফুলফুলের জন্যই ডাইনির ফুসমন্তর ঘুচে গেল, না মা?'

—হ্যাঁ বাবা, টুলটুল-ফুলফুলের পুণ্যবলে দেশের লোক উদ্ধার পেলো।

—তারপরে কী হল?

—তারপরে? বিরাট গাছগুলো সব হয়ে গেল বিশাল যত অট্টালিকা—মুহূর্তের মধ্যে বনজঙ্গলের অন্ধকার উবে গিয়ে ঝল্‌মল্ করে উঠলো সূর্যের আলো—দেখা দিলো কী সুন্দর এক শহর। বাগান ঘেরা এক প্রাসাদ নগরী। —বড় বড় চওড়া রাস্তার মাঝে মাঝে সবুজ গোল চত্তর চারদিকে বাগানভরা রং—বেরঙের ফুল, আর গোলাপজলের ফোয়ারা। টুলটুল আর ফুলফুল তো একেবারে অবাক। —একেবারে হাঁ!

—এ কী কাণ্ডরে বাবা! এত লোকজন দেখে ওরা তো ভয়েই কাঁটা!

ঠিক এমন সময়ে কে যেন ওদের পিঠে নরম করে হাত রাখলে আর মিষ্টি গলায় মিহি সুরে ওদের ডেকে বললে 'ভয় কি বাছারা, চলো বাড়িতে যাবে চলো,—তাকিয়ে দেখে, ওমা ইনি আবার কে! ফর্সা ধবধবে, নরম তুলতুলে মিষ্টি মতন গোলগাল এক রাণীমা, কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ, আর পরনে কমলা রঙের ঢাকাই শাড়িটি আর আঁচলে এক গোছা চাবি বাঁধা। —মুখখানা যেন ওদের খুব চেনা চেনা!

—আমি তোমাদের মা, রাণী কমলিকা—

—'আর আমি হলুম তোমাদের বাবা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র— গম্ গম্ শব্দে বলে উঠলেন কে যেন পিছন থেকে। তাঁর পরনে কালো ঝলমলে জরির কাজ করা রাজপোশাক, ইয়া পাকানো গোঁপ, ইয়া কোঁকড়ানো জুলপি, বাবরি চুলের ওপরে সোনার মুকুটখানি ঝল্‌মল্ করছে।

—আর আমি কে বলো তো! আমার দুধের বাছারা দেখি তো আমাকে চিনতে পারো কিনা! বলে একটা রূপোর থালায় সোনার বাটিতে ভর্তি চার বাটি সুগন্ধী ক্ষীর আর স্ফটিকের গেলাসে চার গেলাস গোলাপী শরবৎ নিয়ে এগিয়ে এলেন যিনি, তাঁর চোখের মিষ্টি হাসিটা ঠিক বাঘিনী মাসির মমতামাখা চোখের মতন। ওরা বললে—'তুমি আমাদের বাঘিনী মাসি!'—তিনি হেসে বললেন হ্যাঁ গো, আসলে কিন্তু তোমাদের ধাই মা হই!

—সে তো বুঝলাম! কিন্তু ডাইনিটা টুলটুলকে বিয়ে করতে চাইছিল কেন মা? আমি বুঝতে পারলুম না ঠিক।

—দূর দূর, সত্যি সত্যি বিয়ে করতে চাইছিল, না হাতী! লোভে পড়লেই বজ্রমাণিকের মালার সব গুণ নষ্ট হয়ে যায় কিনা? তাই অত ভাল ভাল খেলনাপাতি, পোশাক পত্তর, খাবার দাবার, সোনা দানা, রূপবতী রাজ-কন্যেটন্যের ফাঁদ পেতে ওদের মনে লোভ জাগাচ্ছিল দুষ্টু ডাইনিবুড়ি; যাতে ভগবানের আশীর্বাদ নষ্ট হয়ে যায়।

—কিন্তু ওরা তো লোভে পড়েনি, না মা? ওরা তো একটুও লোভী ছিল না? তাই না? ওরা তো ভালো। খুব ভালো।

—হ্যাঁ বাবা। একটুও লোভী ছিলনা ওরা। তাই তো ওদের রাজ্য শুদ্ধু রাজা, প্রজা, মা-বাবা, ধনরত্ন—সবই ফেরৎ পেলো। যে লোভকে জয় করতে পারে, সে জীবনের সব ব্যাপারেই জয়ী হয় বাবা।

—আমিও একটুও লোভী নই, না মা?

—হ্যাঁ বাবা। তুমিও মোটেই লোভী নও।

—মা. তাহলে আমার ওপরেও ভগবানের আশীর্বাদ থাকবে তো?

—নিশ্চয়ই থাকবে, বাবা। তুমিও যে ভালো, খুব ভালো।

—মাগো, তুমি আমার কাছেই থেকো কিন্তু? কোথাও উঠে চলে যেওনা যেন। হ্যাঁ মা? আমি তাহলে একটু একটু ঘুমিয়ে পড়ি এইবার?

—ঘুমোও সোনা, আমি এখানেই আছি, তোমার পাশে। কোথাও চলে যাচ্ছি না। এই তোমার পিঠের ওপরে আমার হাত রইলো।

বন মুকুলের উলুক ঝুলুক

সরল দে

এক

উরিবাস্! জলে বাস করে ওই কে ওটা?
কিম্ভূত কিমাকার ভীমাকার দেহটা।
হস্তীর মাসতুতো ভাই নয় ওটা তো,
ভাই হলে শুঁড় দিয়ে জল থেকে ওঠাতো।
রাম কহ! এই জলহস্তীর নমুনা!
দোস্তির কথা ওর কাছে আর কমু না।

দুই

ঘুম ঘুম ঘুম ঘুমা
বন-পাহাড়ের পুমা—
এই বলে কি আদর করে
সিংহেরা দেয় চুমা?
ধেড়ে সিংহের ভাগ্নে কি তুই
মিনি সিংহ পুমা,
হিংসে করে খাস নাকি তুই
মাংস ডুমা ডুমা?

তিন

ধরিলা রে ধরিলা
কিংকং গরিলা!
গরিলা সে কয়, বাছা
ভয় কেন করিলা।
মাচা বাঁধি গাছে গাছে
ডাল পালা বাঁকিয়ে,
বনে বনে আপনার
মনে মনে থাকি হে।

দাদুর বেড়াল

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ভোরবেলা হরি-নারায়ণঅ, হরি-নারায়ণঅ, বলতে বলতে দাদু আমাদের ঘরের সামনে এসে রোজ যেমন দাঁড়ান তেমনি দাঁড়ালেন। রোজকার মতই আকাশে তখন সবে আলো ফুটছে। একটা কি দুটো পাখি ঘুমচোখে আমার পড়া মুখস্ত করার মত কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে ডাকছে। দাদুর 'ওজন' ভরা বাতাস বইছে। বাতাস অবশ্য নেই আজ। শেষ রাতে তেড়ে বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশ মেঘলা। শুয়ে শুয়ে, চোখ পিট পিট করে আমি আকাশ দেখে নিয়েছি। চারপাশ নিস্তব্ধ গুমোট। দাদু রোজ যেমন ডাকেন সেই রকম ভারি, ভাবগম্ভীর গলায় ডাকলেন, 'খোকা উঠে পড়। আমি এগোচ্ছি।' দাদুর গলা শুনে বাবা রোজ যেমন ঘুমচোখে পাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আমার ডান কানটা ধরে বার কতক নেড়ে দেন সেই রকম নেড়ে দিলেন। আমি রোজ যেমন ধড়মড় করে উঠে বসে, দু'হাটুতে মাথা গুঁজে বলি, 'যান, আসছি' ঠিক সেই রকমই বলে, সামনে পেছনে দুলুনে চেয়ারের মত দুলতে লাগলুম। এই ভাবে দুললে ঘুম মাথা ছেড়ে পায়ের দিকে নেমে যায়। এই সময়টায় রোজ আমার যেমন হিংসে হয় তেমনি হল। বাবা কেমন আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকবেন। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে অঙ্ক করেন, তাই দাদু তাঁকে ঘুমোবার অনুমতি দিয়েছেন। আমি রাতে জাগতেও পারি না, জাগার অনুমতিও নেই। দাদু বলেন, বৃদ্ধ আর শিশু হল পাখির মত। ভোরে উঠে কলরব করবে। দাদু যেমন হরি নারায়ণ, হরি নারায়ণ করছেন। আমি বলেছিলুম, তা হলে ত পাখির মত সন্ধ্যে বেলাই শুয়ে পড়া উচিত। না, তা হবে না। এ পাখি হল প্যাঁচা আর কাকের মিশ্রণ। রাত দশটা পর্যন্ত হুতোম প্যাঁচা। ডানা মুড়ে, লাল চোখে টেবিলের সামনে। খোলা বই। মাস্টার মশাই। কিন্তু ভোরে কাক। এ পাখি, নতুন জাতের পাখি- 'প্যাঁকাক'।

দাদুর পরনে ন-হাতি পট্টবস্ত্র। ধব ধবে বিশাল বুকে ইয়া মোটা সাদা পইতে। পায়ে খটাস খটাস খড়ম। হাতে বেতের সাজি। আর এক হাতে অর্ডার দিয়ে তৈরি করান অ্যালুমিনিয়ামের আঁকসি। বাঁশের আঁকসি রোজ রোজ খুলে যায় বলে, বাবার প্ল্যানে এটা তৈরি করে দিয়েছেন দাদুর এক মক্কেল। ইচ্ছে মত বড় ছোট করা যায়। স্বর্ণ চাঁপা গাছ থেকে যখন ফুল পাড়া হবে আঁকসি তখন বড় হবে। রক্ত-করবীর কাছে এসে একটু ছোট হবে, টগরে এসে আরও ছোট। বাড়ি ঢোকার সময় ছাতার মাপ। আমি দাদুর ফুল তোলার সঙ্গী। ফুল তোলার পর এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দাদু আমাকে ছোটাবেন কিছুক্ষণ। তারপর কান ধরে কুড়িবার ওঠ বোস। আমার বয়েসে দাদুর নাকি ওজন ছিল চল্লিশ সের।

আমি যখন বাগানে গেলুম দাদুর সাজিতে ততক্ষণে জবা কিছু টগর আর গুলঞ্চ মুখ বার করে বসে আছে। কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের ছেলেরা যেন ফোলা ফোলা মুখে টাব-গাড়ি চেপে চলেছে। আমি যেতেই দাদু বললেন,

'মিলিটারিতে কি নিয়ম জান? ফল-ইন বললেই সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে। একটু দেরি হলেই সাজা। পিঠে ওজন নিয়ে সার্ত মাইল দৌড়। কি করছিলে এতক্ষণ?'

রোজ যা হয় তাই হয়েছিল। আমি খাটের দেয়ালের দিকে, বাবা ধারের দিকে। পা না সরালে নামি কি করে? গুরুজনকে ডিঙিয়ে নামতে নেই। শাস্ত্রে আছে। বললুম, 'পায়ে আটকে গিয়েছিলুম।'

দাদু কি শুনলেন জানি না। বললেন, 'ভেরি গুড। ব্যায়ামের ফল ফলবেই। পা বড় হচ্ছে। মানুষের বাড় ত পায়ের দিক থেকেই হয়। গাছের মত আর কি! নিচের দিক থেকে ওপর দিকে বেড়ে ওঠে। সজনে ডাঁটা, বটের ঝুরি, মাথার চুল, দাড়ি এ সব বাড়ে নিচের দিকে! মানুষ বাড়ে ওপর দিকে।'

কথা বলতে বলতে দাদু আঁকসিটা বড় করে ফেললেন। তার মানে এইবার স্বর্ণচাঁপার ওপর আক্রমণ চলবে। বাগানে পাশাপাশি দুটো চাঁপা গাছ। গেটের দু পাশে লম্বা প্রহরীর মত সোজা দাঁড়িয়ে আছে। বর্ষাকাল। তলায় বড় বড় ঘাস হয়েছে। পাতাটাতা পড়েছে অনেক। দাদু একটা কথা প্রায়ই বলেন, সাবধানের মার নেই, মারের সাবধান নেই। আজও তাই বললেন। বলে, আঁকসি দিয়ে ঘাসের ঝোপ দুলিয়ে দিলেন। ঘাসে সাপ থাকতে পারে। খোঁচা মেরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। তিনবার হরিনারায়ণ বলতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ। তিনি জেগে থাকলে প্রথম খোঁচাতেই ফোঁস করে বেরোবেন। ঘুমিয়ে থাকলে শেষ হরিনারায়ণেই ফণা তুলে উঠবেন।

ঘাস-ঝোপ দুলে উঠল আর ফোঁস শব্দ নয় অস্পষ্ট একটা মিউ ডাক শোনা গেল। দাদুর কাঁধে পালোয়ানের লাঠির মত আঁকসি, হাতে সাজি, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'কিছু শুনতে পেলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, মিউ।'

দাদু আরও ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'এদিকে এসো।'

এগিয়ে গেলুম। দাদু জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কি?'

ঘাস আর পাতার আড়ালে ছোট্ট এক তাল তুলোর মত একটি বেড়ালছানা। এত ছোট যেন চীনে বাদামের খোলার মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। শেষ রাতের বৃষ্টিতে ভিজে গেছে।

'তুলব দাদু!'

'নিশ্চয় তুলবে। জীবে দয়া করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

'মা কিন্তু বেড়ালের নাম শুনলে তেলে বেগুনে জ্বলে যায়। দেখলে কি হবে বুঝতে পারছেন?'

'ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। তুমি আগে ওটাকে তোল।'

তৃণশয্যা থেকে ভিজে বেড়ালছানাটাকে বুকে তুলে নিলুম। ধবধবে সাদা। প্রায় মরেই এসেছে। ঠাণ্ডায় চোখদুটো বুজে আছে। খুলতে পারছে না। ডাকার শক্তি নেই। গায়ে ছিট ছিট কাদা লেগে আছে। দাদু দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'শয়তান!'

'কে শয়তান দাদু?'

'যে এ বেড়াল শিশুটিকে এই ভাবে এখানে ফেলে দিয়ে গেছে। সারারাত নিজে শুয়ে রইল নরম বিছানায় পাতলা চাদর মুড়ি দিয়ে। আর এই জীবটাকে ফেলে রেখে গেল মৃত্যুর মুখে। ভগবানের আদালতে তোমার বিচার হবে। তুমিও বেড়াল হবে। তোমার মত আর এক শয়তান এই ভাবে ফেলে রেখে যাবে। আর তখন আমি তোমাকে তুলব না।'

'কি করে বুঝবেন দাদু, যে সেই বেড়ালটা বেড়াল রূপী শয়তান?'

'দেখলেই বুঝতে পারব। ঘুট ঘুটে কালো রঙ, বুরুশের মত লোম, কর্কশ গলা। সে আমি দেখলেই চিনব।'

'বাবা কিন্তু ওসব একেবারেই বিশ্বাস করেন না।'

'তোমার বাবা ঘোড়ার ডিম জানে। অঙ্ক ছাড়া কিছুই জানে না। ভূত আছে কিনা তাই জানে না। বলে ভূত আবার কি? আমি ম্যাথেমেটিসিয়ান। প্রমাণ ছাড়া কিছু মানতে রাজি নই। তাহলে তোমার

অঙ্কশাস্ত্রের শূন্যটা কি? শূন্যর কোনো প্রমাণ আছে? তুমি বড় তর্ক কর! ঠিক বাপের ধাতটি পাচ্ছ! নাও ওর বুকের কাছে কানটা ঠেকিয়ে দেখ ত ধুকপুক করছে কি না?'

বেড়ালটাকে এতক্ষণ বুকের কাছে চেপে ধরেছিলুম। জামাটা ভিজে উঠেছে। সামান্য নড়াচড়া করছে যখন বোঝাই যায় বেঁচে আছে। আবার কান লাগিয়ে নোংরা করি কেন? 'বেঁচে আছে দাদু। নড়াচড়া করছে।' বেড়ালটা ঠিক এই সময় আমার বুকের কাছে আর একবার মিউ করে উঠল। ঠাণ্ডায় চোখ জুড়ে গেছে। পৃথিবীকে দেখতেই পাচ্ছে না। আমাকে ত নয়ই। তবু মুখটা আমার মুখের দিকে তুলে এমন করুণ সুরে মিউ করে উঠল! ভীষণ মায়া লাগল। মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে এনে বৃষ্টির রাতে আমাদের বাগানে চুপি চুপি ফেলে দিয়ে যে চলে গেছে সে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর। দাদুর আদালতে তার নামে মামলা করা উচিত। মিউ ডাকে বেড়ালটা যেন বলতে চাইছে, তোমাদের হাতেই আমার জীবন মৃত্যু। বাঁচালে বাঁচব, মারলে মরব। ইস্, রাতে কুকুরেও ত মেরে ফেলতে পারত!

দাদু বললেন, 'নাও ওকে ভেতরে নিয়ে চল। হট ব্যাগ দিতে হবে। ফুটবাথ করাতে হবে।'

'ভেতরে নিয়ে যাব কি করে দাদু? কুকুর আছে না?'

'হ্যাঁ তাই ত! আমি তখনই তোমার বাবাকে বলেছিলুম. কুকুরটুকুর না পোষাই ভাল। এক বাড়িতে কুকুর আর বেড়াল রাখা যায় না। জন্মশত্রু।'

'না, দাদু, তখন ও কথা আপনি বলেন নি। বলেছিলেন কুকুর মানুষের বেস্ট ফ্রেণ্ড। প্রত্যেক সভ্য মানুষের কুকুর পোষা উচিত। আর তখন আমাদের বাড়িতে কোনও বেড়াল আসে নি।'

দাদু রেগে গিয়ে বললেন, 'তোমার সঙ্গে আমি এই জীবন মরণ সমস্যার সময় তর্ক করতে চাই না। আমাকে একটা রাস্তা বের করতে হবে।'

'কি রাস্তা বের করবেন দাদু? একে নিয়ে বাড়ি ঢুকলেই আমাদের টম সঙ্গে সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করে ফেলবে।'

'হ্যাঁ করলেই হল? করে দেখুক না! মেরে শেষ করে দেব।'

'মা ত বলেন, আমরা দু'জনেই নাকি আপনার আদরে বাঁদর হয়ে গেছি।

'আদরে বাঁদর হয় না, মানুষ হয়। তোমার মা তোমার বাবার মতই। সব জান্তা।'

রাস্তা দিয়ে ব্রঙ্কাইটিসের কাশি কাশতে কাশতে নেত্যকালীবাবু প্রাতর্ভ্রমণে চলেছেন। প্রতিবার কাশির ধমক থামলে তিনি একবার 'ওরে বাবা' বলে গোটা কতক কথা বলেই আবার কাশিতে চলে যান। তার মানে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায়, কাশি, ওরে বাবা, কথা, কাশি, ওরে বাবা, কথা।

রোজ আমাদের বাড়ির সামনে এসেই নেত্যকালীবাবুর একটা কাশির দমক আসবে। আজও তাই এসেছে। সামনে ঝুঁকে পড়ে কাশছেন। দাদু যেন আশার আলো দেখলেন। অন্যদিন নেত্যবাবু কথা বলতে চাইলেও দাদু, হুঁ হাঁ, আচ্ছা, আচ্ছা করে এড়িয়ে যান। আজ নিজেই এগিয়ে গিয়ে ডাকতে লাগলেন, 'ও নেত্য, নেত্য।' নেত্যবাবুর কাশি তখনও চলেছে। একটা হাত তুলে বোঝাতে চাইলেন, শুনেছি, শুনেছি, উত্তর দিচ্ছি। দাদুর ত সবেতেই অধৈর্য। মুখ দেখলেই বোঝা যায় গলা টিপে কাশি থামাবার ইচ্ছে হচ্ছে। অবশেষে থামল। সোজা হয়ে নেত্যবাবু বললেন, 'ওরে বাবা, কি বল?'

'একটা বেড়াল বাচ্চা নেবে?'

'অ্যাঁ, কি বললে?'

'তুমি কানেও কি আজকাল কম শুনছ? কি শরীরই করেছ! একটা বেড়াল বাচ্চা নেবে?'

নেত্যবাবু এই সাত সকালে এমন একটা দানের প্রস্তাব স্বপ্নেও মনে হয় ভাবেন নি। নাক মুখ সিঁটকে বললেন, 'রামো: বেড়াল? বেড়াল আবার মানুষে নেয়। গরু হলে নিতে পারি।'

দাদু রেগে বললেন, 'ভাগো, ভেগে পড়। স্বার্থপর। কেন, তোমার অত বড় বাড়ি একটা বেড়ালকে মাস-খানেক আশ্রয় দিতে পার না! তারপর ত বড় হয়ে নিজের রাস্তা নিজেই দেখে নেবে।'

'সে ত তুমিও দিতে পার। তোমারও ত বেশ বড় বাড়ি, বাগান।'

'আরে মূর্খ, আমার বাড়িতে যে বাঘের মত একটা কুকুর। সাধে তোমাকে বলছি!'

'দেখ মুকুজ্যে বয়েস তোমারও কিছু কম হল না! কুকুর, বেড়াল, পাখি! আর জড়িয়ে পোড়ো না, মায়া কাটাও, মায়া কাটাও। মনে কর, শেষের-অ সেদিন-অ, কিই ভয়ঙ্কর-অ।'

আবার কাশি। দাদু মুখ ঘুরিয়ে, খড়মের খটাস খটাস শব্দ তুলে আমার দিকে সরে এসে বললেন, 'এ দেশের কোনও দিন উন্নতি হবে না। সব স্বার্থ, সব স্বার্থ।'

বাগানে এতক্ষণ আমরা কি করছি দেখার জন্য মা এসে হাজির। আমার কোলে বেড়াল ছানাটাকে দেখে লাফিয়ে উঠলেন, 'ফেল, ফেল, ফেলে দে।'

দাদু বললেন, 'তুই আমার মেয়ে হয়ে এমন নিষ্ঠুরের মত কথা বলতে পারলি তুলসী!'

মা বললেন, 'তুমি ওটাকে পুষবে না কি?'

'পোষা ত পরের কথা, আগে ওটাকে বাঁচাতে হবে।'

'তোমার টম ওটাকে খেয়ে ফেলবে বাবা। তুমি ও শয়তানকে জান না। ওই দেখ।'

ঘরের জানলায় সামনের পা দুটো তুলে দিয়ে, বের করে দিয়ে টম ফোঁস ফোঁস করছে, আর বিস্কুট দেখে যেমন জিভ চোকায়, সেই রকম জিভ চোকাচ্ছে। দাদু টমের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে টম। আমার টমবাবু, এটা বিস্কুট নয়, তোমার বন্ধু ফ্রেণ্ড। আমাকে বললেন, 'একটু কাছে নিয়ে যাও, ওকে একটু দেখাও। আমি এই সেদিন একটা ইংরিজী বইয়ে ছবি দেখেছি, কুকুরের ঘাড়ে উঠে তিনটে বেড়াল নাচছে। ট্রেনিং-এ কি না হয়।'

টমের দিকে এক পা এগোতেই, ঘাঁউ করে আওয়াজ এক ডাক ছাড়ল, আমার কোলে মর মর বেড়ালটাও চমকে উঠল। মা দাদুকে বললেন, 'কি বুঝলে? ওর হিংসে তুমি জান না বাবা। ঠিক মানুষের মত। সে দিন তপনের ছেলেটাকে কোলে নিতেই সে কি লাফালাফি! কোল থেকে ফেলে দেবে। রাগ করে তিন দিন কথা বলে নি। যে দিন দুধ খেতে চায় না, সে দিন যেই বলি জলি, টমের দুধটা খেয়ে যা ত, অমনি এদিক, ওদিক তাকিয়ে ল্যাজ ঝুলিয়ে, সুড় সুড় করে খেয়ে নেয়।'

আমাদের পাশের বাড়িতে একটা লোম-অলা কুকুর আছে। তার নাম জলি। টম তখনও জানলায় ফোঁস ফোঁস করছে। এত জোরে ফোঁস করছে, জানলার গ্রিল থেকে ধুলো উড়ে যাচ্ছে। দাদু বললেন, 'ম্যাথেমেটিসিয়ানকে ডাক। বল আমি ক্যাবিনেট মিটিং ডেকেছি।'

মাকে আর ডাকতে যেতে হল না। দাদুর পরেই বাবা বাগানে আসেন। বাবাই বাগান-করিয়ে। আমরা কেবল ফুল তুলি। মাঝে মধ্যে ডাল ভেঙে ফেলে; ধরা পড়ে যাবার ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকি।

বাবা সব শুনেছেন। শুনবেন না কেন? এতক্ষণ ধরে হই চই হচ্ছে! চশমা পরে এসেছেন। চশমা পরে এলেই বুঝতে হবে, কাজের কথা হবে, আমাকে বললেন, 'দেখি, ওর, কনডিশানটা কি?'

বাচ্চাটাকে হাতে নিলেন। 'ইস ভিজে চুপসে গেছে। একটা তোয়ালে চাই। চোখে ড্রপস দিতে হবে, আর চায়ের কাপের গরম সেঁক। ড্রপারে করে বিশ ফোঁটা টেপিডওয়ার্ম দুধ খাওয়াতে হবে। এক ডোজ অ্যাকোনাইট সিকস একস।' মাকে বললেন, 'যাও তোয়ালে নিয়ে এস।'

মা বললেন, 'মানুষের তোয়ালে?

'হ্যাঁ, মানুষের, সেইটাই হয়ে যাবে বেড়ালের।'

মা চলে যেতেই দাদু খুশি খুশি মুখে বললেন, 'সাধে তোমাকে বলি ম্যান অফ অ্যাকসান! আচ্ছা, এটা

এখন থাকবে কোথায় ?'

কামিনী গাছতলার বাঁধান বেদিতে বসে বাবা বললেন, 'এ বাড়িতে না রাখতে পারলেই ভাল হয়। টমকে বিশ্বাস নেই। ধরলে, ছিঁড়ে দু টুকরো করে দেবে।' বাবা খুব চিন্তিত। মা তোয়ালে এনে বাবার হাতে দিলেন। বাচ্চাটাকে তোয়ালে জড়িয়ে আমার হাতে দিতে দিতে বললেন, 'আসুন, আমরা একটু মাথা ঘামাই।' মাকে আবার ফরমাশ, 'একটা খাতা আর ডট পেন নিয়ে এস !'

বাড়িতে কিছু হলেই মাকে যা খাটতে হয়! সাজি রেখে দাদুও বসে পড়েছেন। খাতা আর ডট এসে গেল। মাকে বললেন, 'তুমিও বস।'

কাগজে কলমে কি হবে কে জানে ? বাবা বলেন, গণিতে নাকি সব সমস্যার সমাধান আছে। আমার মনে হয় সরল কর, কি সুদ কষায় এ সমস্যার সমাধান নেই। টাইম অ্যাণ্ড মোশানে থাকতে পারে। যেমন, টম যদি এক লাফে ছ হাত যায় আর বেড়ালটাকে কত দূরে রাখলে টম জীবনেও ধরতে পারবে না। সেই শামুকটা, যে জীবনেও বাঁশের ডগায় উঠতে পারল না।

বেদিতে বাবা বসেছেন পা মুড়ে, আচার্যের মত। হাতে ডট পেন। সামনে খোল খাতা। বাবা বললেন 'আশেপাশে এই পাড়ায় কে বেড়ালটাকে রাখতে পারে ? নিন ভাবুন।'

দাদু বললেন, 'বুঝলে একজনকে আমার বড় মনে ধরেছে।'

'বলুন, বলুন !'

'তোমার জ্যাঠাই মা। আমাদের মেজ বউ। খাঁটি হরিভক্ত। গলায় তুলসীর মালা। একটিমাত্র ছেলে। সেও পরম বৈষ্ণব। সখি গো বলে যখন কীর্তনে টান ধরে হৃদয়ে যেন গামছা মোচড়ানর অনুভূতি হয়।' বাবা লাফিয়ে উঠকেন, 'আঃ এতক্ষণে আপনি ঠিক জায়গায় এসে ঘা মেরেছেন।'

'তা হলে তুমি তোমার জাড়তুতো ভাইকে একটা চিঠি লেখ। খোকা আগে অনুমতি নিয়ে আসুক। আমি ততক্ষণ ফার্স্ট এড দি।'

বাবা চিঠি লিখতে লাগলেন, 'প্রীতিভাজনেষু কানু, পৃথিবীতে পরের জন্যে বাঁচাটাই সবচেয়ে বড় বাঁচা।' আর দাদু কোলের ওপর বেড়াল ফেলে হাতে আই ড্রপসের শিশি নিয়ে বলছেন, 'দেখি মা দেখি, চোখ দুটো একটু মেরামত করে দি !' বাবা চিঠি লিখতে লিখতে বলছেন, 'ওষুধের গায়ে নির্দেশটা একবার পড়ে নিন। বেড়ালের চোখে দেওয়া যায় কি না ! মা একটু দুধ আর আর তুলো এনেছেন। এলাহি ব্যাপার। ও দিকে টম ভুক ভুক্ করছে। বেশি জোরে ডাকতে পারছে না, পাছে আমরা ভাবি হিংসে হয়েছে। আবার চেপে রাখতেও পারছে না। কাশির মত।

বাবার জ্যাঠাইমা, মানে আমার দিদা, বৈষ্ণব হলে কি হবে, ভীষণ রাগী। সব সময় রাগ রাগ চোখে তাকান। অ্যাই জুতো খোল। জুতো খোল। রাস্তায় কিছু মাড়াস নি তো ? গঙ্গাজল ছিটো। আহাহা, বিছানার চাদরটা কুঁচকে দিলি কেন ? আবার ঠাকুর ঘরে গিয়ে কি খট খট করছিস ? এই রকম একটা না একটা কিছু নিয়ে বকাবকি করবেনই। আমি অবশ্য গ্রাহ্য করি না। আমার কাজ আমি ঠিক করে যাই।

চিঠি নিয়ে যখন গেলুম, দিদা তখন রান্নাঘরের সামনে বসে নারকোল কুরছেন। একথালা সাদা সাদা ফুলের মত নারকোল হয়েছে। বেশ লোভ লাগছে। এক চামচে চিনি দিয়ে এক থাবা মুখে ফেলতে পারলে মন্দ হত না। সে হবার উপায় নেই। আমি ডাক পিওনের মত হেঁকে উঠলুম,

'চিঠি।'

'কার চিঠি ?'

'বাবার। এই নিন।'

দিদা দু হাত গুটিয়ে নিয়ে, মুখ চোখ কেমন করে বললেন, 'ছুঁয়ো না, বাসী জামা কাপড় ছেড়েচো ?'

'কখন, কোন সকালে ?'

'দাও, চিঠিটা আমার হাতে আলগোছে ফেলে দাও। দশ পা দূরে বাড়ি, চিঠি লেখার কি হল ? তোমার

বাবা যে কত কায়দাই জানে! যাও ঘর থেকে চশমাটা এনে দাও। দেখো, এক করতে আর এক করে বোসো না যেন। তোমার হাত পাকে আমার বিশ্বাস নেই।'

চশমা এনে দিদার হাতে দিতে না দিতেই কাকু বাজারের থলে হাতে বাড়ি ঢুকলেন। বেশ হাসি হাসি মুখ। মনে হয়, ভাল মোচাই পেয়েছেন। নারকোল কোরা হচ্ছে যখন।

'কি রে, সকাল বেলাই?' বাজারের থলেটা দেয়ালে কাত হল। দিদা খ্যাঁক করে উঠলেন,

'ওখানে কাল রাতে চটি ছেড়েছিলি, মনে আছে?'

'ওখানে কোথায় গো? সে ত ওই খানটায়।'

'তুই আমার চেয়ে ভাল জানিস?'

'আমার জুতো, আমি জানব না, তুমি জানবে?'

'হ্যাঁ আমাকেই জানতে হয়।'

'আচ্ছা বাবা, এই নাও।' কাকু ব্যাগটা তুলে দিদার সামনে নামিয়ে দিলেন।'

'এই নে চিঠিটা পড়। তোর দাদা লিখেছে।'

কাকু চিঠিটা নিয়ে জোরে জোরে পড়তে লাগলেন। 'স্নেহভাজনেষু গোপাল, ভক্ত, আর দয়ালু ব্যক্তি হিসেবে, তোমার একটা পরিচয় আছে। ত্রিসন্ধ্যা না করে জল স্পর্শ কর না। শ্রীচৈতন্যের নামে তোমার চোখে জলের ধারা নামে। তোমার উদারতার পরিচয় আগেও কয়েকবার পেয়েছি আশা করি আর একবার পাব। আমাদের বাগানে আজ কে বা কাহারা একটি বেড়াল ছানা ফেলে দিয়ে গেছে।'

দিদা হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'হবে না, বেড়াল টেড়াল হবে না।'

কাকু আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কি হবে না হবে না করছ? এখনও চিঠিটার এক প্যারা বাকি।'

'ওই প্যারাতে আছে, আমাদের বাড়িতে কুকুর, বেড়ালটাকে তোমরা রাখো। বেড়াল বৈষ্ণব নয়। কথায় বলে বেড়াল তপস্বী। ও আপদ আমি ঢুকতে দোব না।'

'আহা, চিঠিটা তুমি শোনোই না।'

ছড়া

অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হাত-পা কারো গুটন্ত
কেউ চঞ্চল ছুটন্ত,
অন্ধকারকে আলো করে
রেখেছে ফুল ফুটন্ত।

দিদা জোরে জোরে নারকোল কুরতে লাগলেন। খুব রাগ হয়েছে। কাকু বাকি অংশ পড়ছেন, 'এতটুকু একটি প্রাণী। অতি অসহায়। করুণ মিউ মিউ ডাকে জগতের কৃপা ভিক্ষা করছে। ওদিকে লোলুপ কুকুর অপেক্ষায় আছে, পেলেই ছিঁড়ে খাবে। আমার জ্যাঠাইমার দয়ার শরীর।'

সঙ্গে সঙ্গে দিদার প্রতিবাদ, 'না, আমার দয়ার শরীর নয়।'

'হ্যাঁ তোমার দয়ার শরীর।'

'মুখে মুখে তর্ক করবি না গোপাল।'

'তোমার দয়ার শরীর না হলে, আমার দয়ার শরীর হয় কি করে?'

'তুমি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।'

'না আমি দেবকুলে…'

দিদা ভীষণ ধমকে উঠলেন, 'চুপ কর।'

কাকু সঙ্গে সঙ্গে পড়া শুরু করলেন, 'বেড়াল বড় হলে আর বাড়িতে থাকে না। স্বাবলম্বী সন্তানের মতই গৃহত্যাগ করে।' অতএব মাত্র এক মাসের জন্যে বেড়ালটাকে তোমার নিরাপদ আশ্রয়ে রাখলে বড়ই বাধিত হব। আমি রোজ সকালে এক পোয়া পরিমাণ দুধও

পাঠাব। কিংবা দুধের টিন। যেটা তোমার সুবিধে। প্রীত্যান্তে।'

কাকু আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বেড়ালটা কেমন দেখতে রে?'

'দুধের মত সাদা।'

'ন্যাজ?'

'ন্যাজটা জলে ভিজে গেছে ত। সে ভাবে লক্ষ্য করি নি।'

'যাক, ঠিক আছে। তুই তা হলে নিয়ে আয়। আমার অনেক দিনের বেড়ালের শখ। হ্যাঁ রে বড় হলে ন্যাজটা বেশ মোটা হবে ত? ন্যাংলা ন্যাজের বেড়াল আমার দু চক্ষের বিষ।'

'হ্যাঁ কাকু, মোটা হবে। যে টুকু দেখেছি, তাতে মনে হয় মোটা ধাতের ন্যাজ।'

দিদা হুঙ্কার ছাড়লেন, 'গোপাল।'

কাকু হুঙ্কার ছাড়লেন, 'মা।'

'তুই বেড়াল এনে দেখ।'

'হ্যাঁ দেখবই ত।'

আমি পালিয়ে এলুম। এসে দেখলুম সুন্দর দৃশ্য। দাদু তোয়ালে জড়ান বেড়াল কোলে আর বাবা পেনসিল উঁচিয়ে বাগানের পথে এপাশ ওপাশ পায়চারি করছেন। আমাকে দেখেই দু'জনে একই সঙ্গে প্রশ্ন করলেন,

'রিপোর্ট কি? রিপোর্ট কি?'

আমি একটু চেপে চুপেই বললুম। সবটা না বলাই ভাল।

'কাকু বললেন, নিয়ে আয়, আমি ত একটা বেড়ালের অপেক্ষাতেই ছিলুম।'

দাদু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'দেখলে ত আমি তোমাকে কি বলেছিলুম? ভক্তরা স্বপ্ন পায়। ভগবান বেড়ালের রূপ ধরে আসছেন। নিশ্চয়ই ভোরের স্বপ্ন। তা হলে আর দেরি কেন? যাত্রা শুরু করিয়ে দি, দুর্গা বলে। পুজোটুজো সব মাথায় উঠে গেছে হে। ফুল শুকিয়ে গেল।'

'হ্যাঁ, তা হলে যাত্রা শুরু হোক।'

আমার পিসতুতো বোন রেখা এসে গেছে। পাশেই থাকে। ঠিক হল আমরা লটবহর নিয়ে যাব। মাদ্রাজ থেকে বাবা আঙুর এনেছিলেন, সেই আঙুরের বাস্কেটটা এল। বেড়াল নাকি বাস্কেটে শুতে ভালবাসে। বাবা বিলিতি বইয়ে ছবি দেখেছেন। নরম টার্কিশ তোয়ালে ত এসেই আছে। স্টেনলেস স্টিলের গেলাসে আধ গেলাস দুধ এল। একটা স্টিলের প্লেট এল। সব রেডি। এইবার স্টার্ট। বাবা বেড়ালটার কপালে হাত রেখে বললেন, 'মানুষ হয়ে এসো-মানু।'

দাদু আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে বললেন, 'তুমি অনেক বড় হবে।'

বাবা সব দেখে টেখে বললেন, 'আর একটু সাবধান হওয়া ভাল, কি বলেন?'

'অবশ্যই, অবশ্যই, সাবধানের মার নেই, মারের সাবধান নেই। কি করতে চাও বলো?'

'একটা ছাতা চাই।'

'কেন বল তো? রোদ লাগবে?'

'রোদ নয়, যে কোন সময় কাক আর চিল ছোঁ মারতে পারে।'

'ঠিক বলেছ হে। একেই বলে অঙ্কের মাথা।'

সঙ্গে সঙ্গে ছাতা এসে গেল। রথের দিন পুরী ঠাকুর যে ভাবে ছাতার তলায় নারায়ণের সিংহাসন নিয়ে হন হন করে হাঁটেন আমিও সেই ভাবে হাঁটছি। বাবা আবার হিসেব করে বলে দিয়েছেন, মাথা থেকে ছাতা যেন দশ ইঞ্চির বেশি ফাঁক না হয়। তা হলে ছোঁ মারতে পারে। বেড়ালটা খুব কাবু হয়ে আছে। তা না হলে খচর মচর করে কোল থেকে নেমে যাবার চেষ্টা করত। পেছন পেছন রেখা আসছে। হাতে লটবহর।

রকে দিদা আর বসে নেই। কাকু এপাশে, ওপাশে বাঘের মত পায়চারি করছেন। খুব রাগারাগি হয়ে গেছে দু'জনে, দিদার চশমার খাপটা এক পাশে পড়ে আছে। ও পাশ থেকে এ পাশে ঘোরার মুখে কাকু আমাদের দেখতে পেলেন, 'বাঃ বাঃ এসে গেছিস?'

'কাকু দিদা এত রেগে যান কেন?'

'ও বয়েস হলেই মানুষের রেগে যাওয়া স্বভাব হয়। হ্যাঁ বললে না, না বললে হ্যাঁ। আমিও কি এখন কম রেগে আছি ভাবছিস? বেরোতে দিচ্ছি না, চেপে আছি।'

'তা হলে?'

'তা হলে আবার কি? আমি বলেছি বেড়াল থাকবে ত থাকবে। আমি বাঘ পুষব, দেখি মা কি করে! আগে মাসীকে দিয়ে শুরু করি।'

রেখা মেঝেতে থেবড়ে বসে সঙ্গের জিনিসপত্রের হিসেব বোঝাতে লাগল, 'এই হল তোমার বেড়ালের বাড়ি। এই ছাতাটা হল ছাদ, এই হল দুধের গেলাস, এই হল তোমার গিয়ে দুধের থালা, আর তোয়ালে।'

'ছাতাটা নয় রে রেখা। ছাতাটা নিয়ে যেতে হবে। আমরা তা হলে যাই কাকু।'

কাকু অসহায়ের মত মুখ করে বললেন, 'আমাকে একটু ট্রেনিং দিয়ে যা তরু।'

'এর আবার ট্রেনিং-এর কি আছে কাকু? এই বাস্কেটে শুয়ে থাকবে। মাঝে মাঝে দুধ খাবে। আবার শুয়ে পড়বে। আবার দুধ খাবে। আবার শুয়ে পড়বে। মিঁউ করলেই বুঝবেন খিদে। ম্যাঁও করলেই বুঝবেন রাগ। ঘড়র ঘড়র করলেই বুঝবেন, কোলে উঠবে। আর মিঁঞাও করলেই বুঝবেন, পালাবার তাল খুঁজছে।'

'এই ত ওদের ভাষা, ম্যাঁও, মিঁউ, মিঁঞাও ম্যাঁও।'

'ম্যাঁও টা ত বললি না।'

'ওটা ত আমি ঠিক জানি না কাকু। বাবার কাছে জেনে এসে বলব।'

রেখা বললে, 'আমি জানি। ম্যাঁও মানেই দুষ্টুমি করার ইচ্ছে, ম্যাঁও মানে আও আর কি। টেবিলের ওপর থেকে একটা কিছু একটা ফেলব। ফেলে ভাঙব।'

'আচ্ছা, তা হলে তোরা আয়।' করুণ গলা কাকুর।

'আপনি কিছু ভাববেন না কাকু, আমরা মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব, খবর নিয়ে যাব।'

দাদুর আজ আর কোর্টে যাওয়া হল না। বাবা অ্যাটম নিয়ে রিসার্চ করেন। তিনি ঠিক সময়ে খেয়ে দেয়ে বেরিয়ে গেলেন। পুজোটুজো সেরে দাদু সাড়ে দশটার সময় এক বাটি মুড়ি নিয়ে আরাম করে বেতের চেয়ারে বসলেন। খোলা পিঠে ইয়া মোটা সাদা এক গোছা পইতে আড়া আড়ি পড়ে আছে। দাদু বলেন, ব্রহ্মদৈত্যের পইতে। পইতেতে চাবি বাঁধা।

মুড়ি খেতে খেতে দাদু মাকে বললেন, 'বুঝলি, বেড়ালটার একটা ব্যবস্থা হওয়ায় বড় আনন্দ পেলুম। ভালো ঘরে মেয়ের বিয়ে দেবার মত আনন্দ।'

মায়ের অত জীবে দয়া নেই। 'হুঁ' বলে রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে রইলেন। দাদু আপন মনেই বক বক করে চললেন। দেখতে, দেখতে ঘড়ির কাঁটা ঘুরে দুপুরের দিকে চলে গেল। খাওয়াদাওয়া সারার পর দাদু বললেন

'আয় বুড়ো ফুরফুরে হাওয়ায় একটু ঘুমোনো যাক।'

আদর এলে দাদু আমাকে বুড়ো বলেন।

দু'জনেরই ঘুম এসে গিয়েছিল। এমন সময় নিচে থেকে মা ডাকলেন, 'জ্যাঠাইমা এসেছেন।'

নাড়া দিয়ে দাদুর ঘুম একটু পাতলা করার চেষ্টা করলুম। 'দাদু, দিদা এসেছেন।'

ঘুমের ঘোরে দাদু বললেন, 'কোন দিদা?'

'বেড়াল দিদা।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ছেড়ে গেল। উঠে বসলেন। শুনতে পাচ্ছি, দিদা ওপরে উঠতে উঠতে বলছেন, 'সব সুখের শরীর। বেলা তিনটে অবদি পড়ে পড়ে ঘুম। রাজমিস্ত্রী হলে ভারায় উঠে এখন ইট গাঁথতে হত।'

দাদুর মুখ দেখে মনে হল বেশ লজ্জা পেয়েছেন। পা নামিয়ে বিদ্যাসাগরী চটি পরছেন। দিদা ঘরে ঢুকলেন। সাদা ধবধবে খান কাপড়। চোখে চশমা। বেশ রাগ রাগ মুখের ভাব।

'এই যে, ঘুম ভাঙল? বেশ আছেন যা হোক! যা শত্রু পরের পরে। অ্যাঁ।'

দাদু উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু গলায় বললেন, 'কেন বলুন তো? কেন বলুন তো?'

'কেন বলুন তো?' দিদার গলা বেশ চড়েছে। 'একটা ফাটা রেকর্ড পাঠিয়ে বেশ আরামে দিব্যি দিবানিদ্রা হচ্ছে। ও দিকে অষ্টপ্রহর মিউ মিউ করে আমাকে

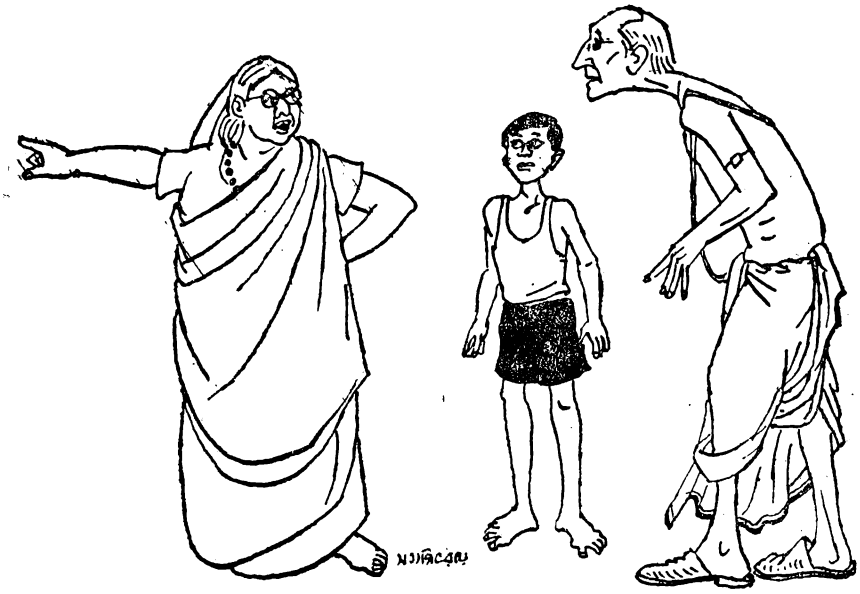

তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কাকু কোথায় দিদা!'

সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠলেন, 'তিনি অফিসে। তাঁর আর কি! হাসি হাসি মুখে বলে গেলেন, একটু দেখো মা। কে দেখবে বাবা ওই জিনিসকে। একবার দুধ খাওয়াতে গেলুম। থালায় পড়ে চান হয়ে গেল। এখন আষ্টে পৃষ্ঠে লাল পিঁপড়ে ছেঁকে ধরেছে।'

দাদু লাফিয়ে উঠলেন, 'অ্যাঁ বলেন কি? বুড়ো?'

'আজ্ঞে দাদু।' 'প্যামাকসিন।'

মা এসে দাঁড়িয়েছেন। লক্ষ্য করা হয় নি। ধীর গলায় বললেন, 'উঁহু, মরে যাবে। হলুদ '

দিদা বললেন, 'হলুদ কি প্যামাকসিন, সে তোমরা বোঝো। বেড়ালটাকে দয়া করে নিয়ে এস। আমি দায়িত্ব নিতে পারব না।'

দিদার চড়া চড়া কথায় মায়ের মনে হয় একটু রাগ হল। আমারও বেশ রাগ হচ্ছে। মা বললেন, 'আমরা লজ্জিত। আপনার অসুবিধে করার জন্যে। আমরা এখুনি নিয়ে আসছি।'

দাদু যেন বল পেলেন, 'তুই যাবি?'

'হ্যাঁ যাই। জীবটাকে পিঁপড়েতে মেরে ফেলবে তা ত আর হয় না।'

আমরা দু'জনে গিয়ে দেখলুম বেড়ালটার শোচনীয় অবস্থা। কোথায় তোয়ালে, কোথায় বাস্কেট। জুতোর র‍্যাকের সঙ্গে খাটো দড়ি দিয়ে বাঁধা। দুধে ভিজে লোম ড্যালা ড্যালা। ছোট ছোট থাবায়, নাকে, কানে মহানন্দে লাল পিঁপড়ে ঘুরছে। কিছু দূরে দেয়ালে শ্রীচৈতন্য গলায় মালা পরে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছেন।

মা আমাদের দলে এসে গেছেন। আর কিসের ভয়। দেখতে দেখতে পিঁপড়ের বংশ নিবংশ। বেড়ালটাও যেন এতক্ষণে মা পেয়েছে। ঘড়ড় ঘড়ড় শব্দ করছে, আর আদুরে গলায় মিউ মিউ করে ডাকছে। বেড়াল আবার ফিরে চলল। এ যেন উলটো রথ। মায়ের আঁচলের তলায় ম্যাও। কেন জানি না বেড়াল শব্দটা মায়ের ভাল লাগে না। একটু আদরটাদর এলেই বেড়ালকে ম্যাও বলেন। ম্যাও কোলে মা চলেছেন আগে আগে। লটবহর নিয়ে আমি পেছনে।

বাবা অফিস থেকে ফিরে এসেছেন। এখনও জামা কাপড় ছাড়েন নি। দু'জনেই বেশ উত্তেজিত। আমাদের

ফিরতে দেখে দু'জনেই হই হই করে বলে উঠলেন, 'ওয়েলকাম পুসী, ওয়েলকাম পুসী।'

মা ম্যাওকে আঁচলে করে টমকে ফাঁকি দিয়ে দাদুর লাইব্রেরিতে নিয়ে এসেছেন। বাবা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। টম এখন দোতলায় জানলার সামনে বসে গলা সাধছে। দাদু মায়ের কোল থেকে পুসীকে নিজের কোলে নিয়ে বললেন, 'বাঁচা গেল বাবা। ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে এল।' তারপর বারোয়ারি তলার পুজোর নাটকের সেনীদার মত বাঁ হাতে বেড়াল ধরে, ডান হাতটাকে বাতাসে গোল করে ঘুরিয়ে বললেন, 'এই হল তোমার সাম্রাজ্য। অসংখ্য ইঁদুর ঘুরছে আইনের বইয়ের ফাঁকে ফাঁকে। আইন বাঘা বাঘা অপরাধীদের কাত করলেও ক্ষুদ্র ইঁদুরের কিস্যু করতে পারে না। এইবার তুমি এসেছ। তুমি পারবে। তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাও। তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাও।'

মা দু হাত তুলে দাদুকে থামালেন, 'আর হাসি নয়, আর হাসি নয়। এখনও হাসির সময় আসে নি। রাত আসছে। কে কোথায় থাকবে ঠিক করুন।

বাবার মাথা আবার ঘামতে শুরু করল। ইউরেকার মত বাবার চিৎকার, 'পেয়েছি, পেয়েছি, ডগ গেট।'

বেড়াল কোলে দাদু র‍্যাকের কাছ থেকে উল্লাসে লাফিয়ে উঠলেন, 'ইয়েস, ডগ গেট।'

পর মুহূর্তেই দু'জনে চুপসে গেলেন, 'সে ত তৈরি করাতে সময় লাগবে!' 'তা হলে?'

আবার বাবার আবিষ্কার, 'পেয়েছি, পেয়েছি। আইন দিয়ে কুকুর ঠেকাব।' 'সে কি?'

'দেখবেন, যখন করব, তখন সেটা কি?'

দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মাঝের বড় ধাপে রাত দশটার সময় কোমর উঁচু একটা বড় র‍্যাক পড়ল, দেয়ালে দেয়ালে ঠাস হয়ে। সার সার সাজান হল ল-ম্যানুয়েলস। ইয়া মোটা মোটা বইয়ের দুর্ভেদ্য দেয়াল। দোতলায় দাদু আর বেড়াল। নিচের তলায় টম। বইয়ের পাঁচিলে পা তুলে গলা বাড়িয়ে, জিভ বের করে টম হা হা করছে।

বাবা বললেন, 'যতই চেষ্টা কর আইন লঙ্ঘন করার ক্ষমতা তোমার নেই। তবে তোমার আছে, কারণ তুমি বেড়াল। আপনি ওকে ঘরে বন্ধ করে রাখুন। কাল সকালে মিস্ত্রী ডেকে গেট তৈরি করান হবে।'

নিচে থেকে আমরা দু'জনে দাদু আর দাদুর বেড়ালকে, 'গুড নাইট' করলুম। টম ভুক্ করল।

দাদু বললেন, 'কাল সকালে তোমরা আমাকে গুড-মর্নিং না করালে এই আইন টপকে আমার পক্ষে বাগানে যাওয়া সম্ভব হবে না যে!'

বাবা বললেন, 'আমাকে তা হলে কাল একটু বে-আইনী করে ভোরে উঠতে হবে।' 'শুভরাত্রি'

টম এতক্ষণ ছোট ছোট ঢেঁকুরের ভুক্ ভুক্ তুলছিল। আর সামলাতে পারল না। এবার উদাত্ত ভেউউউ!

মঞ্জিল সেন

নরঘাতক চিতা ও অ্যাণ্ডারসন সাহেব

কেনেথ অ্যাণ্ডারসন ছিলেন মস্ত এক শিকারী। প্রাণের মায়া না করে যেমনভাবে তিনি হিংস্র শ্বাপদের মুখোমুখি হতেন তা যেন গল্পের মতন। সাহসী পুরুষের বোধ হয় ভগবান সহায়, কতবার যে তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচেছেন তার হিসেব নেই। বেশির ভাগ শিকার তিনি করেছেন দক্ষিণ ভারতের অরণ্য অঞ্চলে। এ হল স্বাধীনতার আগের যুগের ঘটনা।

একবার একটা চিতা শিকার করতে গিয়ে তাঁর দারুণ এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আসলে ওটা ছিল একটা মা চিতা, সেবারই প্রথম বাচ্চা দিয়েছিল। যে কোন কারণেই হোক, ওটা বাচ্ছাগুলোকে পাহাড়ের নিরাপদ গুহা থেকে সরিয়ে এনেছিল। হয়তো বাচ্ছাগুলোর বাবাই ওদের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পুরুষ বাঘ আর চিতা অনেক সময় নিজেদের কচি বাচ্চাদের খেয়ে ফেলে, তাই বাঘিনী আর মা-চিতা ওদের লুকিয়ে রাখে।

যাই হোক, মা চিতাটা বাচ্চাগুলোকে পাহাড়ি অঞ্চল থেকে সরিয়ে এনে কাবেরী নদীর কাছে এক ঘন বাঁশ ঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। হয়তো ওখানে সে অস্থায়ী আস্তানা গেড়েছিল, সুবিধেমত অন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাবে, এই ছিল উদ্দেশ্য, কিন্তু বিপদ এল অন্য দিক থেকে। একদিন রাতে মা চিতা শিকারে বেরিয়ে ছিল। ভোরবেলা সূর্য যখন পাহাড়ের চূড়ায়, চিতা তখন নদীর ধারে ধারে ফিরছে, বাঁশঝাড়টা তখনও বেশ কিছুটা দূরে। হঠাৎ খটা খট্ শব্দে ওটা চমকে উঠল। বাচ্চাদের যেখানে ও লুকিয়ে রেখে এসেছিল, শব্দটা আসছে সেদিক থেকেই। অজানা আশঙ্কায় ভরে উঠল মায়ের বুক। ও ছুটে চলল শব্দ লক্ষ করে।

বাঁশ কাটতে এসেছিল একদল লোক। তারা বাচ্চা-গুলোকে আবিষ্কার করে ফেলেছে। বাচ্চাদুটো অতটুকুন হলে কি হবে, তারাও ফোঁস ফোঁস করছে। যারা এসেছিল তাদের হাতে খুব ধারালো, মাথার সামনেটা বাঁকানো একরকম দা, অনেকটা কাস্তের মত। ওদের একজন হঠাৎ ওই ধারালো অংশ দিয়ে নরম লোমশ এক বাচ্চাকে সজোরে এক কোপ মারল। বাচ্চাটা প্রায় দু টুকরো হয়ে গেল, তখনও কিন্তু ওটার প্রাণ যায়নি, রক্তে লাল হয়ে উঠল সবুজ ঘাস।

ব্যস, তারপরই শুরু হয়ে গেল মারণযজ্ঞ। বাকি দুটোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সবাই, ধারালা অস্ত্রের কয়েকটা টানে ফালা ফালা হয়ে গেল ওদের শরীর।

হয়তো মানুষের প্রতি সহজাত ভীতিই মা-চিতাকে এতক্ষণ আড়ালে রেখেছিল, কিন্তু নিজের বাচ্চাদের ওই চরম পরিণতিতে ওটা আর স্থির থাকতে পারল না। তীব্র আক্রোশে আক্রমণ করল মানুষ ঘাতকদের। দুজন মানুষ ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারালো, বাকিরা পালিয়ে বাঁচলো। তাদের মুখ থেকেই এ ঘটনা পরে জানা গিয়েছিল।

এরপর থেকেই চিতাটা মানুষ মারতে লাগল, মানুষের প্রতি একটা তীব্র বিদ্বেষে ভরে গেছে তার মন। আঁচড়ে কামড়ে সে তার শিকারকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলত, কিন্তু মানুষের মাংসে লোভ ছিলনা। প্রতিশোধের স্পৃহায় ওটা নরঘাতক হয়ে উঠেছিল, কিন্তু নরখাদক হয়ে উঠেনি।

এই চিতার সন্ধানে একদিন বেরিয়েছেন অ্যাণ্ডারসন। সঙ্গে রয়েছে পয়েণ্ট ফোর-ও-ফাইভ রাইফেল। একটা পাহাড়ি পথ ধরে তিনি চলেছেন। ওই পথ দিয়েই সম্বর হরিণ এবং বন্য প্রাণীরা গ্রীষ্মকালে নদীতে জল পান করতে আসে। পথটা ঢালু হয়ে এসেছে, কিন্তু তিনি যাচ্ছেন উল্টোমুখে অর্থাৎ চড়াই ধরে। মাঝে মাঝে বড় বড় ঢিবি,

ঘন ঝোপ, বড় বড় তেঁতুল এবং অন্যান্য গাছ চোখে পড়ছে তার পরই জঙ্গল শুরু। কাবেরী নদীর উপত্যকা থেকে আরও উঁচুতে, বাবলা বেঁটে বেঁটে তেঁতুল, মুথি নানান গাছ এবং বড় বড় ঘাসের এক বনভূমি।

অ্যাণ্ডারসন সাহেব সন্তর্পণে এগুচ্ছেন, চিতাটা যে

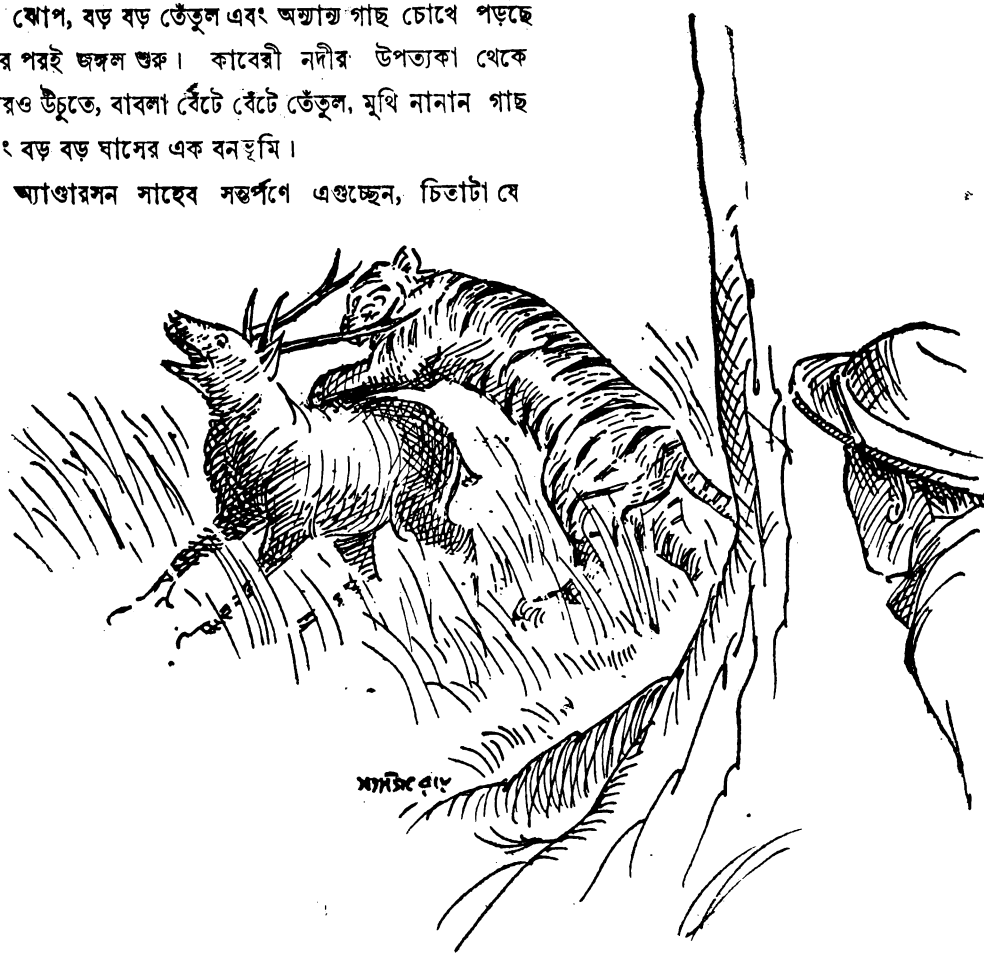

কোন মুহূর্তে আড়াল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। হঠাৎ এক সঙ্গে কিছু প্রাণীর তীক্ষ্ণ ডাক তাঁর কানে এল। শব্দটা আরও স্পষ্ট হয়ে দ্রুত তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে, বুনো কুকুরের ডাক। এক দল কুকুর শিকারকে তাড়া করে ওদিকেই আসছে। একটা তেঁতুল গাছের মোটা গুঁড়ির আড়ালে সাহেব তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়লেন। বুনো কুকুর ভীষণ হিংস্র, দল বেঁধে ওরা চলে, যাকে সামনে পায় ঝাঁপিয়ে পড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। একবার শিকারের গন্ধ পেয়ে তাকে তাড়া করলে সে বেচারীর আর রক্ষে নেই। যেমন হিংস্র তেমন সাহসী এই কুকুরের পাল। আসল বাহিনী তীক্ষ্ণ একটা শব্দ করতে করতে শিকারের পেছনে ছোটে, আর কয়েকটা কুকুর অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় ওটাকে ছাড়িয়ে দু'পাশ থেকে আক্রমণ করে বিব্রত করে তোলে। তারা যদি শিকারকে কাত করতে না পারে, তবে পেছন থেকে বাকিরা এসে কাজ সমাধা করে।

সাহেব গাছের আড়াল থেকে দ্রুত ক্ষুরের শব্দ শুনতে পেলেন, তারপরই সেখানে এসে পড়ল একটা তেজী সম্বর হরিণ। ওটার মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে, সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত, বিস্ফারিত দু'চোখে আতঙ্কের চিহ্ন। প্রাণভয়ে ছুটছে। পর মুহূর্তে প্রচণ্ড এক গর্জনে অরণ্য কেঁপে উঠল, তারপরই হলুদ ডোরাকাটা একটা প্রাণী ঝাঁপিয়ে পড়ল হরিণটার উপর।

একটা বাঘ শিকারের সন্ধানে বেরিয়েছিল। বুনো

কুকুরের ডাক ওর কানেও গিয়েছিল, ওটা বুঝতে পেরেছিল যে কুকুরের পাল শিকার তাড়া করে ওর দিকেই আসছে। সাধারণত বাঘ ওই হিংস্র কুকুর বাহিনীকে এড়িয়ে চলে। এক্ষেত্রেও বাঘটা হয়তো তাই করত, কিন্তু একটা সহজ শিকার ওর দিকেই আসছে এটা ভেবে হয়তো ও লোভ সামলাতে পারে নি। হরিণটা সামনে এসে পড়তেই লাফিয়ে পড়েছে তার উপর।

ওই একই কারণে বাঘটা সাহেবের উপস্থিতি টের পায় নি। তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তির সাহায্যে ও নিশ্চয়ই অনেক আগেই ধাবমান সারমেয় বাহিনীর চীৎকার শুনেছিল; এবং ওর মন ছিল সেদিকেই।

হরিণের পেছনটা বাঘের গুরুভারে নুয়ে পড়ল, একটা ভয়ার্ত আর্তনাদ বেরিয়ে এল ওটার মুখ থেকে। তারপরই লম্বা ঘাসবনের আড়ালে ঢাকা পড়ল ওদের দেহ। বাঘের নিপুণ থাবার আঘাতে সম্বরের ঘাড়ের হাড় মট্ করে ভেঙ্গে যাবার শব্দ শোনা গেল। পরমুহূর্তে সেখানে হাজির হল একদল হিংস্র বুনো কুকুর।

সাহেব যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে বাঘটাকে দেখতে পাচ্ছিলেন না, ওটা তখন নিহত শিকারকে জড়িয়ে রয়েছে। কুকুরগুলো ওখানে আসতেই তাদের ভয় দেখাবার জন্য সে মুহুর্মুহু হুঙ্কার ছাড়তে লাগল। সেই গর্জনে অরণ্য-ভূমি কেঁপে উঠল, সাহেব নিজেও কম্পিত হলেন, কিন্তু ভয়ে কাঁপল না সেই কুকুরগুলো।

তাদের মুখের শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে দেখে প্রথমে তারা হকচকিয়ে গেল, তারপরই দুরন্ত আক্রোশে তারা ঘিরে ফেলল ব্যাঘ্র মহারাজকে। সাহেব গুণে দেখলেন ওরা দলে রয়েছে নয়টি।

হরিণ তাড়া করে কুকুরগুলো যখন ছুটে আসছিল, তখন ওদের মুখ থেকে যে শব্দ বেরুচ্ছিল, তা অনেকটা পাখীর তীক্ষ্ণ ডাকের মত, কিন্তু এখন সে শব্দটা বদলে গেছে—সাহেব অনেক বছর আগে, চামালা উপত্যকার জঙ্গলে এ ধরনের বিচিত্র ধ্বনি শুনেছিলেন। সেখানেও একপাল জংলী কুকুর একটা বাঘকে তাড়া করে মুখ দিয়ে অমন শব্দ করছিল আসলে সাহায্যের জন্য চারদিকে তারা সংকেত পাঠাচ্ছিল। সীমানার মধ্যে যত বুনো কুকুর আছে, তারা ছুটে আসবে ওই ডাক শুনে। ওদের জাতের মধ্যে এটা যেন একটা অলিখিত চুক্তি, কেউ অমান্য করতে সাহস করেনা।

বাঘটা এবারে উঠে দাঁড়ালো। সাহেব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন তাকে। ওটা চারদিকে ঘুরে একবার দেখে নিল কতজন শত্রুর সঙ্গে তাকে মোকাবিলা করতে হবে। দন্ত বিকশিত করে সর্বশক্তি দিয়ে হুঙ্কার দিল, সেই সঙ্গে এপাশে ওপাশে আছড়ে পড়ছিল ল্যাজটা।

কুকুরগুলো গোল হয়ে ঘিরে রেখেছে বাঘকে, ওদের প একটু ছড়ানো, প্রতিটি কুকুর পালা করে একটানা সুরে সাহায্যের আবেদন বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে। বাঘের ক্রুদ্ধ গর্জনে আর কুকুরের তীক্ষ্ণ ডাকে কেঁপে কেঁপে উঠছে অরণ্য।

বাঘটা বোধ হয় বুঝতে পারল প্রতিটি মুহূর্ত তার পক্ষে বিপদ্ জনক। দুই লাফে সে যে কুকুরটা সরাসরি তার পথে ছিল, তাকে আক্রমণ করল। কুকুরটা সরে গেল, সঙ্গে সঙ্গে পেছনে যারা ছিল তারা আক্রমণের উদ্দেশ্যে সামনের দিকে লাফিয়ে পড়ল। বাঘটা ওদের মতলব বুঝতে পেরে বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়ালো, সামনের দু' থাবা দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে সজোরে আঘাত হানবার চেষ্টা করল। ওই থাবার নাগালের মধ্যে যে কুকুরগুলো এসে পড়েছিল, তারা পেছিয়ে গেল, কিন্তু একটা অত চটপট সরতে পারলনা। বাঁকানো নখর প্রচণ্ড আঘাত হানল ওটার পেছনের অংশে, ওটার দেহ শূন্যে ছিটকে পড়ল, একটা পা দেহ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অন্য কুকুরগুলো পেছন থেকে লাফিয়ে বাঘের শরীরের দু'পাশের মাংস খুবলে নিতে চেষ্টা করল। বাঘটা আবার ঘুরে দাঁড়ালো, শত্রুবাহিনী আবার ছিটকে সরে গেল। এবার যারা পিছনে ছিল, তারা এগিয়ে এল, কামড় দিয়েই সরে পড়বার মতলব।

বাঘ একটা ভড়কি দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো, যে কুকুরগুলো পেছন থেকে ছুটে এসেছিল, তারা আর সরে যাবার সময় পেল না। প্রচণ্ড থাবার আঘাতে আরও দুটো মারাত্মক জখম হল। ওদের একটা ক্ষতবিক্ষত দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করতেই বাঘ তার উপর

লাফিয়ে পড়ে দাঁত বসালো।

সঙ্গে সঙ্গে বাকি কুকুরগুলো দু'পাশ এবং পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তীক্ষ্ণ দাঁত বসিয়ে খুবলে নিল মাংস। বাঘ গর্জন করেই চলেছে, কিন্তু এবার সেই গর্জনের সঙ্গে মিশ্রিত আছে ভয়ের সুর।

বাঘটা নিজেকে ক্ষণিকের জন্য মুক্ত করতে সক্ষম হল, এখন মাত্র ছ'টি কুকুর, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার আহত, কিন্তু বাঘও অক্ষত নেই, অনেক ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে তার শরীরে, নেমেছে রক্তের ধারা। নিশ্বাস নেবার জন্য বাঘটা হাঁ করল। বন্য কুকুরগুলো কিন্তু দমবার পাত্র নয় চারদিক থেকে আবার তারা আক্রমণ শুরু করল। বাঘ আবার গর্জন করে উঠল, কিন্তু এবার গর্জনে এবার সেই তীব্রতা নেই।

ঠিক তখুনি দূর থেকে আরেকটা শব্দ ভেসে এল। বুনো কুকুরদের জবাবী ডাক—একদিক থেকে নয়, একাধিক দিক থেকে। সমস্বরে ডেকে ওঠা একটা বন্য ধ্বনি। গোষ্ঠীর অন্যদের সাহায্যের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তারা সব এদিকেই আসছে।

বাঘও শুনল সেই জবাবী ডাক। কর্পূরের মত উবে গেল ওর লড়াইয়ের স্পৃহা। ল্যাজ গুটিয়ে ওটা ছুট মারল পেছন পেছন তাড়া করল ছ'টি অল্প-বিস্তর আহত কুকুর।

তারপরই রণভূমিতে এসে পৌঁছোতে লাগল বুনো কুকুরের দল। তিনটি, আরও একটি। তারা মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালো, এদিক ওদিক শুঁকল, তিনটি মৃত সঙ্গীকে দেখে হিংস্র গর্জন করে উঠল। তারপরই যেদিকে বাঘ দৌড়েছিল, সেদিক লক্ষ্য করে ছুটে গেল।

একটু পরেই প্রায় বারটি কুকুরের একটি দল হাজির হল সেখানে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অবস্থা বুঝে তারাও অনুসরণ করল সেই একই পথ। বাঘের ভাগ্য নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। প্রায় চব্বিশটি বুনো কুকুর হিংস্র জিঘাংসায় তার পিছু নিয়েছে, শত্রুর নাগাল না পাওয়া পর্যন্ত এবং তাকে টুকরো টুকরো করে না ফেলা পর্যন্ত ক্ষান্ত হবেনা তারা।

কুকুর বাহিনী অদৃশ্য হতেই সাহেব তেঁতুল গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। সম্বর হরিণটা মৃত অবস্থায় পড়ে আছে, ওটার শরীরে দাঁত বসাবার সুযোগ আর হয়নি বাঘের। ইতস্তত পড়ে আছে তিনটি বিক্ষিপ্ত কুকুরের মৃতদেহ। বাঘের ইহলীলা ঘুচিয়ে কুকুরগুলো আবার ফিরে আসবে সম্বরের কাছে, শুরু হবে ভোজ।

কাহিনীর শুরু হয়েছিল মা-চিতাকে নিয়ে। মানুষের অকারণ নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধের জন্য যে নরঘাতক হয়ে উঠেছিল, তাকে দিয়েই কাহিনী শেষ করা যাক।

সেই রাতে অ্যাণ্ডারসন সাহেব আর তাঁর সঙ্গীরা পালা করে পাহারা দেবেন ঠিক করলেন। তাঁরা তাঁবু গেড়েছিলেন নদীর কাছেই, ওখান থেকে চলে গেছে বনপথ। চিতাটা যে ধারে কাছেই আছে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল গত রাতেই। ওই তাঁবুতেই সে হানা দেবার চেষ্টা করেছিল, অ্যাণ্ডারসন সাহেব জেগে উঠেছিলেন তাই রক্ষে।

রাত একটা থেকে অ্যাণ্ডারসন সাহেবের জাগার পালা। তার খানিক আগেই একটা বনমোরগ কয়েকবার ডেকে উড়ে গিয়েছিল। সাহেব বুঝতে পারলেন বিপদের কিছু আঁচ পেয়েই মোরগটা নিরাপদ আস্তানা ছেড়ে উড়ে গেছে। তিনি সাবধান হলেন। চিতাটা সেদিন রাতেও যে, নর হত্যার উদগ্র কামনায় ফিরে আসবে না এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।

তাঁবুর সামনে আগুন জ্বলছিল। একটা মোটা কাঠ আগুনে গুঁজে সাহেব একটা গাছের গুঁড়িতে পিঠ দিয়ে বসলেন। সামনে জঙ্গল। পেছনে নদী থাকায় ওদিক দিয়ে আক্রমণের সম্ভাবনা ক্ষীণ। চিতাকে আসতে হবে সামনে থেকে। সাহেবের সঙ্গীরা কাছেই মাটিতে শয্যা নিয়েছে।

রাত দুটো পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটলনা। মাঝে মাঝে পাখীর ডাক ভেসে আসছে, নদীর জলে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। হঠাৎ একটা মৃদু হিস্ হিস্ শব্দ কানে এল সাহেবের। শব্দটা থেমে গেল, তারপর আরও কাছে এগিয়ে এল। সাহেবের সঙ্গীরা যেখানে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে, তাদের একটু

দূরে একটা ঘন ঝোপ থেকে আসছে শব্দটা। ওই শব্দ সাহেবের অচেনা নয়।

চিতাটা ঘন ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে আছে, বোধহয় আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ওটা ঝাঁপিয়ে পড়বে ঘুমন্ত একজনের উপর। সাহেবের ছেলে ডন্ ওই ঘুমন্তদের একজন।

সাহেব চিতাকে দেখতে পাচ্ছেন না; অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেলেছে ঝোপটাকে। সাহেব মনস্থির করতে পারছেন না, হান্টিং টর্চটা জ্বালাবেন কিনা। আলো দেখলেই ওটা পালাবে। আরও কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন তিনি।

কিন্তু চিতাটার আর সবুর সইল না। শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ার আগে ওরা যেমন তীক্ষ্ণ অথচ হ্রস্ব একটা গর্জন করে, তাই করল ওটা তারপর ঝোপ থেকে লাফিয়ে পড়ল ঘুমন্ত মানুষদের খুব কাছে।

সাহেব এটাই চাইছিলেন। তাঁর রাইফেল উদ্যতই ছিল, বুড়ো আঙুল টর্চের সুইচের উপর। শক্তিশালী টর্চের আলো ছুরির ফলার মত অন্ধকার চিরে দিল, ভেসে উঠল চিতার জ্বলজ্বলে দুটো চোখ। তীব্র আলোর ঝলক মুখে পড়ায় মুহূর্তের জন্য ওটা হকচকিয়ে গেল। সাহেব ট্রিগার টিপতে যাবেন তখুনি ভীষণ একটা বিস্ফোরণের শব্দে তিনি চমকে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় একটা গুলির শব্দ।

'বাবা, তোমাকে আমি হারিয়ে দিয়েছি!' উল্লাসে লাফিয়ে উঠল ডন্। ওর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল; শোয়া অবস্থাতেই অব্যর্থ নিশানায় গুলি করেছে।

বাপ্‌কা বেটা!

জয়-বাংলা

অসিত বরণ হাজরা

জয়-বাংলা! জয় বাংলা! চোখ কর-কর করে,
ঝর-ঝরিয়ে দু'চোখ বেয়ে তরল ব্যথা ঝরে!
জবা ফুলের লাল্‌চে আভায় সর্ষে ফুলের শোভা,
গগ্‌ল্‌স্ আঁটা চোখ দুটোকে সাজালো হয়তো-বা!
গ্রাম ছাড়িয়ে শহরে এই টের-পাওয়ানো হাওয়া—
জয় বাংলা! জয়-বাংলা! দিব্যি করে ধাওয়া!!

জয়-বাংলা! জয়-বাংলা! মেঘনা-যমুনা;
দুই চোখেতে বইছে তোমার পরম-নমুনা!
চোখ-জুড়িয়ে যেতো আগে, যাচ্ছে এখন জুড়ে,
নিজের মনেই কানামাছি খেলছি ঘুরে-ঘুরে!
জয়-বাংলা! জয়-বাংলা! ধন্য তুমি ওহে!
চোখ-রাঙিয়ে নিলাম তোমার অপার অনুগ্রহে!!

বৃষ্টির দিনে, মনে মনে...

বুদ্ধদেব গুহ

এবারে বর্ষা প্রথম থেকেই জাঁকিয়ে বসেছে এসে। এবং জুলাইয়ের শেষেই নদী নালা খাল বিল ভরে গেছে—তাই সেপ্টেম্বরের শেষে গিয়ে কী যে হবে তা ভাবার।

বর্ষা কখনও অতিবর্ষণ, প্লাবন এবং সর্বগ্রাসী খরস্রোতা নদীর বন্যায় তাণ্ডব করে বটে, কিন্তু তবু বলব বর্ষার মত ঋতু নেই। রবীন্দ্রনাথ যত গান বর্ষার উপর লিখে গেছেন তত গান আর কোনো ঋতুর উপরেই লেখেন নি।

যখনই বৃষ্টি পড়ে, আমার অফিস যেতে একেবারেই ইচ্ছে করে না, কোনো কাজই করতে ইচ্ছা করে না; শুধু ইচ্ছে করে, জানালার ধারে বসে একা একা বৃষ্টি পড়া দেখি, নয়ত গুণগুণ করে শুধু নিজেকে শুনিয়েই কোনো নরম গান গাই, যেমন গান বৃষ্টির সঙ্গে, গাছে-পাতায় নদী-নালায় মিশে চারদিকের ভেজা প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে একাকার হয়ে যায়। 'বাজে, করুণ সুরে'র মত কোনো গান।

বৃষ্টি পড়লেই অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে আমার। বৃষ্টির দিনে কত বিভিন্ন জায়গার ভেজা দিনগুলির কথা চকিতে ফিরে আসে মনের মধ্যে, ফিরে এসে, মনকে উদাস বিবশ করে দেয়।

অনেক দিনের কথা, তখন আমি স্কুলে পড়ি, এক বর্ষার বিকেলে গারো পাহাড়ের রাজধানী তুরা থেকে বেরিয়েছি আমরা গাড়িতে গৌহাটির পথে। সুন্দর আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী পথ ছেড়ে নেমে এসেছি আমরা সমতলে। সারা পথই বৃষ্টি পেয়েছি। সমতলে নামতেই বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। প্রায় দেড়-দু ঘণ্টা সমানে অমন বিদ্যুৎ চমকাতে আর কখনও দেখিনি কোথাওই। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছেই, সেই কথা মনে পড়ে যায়। বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট হইনি যদিও, কিন্তু বিদ্যুৎ-মোহিত হয়ে গেছিলাম এবং আজও হয়ে আছি এত বছর পরে।

আসামের গোয়ালপাড়া জেলা আর গারো হিলস-এর সীমানা চিহ্নিত করে একটি খুব সরু কিন্তু খুব গভীর নদী বয়ে গেছে। তার নাম জিঞ্জিরাম। গারো ও রাভা উপ-জাতিদের ছবির মত বস্তীর পাশ দিয়ে এঁকে-বেঁকে ছায়াচ্ছন্ন গভীর অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে বর্ষায় কানায় কানায় ভরা নদীর পথ। কুমীরের জন্যে এই নদী কুখ্যাত। প্রতি বর্ষায় অনেক লোক কুমীরের পেটে যায় এই অঞ্চলে। নানারকম কুমীর! তবে মেছো-কুমীরের চেয়ে এমনি কুমীরই বেশি। ছোট্ট ছই-ওয়ালা নৌকোতে আমরা গেছিলাম, ভরা-বর্ষায়; ব্রহ্মপুত্র নদ বেরিয়ে সেই নদীতে। শাঁ শাঁ করে শীষ দেয় সেখানে কুমীরেরা। এত বড় বড় কুমীর আছে জিঞ্জিরামে যে তাদের মাথার কাছে চামড়া কুঁচকে ভাবের মত উঁচু হয়ে থাকে। ওখানকার লোকে বলে 'ঘট-ওয়ালা' কুমীর।

কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি; অনুক্ষণ বৃষ্টি। নৌকো চলেছে বৃষ্টির মধ্যে মধ্যে, মাঝি লুঙিটা গুটিয়ে কোমরে বেঁধে দাঁড় বাইছে—ওখানে লগি তল পায়না। ভেজা পানকোড়ি আর বেলে হাঁস নদীর কাদায় পায়ের পাতার দাগ কেটে কেটে কবিতা লিখছে। রাভাতলা গ্রামের মেয়েরা দুপাশ

থেকে ঝুঁকে-পড়া বড় বড় মহীরুহের ছায়ায় অন্ধকার সরু নদীর ঘাটে গা-ধুতে, কাপড় কাচতে নেমেছে ভয়ে ভয়ে। এইসব ঘাট থেকেই কুমীর তাদের ধরে নিয়ে চলে যায় নদীর গর্ভে। ঘোলা অন্ধকারে, জলের গভীরে, নদীর পারের কাদার মধ্যে তাদের গর্ত আছে। সেই গর্তে নিয়ে গিয়ে মানুষ খায় ওরা। কুমীর মারা পড়লে, তাদের পেট থেকে মেয়েদের চুড়ি, বালা, হার, ছোটদের কোমরের পৈঁছা, পুরুষ মানুষের আংটি সব পাওয়া যায়। তখনই বোঝা যায় যে, কোন্ কুমীর কাকে খেয়েছে।

বৃষ্টির কথা ছেড়ে অন্য কথায় চলে এলাম। কিন্তু বৃষ্টির কথা মনে হলেই জিঞ্জিরামের কথা মনে পড়েই আমার। বৃষ্টির সঙ্গে সেই স্মৃতি মাখামাখি হয়ে ভিজে রয়েছে। হলুদ আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে রাঁধা ভাঙ্‌নি মাছের ঝোল দিয়ে মিষ্টি লাল-চালের ভাত খেতাম। সেই বৃষ্টির দিনের মাছ ভাতের আঁশটে গন্ধটিও যেন এখনও আঙুলে জড়িয়ে রয়েছে। তিরিশ বছর পরও।

আরও পেছিয়ে গেলে মনে পড়ে রংপুরের কথা। তিস্তা থেকে আসা ঘোঘট নদীর সঙ্গে যুক্ত ক্যান্যালের পারে ছিল বাবা-কাকাদের জমিজমা এবং তাঁদের বাড়ি। বর্ষাকালে সেই ক্যানাল দিয়ে হু হু করে জল ছুটত। গো-বক ভিজত বিজ্ঞর মত গাছে বসে। যেন, কন্‌ফুসিয়াসের ফারস্ট কাজিন্। গোরু বলদ বিনা প্রতিবাদে ভিজতে ভিজতে হঠাৎ হাম্বা-আ-আয় করে ডেকে উঠে বর্ষার ভেজা প্রকৃতিকে চমকে দিত। হাঁসেরা প্যাঁক্ প্যাঁক্ করে মাথা খারাপ করে দিত। সন্ধ্যে হলে, সদর থেকে ফিরে যেত ছোট ছোট মুসলমান ছেলেরা দুধ বিক্রী করে দুধের পোড়া মাটির কালো হাঁড়ি বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে। তিস্তা নদীর গান, বগার ফাঁদে পড়ার গান, ফতিমা বিবির গান; কতরকম গান। শংকামারীর শ্মশানের রাস্তার পাশের বাঁশঝাড়ে জোনাকি জ্বলত। প্রথম বসন্তের আমগাছে আমের মুকুল আসার মত জোনাকিতে ছেয়ে যেত গাছ-পাতা। পিছনের মাঠে সাপে ব্যাঙ ধরত। শেয়াল ডাকত বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে। বাগানের জলপাইগাছের নীচের ঝোপের মধ্যে কুণ্ডলী-পাকানো প্রকাণ্ড দারাজ সাপটা অস্বস্তিতে নড়ে চড়ে উঠত।

বরিশালে ইল্‌শে-গুঁড়ি বৃষ্টি দেখেছি! তোমরা নিশ্চয়ই সেই বিখ্যাত কবিতাটি পড়েছো! 'ইলশে-গুঁড়ি, ইলশে-গুঁড়ি ইলিশ মাছের ডিম'—পড়োনি? না পড়লে পড়ো।

স্টিমার ঘাটের অনেক দূরে জেলে নৌকোর ঘাট। চক্‌চকে রূপোলী ইলিশ মাছে নৌকো ভর্তি করে জেলেরা এসে বৃষ্টির মধ্যে নৌকো ভিড়োত ঘাটে। এক টাকায় তিনটে মস্ত মস্ত আড়াই-তিন কেজির ইলিশ। তোমরা কেউ কি জ্যান্ত ইলিশ দেখেছো? তোমরা কেন, খুব কম লোকই দেখেছে; এক জেলেরা ছাড়া। জল থেকে তুললেই ইলিশমাছ মরে যায়। বড় সখের প্রাণ ওদের, কষ্ট করে বাঁচতে চায় না অন্যদের মত। রুই, কাতলা, কই, মাগুর, ট্যাংরা পুঁটি জল থেকে তোলার পরও বেঁচে থাকার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে।

ভরা-বৃষ্টির রাতে খোলা নদীর মধ্যে তোমরা কেউ স্টিমারের সার্চলাইট দেখেছো? মনে হয়, হাজার হাজার ইলিশ মাছ জল ছেড়ে উঠে পড়েছে—তাদের লক্ষ লক্ষ আঁশ চক্‌চক্ করছে আলোতে। তোমরা কেউ কি বৃষ্টির মধ্যে বরিশাল থেকে খুলনার পথে অথবা ঢাকা থেকে গোয়ালন্দের পথে খোলা ডেকে দাঁড়িয়ে ঝোড়ো জোলো হাওয়ায় স্টিমারের বাবুর্চির রাঁধা মুর্গীর-ঝোল আর ভাত খেয়েছো? আহা কী স্বাদ! পৃথিবীর কত জায়গার কত রান্নাই ত খেলাম, অমন স্বাদ আর কোনো রান্নায় পেলাম না।

উড়িষ্যার ঘন জঙ্গলে - মহানদীর অববাহিকায়—অন্ধ-করা বৃষ্টির মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে-থাকা অন্ধকার পাহাড়ের মত হাতীর দলকে তোমরা কি কেউ বৃষ্টিতে ভিজতে দেখেছো? তখন দেখলে মনে হয়, ওরা স্থবির—চিরদিন বুঝি ওরা এমনি করে দাঁড়িয়েই থাকবে।

বৃষ্টির দিনে বাঘেদের বড়ই অসুবিধে। ওরা বেড়ালের বোনপো-বোনঝি বলে জলকে ওদের খুবই অপছন্দ! বৃষ্টির পর যখন গাছ-গাছালি থেকে টুপ-টাপ করে জল পড়ে তখন ওরা বনের মধ্যে বন বিভাগের বানানো চওড়া পথে এসে বসে থাকে জল এড়াবার জন্য।

কিন্তু সুন্দরবনের বাঘ? তারা জলকে তেমন কেয়ার করে না। বর্ষার বিকেলে—এপার ওপার দেখা যায় না এমন মাতলা, হেড়োভাঙ্গা বা গোদাবা নদীর পারে দাঁড়িয়ে যখন মামা হাঁক দেয় তখন সেই ডাক নদী বেয়ে মুহূর্তের মধ্যে কত মাইল যে ছুটে যায় তা যে শুনেছে, সেই জানে। সুন্দরবনের মধ্যে মধ্যে কিছু উঁচু জমি আছে তা জোয়ারে এবং বর্ষাতেও জলে ডোবে না—জেলে-বাউলে-মউলেরা সেইরকম ড্যাঙাকে বলে, ট্যাঁক। বর্ষাকালে সেই ট্যাঁকের মালিকানা নিয়ে জানোয়ারদের মধ্যে মারামারি লেগে যায়। শিঙাল হরিণেরা শিঙে শিঙে খটাখট্ আওয়াজ করে লড়াই করে আর বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাঁদরগুলো কিচির মিচির করতে করতে গাছ থেকে তাদের সাপোর্ট করে হাততালি দেয়—চেঁচায়—যেন গ্যালারীতে বসা দর্শক মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের শীল্ড-ফাইন্যাল দেখছে!

পুব-আফ্রিকাতে গোরোংগোরে বলে একটি মৃত আগ্নেয়গিরি আছে। সেই আগ্নেয়গিরি পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে বড় আগ্নেয়গিরি ছিল। তার বলয়ের গভীরে অনেক বর্গ কিলোমিটার পরিধির বিরাট এক গর্ত। টুপিকে উল্টো করে দিলে যেমন দেখায়, তেমন দেখতে লাগে গর্তটি। তার মধ্যে আবার হ্রদও আছে। বৃষ্টির মধ্যে সেই লেকে ফ্লেমিংগো পাখিরা তাদের আশ্চর্য গোলাপী-সাদা শরীর আর লম্বা-লম্বা ঠ্যাং নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বৃষ্টির মধ্যেই চিতা, থম্‌সনস্ গ্যাজেল ধরে তার মাংস খায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে। সিংহ-সিংহী ধাড়ী বাচ্চার দল বড় কালো মোষ মেরে তার পেটের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে রক্তে নাক-মুখ-গোঁফ-কপাল সব লাল করে বিরাট আওয়াজে ভুরি-ভোজ করে। জেব্রার দল, জংলী গাধার মত দৌড়াদৌড়ি করে এদিক ওদিকে। পায়ের ক্ষুরে ভিজে, কালো, নিভে-যাওয়া আগ্নেয় গিরির মাটি ছিটিয়ে।

সুইট্‌জারল্যাণ্ডের লেক জিনিভার উপর যখন বৃষ্টি পড়ে, তখন বরফ ঘেরা পাহাড়-চুড়ো আর লেকের জলের রঙ এক হয়ে যায়। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে যখন বৃষ্টি নামে, তখন হাওয়াইনরা কানে হাইবিস্‌কাস্ ফুল গুঁজে, আমাদের দেশের লুঙির মত, রঙীন পাগো পাগো পরে খড়ের চালার নীচে নাচগান করে। "মাহে-লাহে" আর "লাই-টাই" খায়। মাহে-লাহে, মাছের একরকম রান্না—আর লাই-টাই, পানীয় একরকমের।

আফ্রিকার রিফট-ভ্যালীতে যখন বৃষ্টি পড়ে—তখন সাত ফুট লম্বা মাসাই রাখাল হাতে বল্লম নিয়ে, লাল রঙা পোষাক পরে—এক পায়ে দাঁড়িয়ে একটি পা গুটিয়ে নিয়ে অন্য পায়ের হাঁটুর কাছে রেখে এক-ঠ্যাং বকের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভেজে। ওদের চোখে মুখে কোনো ভাবান্তর ঘটে না। নাক চোখ দিয়ে জল গড়ালেও। মাঝে মাঝে কেবল পিচিক্-পিচিক্ করে থুথু ফেলে এদিকে ওদিকে, যেন সমস্ত নাগরিক মেকী সভ্যতার একেবারে মুখেরই উপর।

তোমরা সবাই সুকুমার রায়ের "ভালো রে ভাল" কবিতাটি নিশ্চয়ই পড়েছো—আবোল তাবোল-এর সেই কবিতার শেষ লাইন, "কিন্তু সবার চাইতে ভাল পাঁউরুটি আর ঝোলাগুড়।"

ওঁকে আমি দেখিনি কখনও—দেখা সম্ভবও ছিল না। কারণ আমি জন্মাবার আগেই উনি মারা যান—কিন্তু উনি বেঁচে থাকলে সাজেস্ট্ করতাম 'কিন্তু সবার চাইতে ভাল বর্ষারাতে খিচুড়ি' লিখতে। সুনির্মল বসু লিখেছিলেন, "খিচুড়িতে ডিম-ভাজা, তরকারীতে সিম-ভাজা।"

বৃষ্টির রাতে, ভাজা মুগের ডালের মটরশুঁটি দেওয়া ভুনি খিচুড়ি, সুগন্ধি সোনা-রঙা গাওয়া ঘি, কড়্‌কড়ে করে আলু-ভাজা, ডিমভাজা, তপ্‌সে মাছ অথবা ইলিশ মাছের গাদা-ভাজা, আর শুকনো লংকা ভাজা দিয়ে খেয়ে, আতর লাগানো নক্সী-কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকার মত রাজসিক আনন্দ বোধ হয় আর কিছুই নেই।

কিন্তু তোমরা যারা শহরে থাকো, তারা বড়ই অভাগা। তোমাদের জন্যে আমার খুউব কষ্ট হয়। বৃষ্টির দিনে গ্রাম বা জঙ্গলে চলে যেও। আমাদের দেশটা কী সুন্দর। এমন বৈচিত্র্য, এমন সৌন্দর্য পৃথিবীর কোনো দেশেই নেই। টিনের বা খাপ্‌রার বা খড়ের চালে বৃষ্টির শব্দ শোনার মত আনন্দ আর কিছুই নেই। টিনের চালে বৃষ্টি পড়লে মনে হয় খই ভাজছে কেউ, নয়ত বৃষ্টির-পুকুরে পুঁটি-মাছ লাফাচ্ছে

মনের আনন্দে ধেই ধেই করে। খাপ্‌রার চালে বৃষ্টি পড়লে মনে হয়, ঝাচা-মাচা ঝাচা-মাচা করে কোনো দেহাতী লোক দূর পাহাড়ের আড়াল থেকে বুঝি মাদল বাজাচ্ছে। আর খড়ের চালে বৃষ্টির শব্দকে মনে হয়, তোমার কোনো খুবই প্রিয়জন, মা, মাসী, ঠাকুমা বা দিদিমা তোমার একেবারে কানের কাছে ফিস্‌ফিস্ করে কোনো রূপকথার গল্প বলছেন।

হাজারীবাগ আর পালামৌর বৃষ্টিও এমনই ফিস্‌ফিসে। রূপকথার গল্পর মত। পড়ছে ত পড়ছেই; কিন্তু যেন রাশ রাশ নরম পায়ের উড়াল-পাখি, সুরের পাখি; দূরের পাখি; রূপকথার রূপোর পায়জোর-পরা আল্‌তো-নরম সুন্দর পায়ে এসে বসছে—এখন যেমন স্মৃতির পাখিরা বসছে এসে ফিস্‌ফিস্ করে, আমারও বুকের দাঁড়ে, ফিরে ফিরে। আর আমাকে উদাস, বিষণ্ণ করে দিচ্ছে আল্‌সেতে ভেজা-পায়রা-ডাকা এই বিচ্ছিরি শহরের ইঁট-কাঠের প্রাণহীন জঙ্গলের এক বৃষ্টির দুপুরে।

ভালো লাগে

ধূর্জটি প্রসাদ দত্ত

ভালো লাগে পাখিডাকা সোনাফুলি দিনটা
ভালো লাগে নূপুরের মিঠে রিনঝিনটা।
ভালো লাগে বকুলের ভুরভুর গন্ধ
ভালো লাগে আবছায়া আলোকাঁপা ছন্দ।
ভালো লাগে ঘুমভাঙ্গা দোয়েলের শিষটি
ভালো লাগে আষাঢ়ের মেঘভাঙ্গা বিষ্টি।
ভালো লাগে বাতাসের চৌদোলে দুলতে
ভালো লাগে স্বপ্নের মায়াজাল খুলতে।
ভালো লাগে পড়ুয়ার গুণগুণ নামতা
ভালো লাগে পেড়ে-খেতে পাকা ফল আম-তা।
ভালো লাগে মার হাতে পিঠে পাটি সাপটা।
ভালো লাগে স্নেহমাখা বকুনির ঝাপটা।
ভালো লাগে হীরে মোতি তারাদের ফুলকি
ভালো লাগে নাটাবনে জোনাকির উলকি।
ভালো লাগে আঙিনায় চাঁদঝরা পান্না
ভালো লাগে রাতভোর পরীদের কান্না।
ভালো লাগে আরো কত বলি শোন সব শেষ
আমার মায়ের মুখে স্নিগ্ধ হাসির রেশ।

বাঘের উপর টাগ

বাণী রায়

পায়ের কাছে জানলাটা কেউ
দাও ত খুলে—
বাপ্‌রে বাপ!
জানলা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে
মস্ত বড় বাঘ—
বাপ্‌রে বাপ্!
লেপ কম্বল চাদর দিয়ে
মাথা থেকে পা মুড়িয়ে
কেটেছে কাল রাত
জ্বরের ঘোরে অক্কা না পাই
বাঘেই এবার করবে কুপোকাৎ
বাপ্‌রে বাপ্!
ভয় ডর সব ভুলে
আবার চোখটা খুলে
সামনে চেয়ে দেখি—কোথায় বাঘ?
তার বদলে দিব্যি ব'সে কাগ
ডাক ছাড়ে গাঁক্ গাঁক্!
কাগেও কি কম জ্বালা?
কান যে ঝালাপালা
সোরগোলে যে করছে বাড়ি মাৎ।
বাঘ ছিল চুপচাপ
কাগ যে করে ভীষণই উৎপাত।
বাপ্‌রে বাপ্!

আকাশ ভরা রোদ থাকলেও ঠাণ্ডাটা জাঁকিয়ে পড়েছে। আগের কদিন বেশ বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, মাঠের জমি তাই ভিজে। কেষ্ট মাঠে লাঙ্গল ফেলেছে। গরিব গেরস্থ ও, অল্প ক-বিঘে জমিতে বর্ষায় চাষ দেয়। তাতে সারা বছরের খোরাক জোটে না। শীতে বৃষ্টি হলে সামান্য একটু জমিতে ফের তাই লাঙ্গল ফেলে। কষ্টে দিন গুজরান করে। ঘরে খেতে তো কম কটা মুখ নেই।

হাল বলদ নিয়ে মাঠের দিকে রওনা হবার আগে ঘরের দোর গোড়া থেকে হাঁক পাড়ল, 'ও হরি বাপ, উঠে পড়, উঠে পড় তাড়াতাড়ি। মুখ হাত ধুয়ে চাট্টি জলপান করে মাঠের দিকে আয়। পুব পারের জমিতে আজ নাঙ্গল দেব। খানিক আমি, খানিক তুই। নে উঠে পড় বাপ, আর ঘুমোস নি।'

হরি, কেষ্টোর ভাইপো। কেষ্টর ছেলেরা এখনও ছেলেমানুষ। বড়দা ওর গত হয়েছে ক'বছর হল। তা হোক, চারদিকের গাঁয়ের সবাই এখনও তার নাম করে। ইদিকে অমন কবিয়াল আর ছিল না। কত যে মেডিল পেয়েছে, এক এক খানা এই হাতের মত বড়।

অমন বাপের ছেলে হরিও হয়েছে তেমন। রাত দিন শুধু বই মুখে বসে থাকে। ইসকুলে ফাস্টো হয়! বড় ম্যাস্টর বলে, ও যদি আরও একটু মন দিয়ে পড়া নেকা করে তবে নাকি হাকিম বনতে পারে! হাওয়া গাড়ি চড়ে বেড়াতে পারে!.

দাদা মারা যাবার সময় ভাইয়ের হাত ধরে মিনতি করে গেছে, ছেলেটাকে পড়াতে। যতধুর পড়ে ততধুর!

সামন্য কবিঘে জমিতে কি আর সবার মুখে অন্ন জোটে? তবুও ইসকুল ছাড়িয়ে দেয় নি কেষ্ট। আহা, একটু কষ্ট করলে যদি ছেলেটা হাকিম হয় তো হোক। তার জন্য রাত দিন প্রাণ পাত করবে কেষ্ট। না হয় দুবেলা দুমুঠো কম খাবে।

অভাব অনটন চারদিকে। বৌদি, হরির মা, তাই বলে, 'তুমি আর কি করবে ঠাকুরপো, যা হবার নয়, তা হবে না। হরিকেও ক্ষেতের কাজে লাগিয়ে দাও। কোথাও জন মজুর খাটুক ও, পড়া লেখা হবে না ওর।'

অভাবে চারদিক অন্ধকার দেখে যখন কেষ্ট তখন মাঝে মাঝে এ কথাই ভাবে ও। সামান্য কবিঘে জমি, তায় খরা বন্যা তো লেগেই আছে। এত গুলো মুখে অন্ন জোটান কি সহজ কাজ। জোয়ান ছোকরা একটা শুধু ঘরে বই মুখে করে বসে থাকবে?

এক আধবার রাগ করে ছেলেটাকে ইসকুল ছেড়ে দেবার কথা যে বলেনি কেষ্ট, তা নয়, বলেছে। তখনই

দেখেছে ছেলেটার মুখে রাজ্যের অন্ধকার নেমে আসে। কোন উত্তর, না দিয়েও মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে পায়ের নখ দিয়ে মেঝের মাটি খোঁড়ে! মনটা তখনি যেন কেমন করে ওঠে কেষ্টর! হাল যে ও বায় না তাও নয়। যখন ইসকুল বন্ধ থাকে তখন হাসি মুখে মাঠের কাজে নামে ও। ধান রোয়, নিড়েন দেয়। এমন কি কখনও হাল ধরে, মই দেয়। কিন্তু ইসকুল খুললে ও যেন এক অন্য মানুষ। তখন ঘরের অভাব অনটনের কোন কথাই যেন আর ওর মনে থাকে না। রোদ দেখে বেলা ঠিক করে ও বলবে, 'ও কাকী শিগ্‌গির ভাত দাও, ইসকুলের আজ দেরী হয়ে যাবে।' আধ কোশ হেঁটে গিয়ে ইসকুল, রোজ যাবে সেখানে। তা রোদ বৃষ্টি ঝড় তুফান যাই হোক না কেন!

ইসকুলের ম্যাস্টারদের উপরে কেষ্টর খুব রাগ। চাষী ঘরের দুঃখ সুখ তারা কি বুঝবে? ওই ছেলেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন তাঁরা, 'ওহে কেষ্টচরণ, তোমার ভাইপোর মাথা খুব সাফ। ওকে পড়াও, পড়াও। দেখো, ও তোমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে!'

কেষ্টর বউ কিন্তু আড়ালে গজ গজ করে। বলে, 'অত বড় ধিঙ্গী বই মুখে করে বসে বসে শুধু গিলবে? ঘরে কি তোমার নক্কি বাধা আছে নাকি? তুমি কি এ গাঁয়ের মহাজন হয়েছ?' ওই আর এক অশান্তি কেষ্টর।

আবার ও ডাক দিল কেষ্ট, 'ও বাপ হরি, ওঠ বাপ ওঠ। এক বার মাঠে আয়। আজ পুব পারের জমিগুলোতে এক চাষ দিতেই হবে। একা পারবনি।'

গরু তাড়িয়ে লাঙ্গল কাঁধে কেষ্ট মাঠের দিকে গেল।

হরির মা এসে চুপিচুপি ডাক দিল ছেলেকে, 'ওঠ, ওঠ, খুড়ো এত করে বলে গেল, তবু যদি তোর হুঁস থাকে। মুখ হাত ধুয়ে মাঠে যা আজ। অন্য কোথাও গিয়ে কাজ নেই।'

আড়মোড়া ভেঙ্গে হরি বলল, 'তা কি করে হবে মা? আজ তো আমি স্কুলের বাড়ি যাব অঙ্ক কষতে। আমার তো বই নেই। ও দেবে বলেছে।'

'কাল যাস বাপ, এখন তো তোর ইসকুল ছুটি। খুড়ো যখন বলে গেছে, তার কথাটা, রাখ আজ।'

'ও আমি পারব না', রাগ করে বলল হরি। 'কাকার আর কি, কাকাকে তো আর পরীক্ষা দিতে হবে না। আমি মাঠে যাব না।'

ছেলেকে ভাল করেই চেনে মা। যা গোঁ ধরবে তাই করবে। ইসকুলে পড়ব তো পড়বই, বই নিয়ে সারাদিন বসে থাকব তো থাকবই। ঘরের কাজে কুটোটি নাড়ব না।

এ নিয়ে খুড়োর কাছে দু চার ঘা খায় ও, তবুও যদি ছেলের কোন হুঁস থাকে। তবে হ্যাঁ, এ কথা বোঝে হরির মা, খুড়ো মনে প্রাণেই চায় ভাইপো তার ইসকুলে পড়ুক। ছেলেটাও বোধ হয় বোঝে সে কথা। সে খানেই ওর জোর!

কিন্তু সংসারের যা হাল। তাতে একটা মানুষের রোজগারে আর কুলান হয় না। তখন ঘরে বসে এক-জন শুধুই গিলবে, তা যেন কেমন খারাপ দেখায়। ছেলে যদি ইসকুল ছেড়ে খুড়োর সাথে মাঠের কাজে বার হয় তবেই যেন হরির মা বেশী খুশি হয়। কিন্তু কে শোনে এসব কথা, কে বোঝে? বই মুখে করে বসে থাকা ছেলে যেন ওর পর হয়ে গিয়েছে!

শান্ত ভাবে মা বলল, 'আজ মাঠে যা বাপ, কাল, খুড়োকে বলে মাপ করে দেব। কাল আঁক কষতে যাস।'

গজ গজ করতে করতে মাঠের পথে এগোলো হরি। কিছুটা গিয়েই নুরুলের সাথে দেখা। মুখ চুন করে হরি বলল, 'আজ মাঠে কাজে যাচ্ছিরে। আজ আর আঁক কষা হবে না। কাল যাব।'

নুরুল হেসে বলল, 'আজ ক'তারিখ মনে আছে তোর? আজ আর ঘরে বসে আঁক কষে কে রে?'

হরি বলল, 'আজ তো তেইশে। তাতে কি?'

শান্তিনিকেতনে মেলা বসেছে, ভুলে গেলি?

'বসুক গে যাক, তাতে আমার কি?' বলল হরি, 'ট্যাঁকে একটাও পয়সা নেই, মেলায় গিয়ে করব কি?'

'আরে নারে, এবারে মেলার ব্যাপার আলাদা' উৎসাহ নিয়ে বলল নুরুল, 'এবারে প্রাণহরা পত্রিকার দোকান হয়েছে মেলায়। কাল দেখলাম, সম্পাদিকা নিজেই সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। সবার সাথে হাসি মুখে কথা বলছেন। বইয়ে সই দিচ্ছেন। আমি পড়া-শুনার ভাল শুনে মাথায় হাত রাখলেন। বললেন, রোজ এসো, বন্ধুদের ডেকে এনো।'

স্কুল লাইব্রেরীতে প্রাণহরা পত্রিকা দেখেছে হরি। পড়ার বই ছাড়া ওই একখানা পত্রিকাই ও মন দিয়ে পড়ে। নুরুলের মুখে এ সব কথা শুনে থমকে গেল ও। কার কাছে শুনেছিল, পত্রিকার সম্পাদিকা নাকি শান্তি নিকেতনেই থাকেন। তবে মনে মনে ও ভাবতো, তাঁরা উঁচু জগতের মানুষ। অনেক দূরের লোক, গাঁয়ের চাষাদের মানুষ বলেই হয়ত ভাবেন না। কিন্তু এসব কি কথা বলছে নুরুল! ও অবিশ্বাসের সাথে বলল, 'ভাগ, 'তুই গুল মারছিস। সম্পাদিকা তোর মাথায়, হাত রাখলেন?'

'না রে ভাই মিথ্যে নয়।' বলল নুরুল, 'আমি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দোকান ভর্তি বই। সব গুলো হাতে নিয়ে দেখতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু কেনার তো পয়সা ছিল না, তাই এগোতে সাহস হচ্ছিল না। তখনি দোকান থেকে লম্বা চুল, ডোরাকাটা সোয়েটার গায়ে, বড় চশমা ওয়ালা একজন ডেকে বললেন, 'এসো খোকা, এসো, যেটা ইচ্ছা সে বই হাতে নিয়ে দেখ। কিনতে হবে না। দেখলেই খুশি হব আমরা। ভয়ে ভয়ে একটা বই তুলে নিয়েছিলাম হাতে। কেউ কিছু বলল না। সেটা রেখে আর একটা, ভেবেছিলাম এবারে নিশ্চয়ই বকবে। কেউ তো বকলই না, উল্টে কত কথা জিজ্ঞাসা করলেন, কি নাম, কোন ক্লাসে পড়ি। কার কার বই পড়তে ভাল লাগে। শেষে ভিতরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসতে বলল। একদম দোকানদার নয় লোকগুলো। আর কি মজার মানুষ। যখন উঠেছি তখন টুপি পরা অল্প বয়স্ক একজন একখানা সাদা কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নাও এটা তোমার। তাকিয়ে দেখি, ইয়াআল্লা, বিলকুল আমার তসবির। নিচে যাঁর নাম সই করা তিনি তো প্রাণহরায় কতই ছবি আঁকেন।'

এতক্ষণ সব কথা যেন গিলছিল হরি। বেশ জোর দিয়ে বলল, 'ভাগ, গুল মারার আর জায়গা পেলি না। প্রাণহরার ছবি আঁকেন যিনি তাঁর আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তোর মত একটা গেঁইয়ার ছবি, এঁকে দেবেন!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়েছেন,' বেশ জোর দিয়েই বলল নুরুল, 'শুধু কি তাই আজ সকালেও আবার যেতে বলেছেন। আজ নাকি একজন কবি আসবেন। তিনি সবার নামে নামে একটা মজার ছড়া লিখে দেবেন। বিনি পয়সায়। চল যাবি তুই? ভারী মজা ওখানে।'

খুড়োর কথাটা তখনি মনে পড়ল হরির। এতক্ষণে রোদে মুখ লাল হয়ে গিয়েছে তার। এত শীতেও ঘাম ঝরছে। বার বার রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে ওর আসার পথ চেয়ে। এলে দুদণ্ড বসে একটা বিড়ি খাবে। কিন্তু

মেলা তো রোজ হবে না। নামি কবিও তো রোজ আসবেন না। স্কুলের লাইব্রেরী থেকে নিয়মিত প্রাণহরা পড়ে ও আর মুকুল। সব লেখককে তাই ওরা চেনে। হয় তো তাঁদের অনেকের সাথেই দেখা হবে ওখানে। তাছাড়া সম্পাদিকা যদি ওর মাথাতেও হাত রাখেন! আর ভাবতে পারল না হরি। বলল, 'চল যাই। কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে কিন্তু, হ্যাঁ।'

মুকুল মহা খুশি হয়ে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এসে যাব তাড়াতাড়ি। এখন চল তো।'

পথ চলতে চলতে হরি স্বপ্ন দেখতে লাগল। কত বই, কত বই! একটাও তার পরীক্ষার পড়ার বই নয়। কুলদারঞ্জনের আশ্চর্য দ্বীপ, আধখানা পড়া হয়েছে ওর। স্কুল লাইব্রেরী থেকে বাকি পত্রিকা গুলো আর খুঁজেই পায়নি ও। যদি সে বই খানা ও দেখতে পায় ওখানে। কেনার তো পয়সা নেই ওর, তবুও হাতে নিয়ে দেখবে ও।

এক পা ধুলো নিয়ে মেলার মাঝখানে প্রাণহরার বই এর দোকানের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল দুজনে। দোকানটা কি সুন্দর করেই না সাজান হয়েছে।

সামনেই শূন্যে একটা মিঠাইর হাঁড়ি উল্টেছে। তা থেকে প্রাণহরা সন্দেশ ঝরে পড়ছে। উপরে একটা কাক উড়ছে! নিচে একটা কুকুর জিভ বার করে লাফিয়ে উঠছে। চারদিকে মজার মজার সব ছড়া লেখা। সামনেই এক গাদা বই আর প্রাণহরা পত্রিকা সাজান। সেখানে ছেলে মেয়ে বাচ্চা বুড়োর ভীড়। ভীড় দেখে ওদের আর এগোতে সাহস হল না। কি করবে ভাবছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমন সময় বুড়ো মত একজন এক খানা মোড়া নিয়ে এসে বললেন ওদের পাশে। বললেন, 'বড্ড শীত তোমাদের দেশে। রোদে বসি একটু।' মোড়া পেতে বসে বললেন, 'তুমিই না কাল এসেছিলে? কি যেন তোমার নাম, ও হো মনে পড়েছে, মুকুল।'

মুকুল ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ল।

'তা এখানে দাঁড়ালে কেন? যাও যাও এগিয়ে যাও। এই তো তোমার কথাই হচ্ছিল কিছু আগে।' বললেন ভদ্রলোক, 'তা সঙ্গে এ কে? বন্ধু? কি নাম তোমার?'

হরিও ভয়ে ভয়ে বলল, 'আজ্ঞে, হরি কর্মকার। আমরা দুজনে এক ক্লাসে পড়ি। এক স্কুলে।'

খুশি হয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'তা হলে তো তুমিও প্রাণহরা পড়?'

এবারে একটু সাহস করেই জোরে মাথা নাড়ল হরি। 'তাহলে তো দোকানে যাঁরা আছেন তাঁদের সবার নামই তোমরা শুনেছ,' বললেন ভদ্রলোক।

'ওঁরা কে? ওঁরা কি লেখক?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' বললেন ভদ্রলোক, 'ওই যে হলদে সোয়েটার পরা ফর্সা মতন, উনি প্রদোষ মুখোপাধ্যায়' হরি বড় বড় চোখ করে বলল, 'চিনি, পশু পক্ষী নিয়ে কবিতা লেখেন। খুব ভাল লাগে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, উনি তো এই মাত্র এলেন কলকাতা থেকে তোমাদের সাথে ভাব করবেন বলে,' বললেন ভদ্রলোক, 'আর ওই যে পাশে দাঁড়িয়ে বক বক করছেন, আস্ত মিঠাই আস্ত মিঠাই চেঁচাচ্ছেন, ওঁর নাম বিজয় বোস।'

'হ্যাঁ জানি, খেলাধুলো নিয়ে লেখেন। বেশ লাগে।' বলল মুকুল, 'আচ্ছা ওঁর সাথে নিশ্চয়ই খেলোয়াড়দের খুব ভাব?'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'সে কথা তুমি নিজেই গিয়ে জিজ্ঞাসা কর ওঁকে।'

হরি জিজ্ঞাসা করল, 'আর ওই যে টুপি মাথায় বসে আছেন, উনি কে?'

ভদ্রলোক কোন উত্তর দেবার আগেই মুকুল বলল, আরে উনিই তো শ্যামবিহারবাবু! কাল আমার তসবির এঁকে দিয়েছেন। ওঁকে আমি চিনি।'

হরি বলল, 'হ্যাঁ পূজা সংখ্যার পোঁটলা গল্পের ছবিটা খুব সুন্দর এঁকেছিলেন। গল্পটাও খুব ভাল। যিনি লিখেছেন তিনি আসেন নি?'

এ কথা শুনে গলায় মাফলার জড়ান এই বুড়ো ভদ্রলোক কেমন যেন মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

এমন সময় গট গট করে এগিয়ে এলেন একজন রাসভারী মহিলা। সবাই তাঁকে দেখে কেমন যেন ঠিকঠাক হয়ে দাঁড়াল। তিনি এসেই হাঁক পাড়লেন,

'সুনীল তুমি বাইরে কেন ? ভিতরে কিজায়গা হচ্ছে না ?'

হরি অবাক হয়ে দেখল, যে ভদ্রলোক এতক্ষণ ওদের সাথে কথা বলছিলেন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন 'না, শীত করছে তাই রোদ পোয়াচ্ছি।' ওমা, এই তাহলে পোঁটলার লেখক। সম্পাদিকা দোকানে বসলেন।

হরি বলল 'ও আপনিই তাহলে পোঁটলা' সুকুল ধমক দিয়ে বলল, 'দূর বোকা উনি পোঁটলা হতে যাবেন কেন, উনি তো লিখেছেন।'

ভদ্রলোক শুধুই মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। পায়ে পায়ে ওরা দুজনেই এগিয়ে গেল সামনে। সুকুলকে চিনতে পেরে সবাই হই হই করে ডেকে কাছে নিয়ে এল। তারপর যা হল তা বলার নয়, বই দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে গেল। সুকুলের কাছে অল্প পয়সা ছিল তা দিয়ে ওরা ঘুগনি রুটি খেল। রোদ পড়তে আবার গিয়ে দাঁড়াল দোকানের সামনে।

ততক্ষণে হরির আশ্চর্য দ্বীপের বাকিটুকু পড়া শেষ, সুকুল শেষ করেছে মাকু। হরি ধরেছে ম্যারাকট দ্বীপ।

কালমতন যে ভদ্রলোক টাকা গুণে নিচ্ছিলেন। যাকে সবাই ভজনদা বলে ডাকছিল, হঠাৎ দুভাঁড় চা আর দুখানা সিঙ্গাড়া এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'নাও খাও।'

ওরা ইতস্তত করতে দেখে ধমক দিয়ে বললেন 'খাও বলছি।'

তারপর একসময় চারদিকে আলো, জ্বলে উঠল। যেন হুঁস ফিরে পেল হরি। হাতের ম্যারাকট দ্বীপ বই খানা নামিয়ে বলল, 'চল এখন যাই সুকুল। রাত হয়েছে।'

পথে নেমে হরি জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁরে তোকে বাড়িতে বকবে না ?'

'কেন বকবে ? সুকুল অবাক হয়ে বলল,' 'আমি তো বাজানকে বলে এসেছি ফিরতে রাত হবে। তাই তো খোরাকির পয়সা দিল। তোর খুড়ো তোকে বকবে ?'

হ্যাঁ। মাথা নাড়ল হরি, 'মারবে রে। আজ ক্ষেতে লাঙ্গল দিতে যেতে বলেছিল।'

সুকুল একটু ভেবে বলল, 'বলিস সুকুল জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছে। অর্ধেক রাগ আমার উপরে পড়বে।'

রেগে আগুন হয়ে ছিল কেষ্ট। দাওয়ায় হুঁকো নামিয়ে রেখে উঠে এসে ধাঁই ধাঁই করে পিটতে লাগল ভাইপোকে। চেঁচাতে লাগল, 'এতদূর আসপদ্দা, আমি মাঠে যেতে বলে গেলুম, তা শোনা হল না ? চোপর দিন ছিলি কোথায় শুনি ? কোন ইস্কুলে আঁক কষতে গেছিলি ? বলি আঁক কষলেই কি ক্ষেতে গম বোনা যাবে ? নাকি ধান মুগ কলাই ফলবে ? চাষির ছেলে, আগে চাষ বাস। তা যদি না হবে তো অমন ইস্কুলে আর আমি তোকে পড়াব নি। বলি মুখে কথা নেই কেন ? যাওয়া হয়েছিল কোথায় শুনি ?'

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে হরি বলল, 'শান্তিনিকেতনের মেলায় গেছিলাম। প্রাণহরার দোকানে। সুকুলের সাথে।'

থমকে থামল কেষ্ট। অবাক হয়ে বলল, 'বলি সেখানে কি সারাদিন মেঠাই গিলছিলে ? তোমার বাবার কবিঘে ক্ষেত-জমি আছে শুনি ? বাড়িতে সবার খোরাক জোটে না, উনি প্রাণহরা গিলছিলেন। আরে হতভাগা চাষির পেটে অত মেঠাই সয় ? পেট ছেড়ে মরে যাবি যে-রে।'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে হরি বলল, 'খাইনি খুড়ো, পড়ছিলাম। পড়তে পড়তে রাত হয়ে গেল।'

কিছুই বুঝতে পারল না কেষ্ট। খানিকটা বোকা বনে মাথায় হাত দিয়ে দাওয়ায় বসে ফরাৎ ফরাৎ করে আবার হুঁকো টানতে আরম্ভ করল। পড়া, পড়া, পড়া, ও ছেলে পড়া ছাড়া আর কিছুই বোঝে না ! আহা হয়ত খুব শক্ত পড়া ছিল। ইনজিরি হবে হয়ত ! তাই পড়তে এত দেরী হল ওর। কি বিদ্‌ঘুটে কথা, মেঠাই খায় না পড়ে, বাপের জন্মে এমন কথা শোনেনি কেষ্ট। তা কত কথাইতো জানে না ও যা জানে হরি। পড়ালেখার আলাদা গুণ। ছিছি, কিছু না শুনে, না বুঝেই ছেলেটাকে অমন গো বেড়ন দিল ও ! চাষা ও চাষাই রয়ে গেল হাতদুটোও ওর চাষার মত ! ও হাতে শুধু গরু লাঙ্গল ধরা যায়। বই পত্তরের মান রাখা যায় না !

ছেলেকে ঘরের ভিতরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল হরির মা। শূন্য দাওয়ার দিকে তাকিয়ে বুক ফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কেষ্ট। পড়ুক পড়ুক, ছেলেটা যত খুশি পড়ুক। শেষ পাশের পড়া পড়ুক। চাষার ছেলে বলে কি ওকে চাষাই হতে হবে? না না, ও জজ ম্যাজিস্টর হাকিম হবে। ফটর ফটর ইংরিরি বলবে। হাওয়া গাড়ি চড়ে বিলিতি সিরকাট খাবে। দশ খানা গাঁয়ের লোকের সামনে বুক ফুলিয়ে কেষ্ট বলে বেড়াবে আমার ভাইপো গো আমার ভাই পো। উঠে পড়ল কেষ্ট। আলিমুদ্দিনের বাড়ির সামনে এসে চাপা গলায় ডাক দিল, 'নুরুল, নুরুল, নুরুল আছিস নাকি বাপ, বাইরে আয় তো। জরুরী কথা আছে।'

নুরুল ভয়ে ভয়ে বাইরে এসে মাথা নীচু করে দাঁড়াল। কিস কিস করে ওকে কি সব কথা জিজ্ঞাসা করল কেষ্ট। কি যেন বুঝে নিল। তারপর অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ভোরবেলা প্রাণহরার দোকান খুলেই ভজন দেখল একজন চাষাড়ে মানুষ দাড়িয়ে আছে সামনে। ওকে দেখেই হাত তুলে নমস্কার করে মাথা চুলকাতে চুলকাতে জিজ্ঞাসা করল, 'আজ্ঞে বাবুমশাই এখানেই তো সেই পড়ার মেষ্টার পাওয়া যায়? না না খাবার নয়। পড়ার। ওই যে কি যেন খুব সোন্দর নাম। কিচ্ছুতে মনে থাকে না। বাবুমশাইরা খান।' বিজয় এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি প্রাণহরার কথা বলছেন?'

এক গাল হেসে সেই, চাষাড়ে মানুষটি বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ গো বাবু মশাই। সারা রাত আর ওই নামটা আমি কিছুতে মনে করতে পারছিলুম না। নুরুলটা এমন বোকা, কোথায় আমাকে পাখি পড়া করিয়ে ছাড়বে, তা নয় বললে, চাচা মনে রেখ খাবার মেষ্টার নয় পড়ার মেষ্টার। শোন কথা! সারা রাত আমার খালি এখোগুড়ের কথা মনে পড়েছে। লজ্জায় মরি আর কি। তা আপনাদের দোকানেই তো পাওয়া যায় সেই বই খানা খুব শক্ত করে লেখা। আমার ভাইপো, নাম আজ্ঞে হরি, ইস্কুলে বেটা বরাবর ফাস্টো হয়। তারও নাকি সারা দিনে শেষ হয় নি পড়া। ওই যে গো খুব মারপিটের বই, বিচ্ছিরি নাম মারকুটে টিপ টিপ। ও বই পড়ে যে কি বিদ্যে হবে কে জানে। আজ্ঞে দেন তাই এক খানা। দশ বিশ টাকা যা দাম লাগে দেব আজ্ঞে। আহা কাল রাতে বেটাকে খামোখা মারলুম। আমি চাষির বেটা চাষি, নেকাপড়ার কি বুঝি? দেন আজ্ঞে ওই মারপিটের, মারকুটে টিপ টিপ।'

প্রদোষ হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার ছেলের বন্ধু কি নুরুল?'

হ্যা গো বাবু মশাই ঠিক ধরেছেন। 'খুশি হয়ে বলল কেষ্ট। 'দুই বেটাই কাল দিন ভোর এখানে ছিল গো। চেনেন নাকি আপনারা?'

এক খানা ম্যারাকট ডীপ হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে খুব খুশি হয়ে কেষ্ট বলল, 'উঃ কি সোন্দর বই, কি

শক্ত। কিছুটি বোঝার উপায় নেই। কত দাম আজ্ঞে?'

দাম দিয়ে আর দাঁড়াল না কেষ্ট। যাবার আগে বলে গেল 'আপনারা বড় ভাল মানুষ গো বাবু মশাইরা। মুকুলের কাছে সব শুনেছি। পেঠিয়ে দেব আবার দুই বন্ধুকে। না না বাবু মশাই এ দুদিন আর আমি হরিকে ক্ষেতের কাজে ডাকব না। কত সব শক্ত শক্ত বই! আর মাত্তোর তো দুটো দিন মেলা, সব বই ওকে বুঝে নিতে হবে না?'

ভোর বেলা ধুলো পায়ে ফিরল কেষ্ট। রাতে বাড়িতে কান্নার রোল উঠেছিল। রাত্রে দুঃখে মানুষটা বিবাগি হল নাকি! যা রাগ মানুষটার।

কাক ভোরে উঠোনে কেষ্টর গলার ডাক শুনে সবার মুখে হাসি ফুটল আবার। কেষ্ট হাঁক পাড়ল, 'হরি, হরি, একবার ঐদিকে আয় তো বাপ।'

ভয়ে ভয়ে হরি সামনে এসে দাঁড়াল।

ওকে হঠাৎ বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কেষ্ট চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করল, 'কাল অত মারনু, তোর লাগেনি তো বাপ? আমি চাষার বেটা চাষা, আমি নেকাপড়ার কি বুঝি বল? আমায় ই বারের মত মাপ করে দে বাপ।'

কোন মতে নতুন কেনা বই খানা হরির হাতে গুঁজে দিয়ে আবেগভরা গলায় কেষ্ট আবার বলল, 'দুদিন আর তোর ক্ষেতে গিয়ে কাজ নেই বাপ। যাস বন্ধুকে নিয়ে ওই যে, কি মেষ্টান্নর দোকানেই যাস। উঃ কি সব শক্ত শক্ত বই। আর কি তার রংএর বাহার। আমার তো চোখ ধেঁধে গেল! পড়িস; সব পড়িস। আমি আর তোকে মারব না বাপ।'

বই হাতে নিয়ে এক গাল হেসে দিল হরি। ওর দু চোখে তখন জলের ধারা নেমেছে।

চোখের রোগে ভোগেন কেন?

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

চোখের রোগে ভোগেন কেন?
বলছি শুনুন বাস্তবেই—
চোখের ব্যারাম সারবে মশাই
খান্ যদি রোজ ঘাস, তবেই।
চশমা—গগল্‌স্ কী প্রয়োজন?
ওসব কিছুই লাগবে না—
নিয়ম মতন ঘাস খেলে রোজ
চক্ষু-ব্যাধি থাকবে না।
ভাবছেন কি মাথার ব্যারাম?
পাগল আমার সমান নাই?
কি বললেন? মানতে পারেন—
মানার মতন প্রমাণ চাই?
হলপ্ ক'রেই বলুন দেখি
হাত রেখে নিজ-বক্ষেতে।
চশমা কভু দেখে কি কেউ
গাই-ছাগলের চক্ষেতে!!

পুজোর চিঠি

ভেবে দেখ এইটি আমাদের নতুন সন্দেশের ২১ তম শারদীয়া সংখ্যা। কি করে এই বিশেষ বছরটাকে চিহ্নিত করা যায় বল দিকিনি। এক তো হচ্ছে ২০ বছরের সন্দেশী ফসল থেকে বাছাই করা সামগ্রী দিয়ে 'সেরা সন্দেশ।' তার কথা তোমরা সকলেই জান। কেউ কেউ হয়তো সাহায্যও করেছ। আর কি করা যায়?

তোমরা প্রত্যেকে এমন কিছু কর না কেন, যা অনেক দিন অনেক লোককে আনন্দ দেবে? যেমন ধর এই ২০ বছরে যে-সব প্রিয় লেখকদের হারিয়েছ—যেমন ধর সুখলতা, পুণ্যলতা, সুবিমল, সুনির্মল থেকে শুরু করে সম্প্রতি হারানো বারীন, ধূর্জটি পর্যন্ত—তাঁদের বিষয়ে ৮-১০ লাইনে খুদে খুদে রচনা লিখে পাঠাও না। একেকজন কিন্তু একজনের বেশি কারো কথা লিখো না। ভালো লেখাগুলো সন্দেশের পাতায় তোমাদের স্নেহের দান হয়ে থাকবে। তাছাড়া সব চেয়ে ভালো দুটি লেখার জন্য তোমাদের বড় সম্পাদিকা দুটি বই পুরস্কার দেবেন। ১২ বছরের নিচেদের একটা, আর বড়দের একটা।

আরেকটা কাজও করতে পার, এই বিশেষ বছরটিতে। এটা বনমহোৎসবেরো বছর। প্রত্যেকে একটি করে গাছ পোঁত না কেন? ছোট বড়; বাগানে বা টবে। যার যেমন সুবিধা। মহীরুহ নয়, ছোট খাটো একটা ফলের বা ফুলের গাছ! পেয়ারা, কি মিষ্টি কুল, কি লেবু কি আতা; কিম্বা এক রকম বেঁটে নারকোল আছে, তিন বছরে ফলে। নয়তো ফুল গাছ, কামিনী, কাঞ্চন, গন্ধরাজ, গোলাপ, বুগানভিলিয়া। জমি থাকলে জমিতে, নয় তো টবে। একজন ফুটোওয়ালা পাথরের থালায় দুব্বোঘাস আর খুদেখুদে নীল গোলাপী বেগুনী হলুদ ঘাসের ফুল করেছিলেন। দেখলে চোখ জুড়োত। কি ভালো বল দেখিনি; সন্দেশ আর সন্দেশীদের মনে করে সুন্দর একটা ফুলের বা ফলের গাছ, রোজ রোজ একটু করে বাড়ছে।

তিন পুরুষের স্মৃতি কি চাট্টিখানিক কথা? গোড়ায় ছিলেন উপেন্দ্রকিশোরদের সৎসাহসীর দল। তারপর আমরা এলাম, তাঁদের হাতে মানুষ হয়ে। ধরতে পার তোমাদের নলিনীদি আর মানিকদা পর্যন্ত। তারো পরে আরো আছে। নেইও কেউ কেউ, বারীন, ধূর্জটি। আর আছ তোমরা। যাদের জন্যেই আমাদের তিন পুরুষের লেখা; যাদের মধ্যে থেকে আরেক পুরুষের লেখকরা বেরিয়ে আসবে। এদের সবার জন্যে গুটি কতক গাছ রোদ জল মাথায় করে, কিম্বা ঘরের আদর-যত্নে, দিনে দিনে বাড়তে থাকবে। ভাবতেও ভালো লাগছে না?

সঃ সঃ

ভবানীপ্রসাদ দে

পুরস্কার

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে ঘরের বাইরে এসে অবাক হয়ে গেল পুন্নি। তাদের কুঁড়েঘরের কোলে একটুকরো জমিতে সব্‌জি আর ফুলের বাগান। তার সামনে দিয়ে সোনার রঙের ধুলোয় ভরা এক সড়ক চলে গিয়েছে। সে পথ কোথা থেকে আসছে, কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে, তা পুন্নিদের ছোট্ট গাঁয়ের দশ ঘর লোকের কেউ জানে না। সে রাস্তায় এমনিতে লোকজনের চলাচল কম। অথচ সেদিন সাত-সকালে সড়ক ধরে সারি দিয়ে মানুষজন চলছে। কেউ যাচ্ছে ঘোড়ায় চেপে কেউ যাচ্ছে উটে চড়ে কেউ বা যাচ্ছে হাতির পিঠে হাওদায় বসে। পালকি চড়ে তামাক খেতে খেতে যাচ্ছেন বাবু মশাই, পালকির খোলা দরজার পাশে পাশে রূপোর গড়গড়া নিয়ে দৌড়ুচ্ছে বাবুর হুঁকো-বরদাজ। পায়ে হাঁটা লোকেরা তো আছেই। সবাই হুড়-মুড় হুদ্দাড় করে এগিয়ে চলেছে।

পুন্নি ঠেলেঠুলে তার বাবাকে ঘুম থেকে তুলে হাত ধরে ঘরের বাইরে এনে বলল, 'ওরা কোথায় যাচ্ছে, বাবা?'

পুন্নির বাবা বলল, 'রাজার বাড়ি।'

পুন্নি বলল, 'অন্য দিন তো যায় না। আজ কেন যাচ্ছে?'

পরশু সকালে যে রাজপুত্রের অভিষেক হবে। দেশ-বিদেশের লোকের নেমন্তন্ন হয়েছে।'

'রাজামশাই আমাদের নেমন্তন্ন করেনি?'

'করেন নি আবার! হাটের দিন রাজার লোক হাটের মাঝে ঢেঁড়া পিটিয়ে বলে গিয়েছে রাজপুত্রের অভিষেকে সব্বারি নেমন্তন্ন। কোনো রকমে রাজধানী পর্যন্ত পৌঁছুতে পারলে হল। রাজবাড়ি থেকে খাসা ভোজ খাওয়ানো হবে, নতুন কাপড়চোপড় দেওয়া হবে। গোটা রাজধানীতে হাজারো মজার আসর বসবে। নাচগান হবে, কবির লড়াই হবে, সং বের হবে, রাতের বেলা আতসবাজি পোড়ানো হবে।'

পুন্নি বলল, 'চল বাবা আমরাও যাই।'

পুন্নির বাবা বলল, 'না মা, সে অনেক দূরের পথ। আজ সারা দিন সারা রাত হাঁটতে হবে, কাল সারা দিন সারা রাত হাঁটতে হবে, তবে যদি পরশু সকালে রাজবাড়ির সদর দরজায় পৌঁছনো যায়। ফেরার সময়েও তেমনি কষ্ট। এদিকে আগাছা জঙ্গলে খেত ভরে গিয়েছে। তুই বরং রাস্তার লোকজন দেখ, আমি ততক্ষণে জমিতে নিড়ান দিয়ে আসি। এই যাব আর আসব।'

মুড়কি দিয়ে চিঁড়ে মেখে পুন্নিকে খাইয়ে নিজে দুটো মুখে দিয়ে পুন্নির বাবা মাঠে চলে গেল।

পুন্নিদের কুঁড়েঘরের সামনে বেশ বড়সড় একটা শিউলি গাছ আছে। অন্য দিন তারই ছায়ায় বসে সে একা একা পুতুল খেলে। পুন্নির মা গাছপালা বড় ভালোবাসত। সে-ই কোথা থেকে শিউলি গাছের চারাটা এনে বসিয়ে দিয়েছিল। পুন্নি যখন খুব ছোট্ট তখন তার মা সান্নিপাতি জ্বরে চোখ বোঁজে। তারপরে পুন্নি একটু একটু করে বড় হয়েছে, বড় হয়েছে তার মায়ের লাগানো গাছটাও। তার বড্ড মায়া গাছটার জন্যে। রোজ বিকেল বেলায় সে গাছটার গোড়ায় জল দেয়। শিউলি গাছে দুটো কাঠবেড়ালি বাসা বেঁধেছে। তারা কেমন নির্ভয়ে পুন্নির হাত থেকে চাল, মটর, বাদাম নিয়ে ছোট্ট ছোট্ট দু'হাত দিয়ে ধরে কুটুর কুটুর করে খায়।

সেদিন আর পুন্নির পুতুলখেলায় মন বসল না। সে খেলনাপাতি সরিয়ে রেখে কুঁড়েঘরের দাওয়ায় বসে চুপটি করে রাস্তার লোকজন দেখতে লাগল। সেই পথে যাচ্ছিল চারজন বুড়োমানুষের ছোট্ট একটি দল। তাদের মধ্যে একজন বলল, 'সেই ভোর রাত থেকে পথ চলছি তো চলছিই। এবার একটু না জিরুলেই নয়। চল, শিউলি গাছটার ছায়ার একটু বসি।'

পুন্নিদের শিউলি গাছের তলায় সতরঞ্চ বিছিয়ে বুড়ো-মানুষ ক'টি বসে পড়ল। তাদের ঝুলি থেকে দাবা খেলার সরঞ্জামপত্র বের হল। খেলা কিছুক্ষণ চলার পর চার বৃদ্ধের আরেকজন ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বলল, 'আর নয়, এবার সব গুটিয়ে ফেলে আবার হাঁটি চল। এখনো কত পথ বাকি তা খেয়াল আছে?'

লোকটি একজন যাদুকর, বাকি তিনজন তার দলের লোক। যাদুবিদ্যায় বুড়োর বেশ নামডাক। রাজপুত্রের অভিষেকে যাদু দেখিয়ে রাজার হাত থেকে সেরা যাদুকরের পুরস্কার নেবে বলে বুড়ো রাজধানীতে যাচ্ছে। বুড়োর সঙ্গীরা খুব অনিচ্ছার সঙ্গে তল্পিতল্পা গোটাতে লাগল। একজন বিরক্ত হয়ে বলল, 'রাজার বাড়ি যাচ্ছ যখন, চল। তবে পুরস্কারের আশা ছেড়ে দাও। শুনেছ তো, সেই অল্পবয়েসী যাদুকরটিও আসছে রাজধানীতে।'

বৃদ্ধ যাদুকর বলল, 'সেদিনের ছোকরা সে, এখনো তার অনেক কিছু শিখতে বাকি। যাদুবিদ্যার সে জানে কী?'

বুড়োর সঙ্গী বলল, 'এখন তো চারদিকে তারই রমরমা। তুমি হাতসাফাই করে খেলা দেখাও, সে জানে সত্যিকার যাদুমন্ত্র। পারো তুমি এই গাছটাকে এক্ষুনি শুকিয়ে দিতে?'

বুড়ো যাদুকর মাথা চুলকে বলল, কাজটা একটু শক্ত বটে। চেষ্টা করে দেখি।'

যাদুকর মন্ত্র পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যে শিউলি গাছটার সব ফুল আর কুঁড়ি ঝরে পড়ল, পাতা-গুলো সব হলদে হয়ে খসে গিয়ে হাওয়ায় ফুরফুর করে উড়ে গেল, গাছটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। গাছের কাঠবিড়ালি দুটো ভয় পেয়ে কিচ্‌মিচ্‌ করতে করতে গাছ থেকে নেমে দৌড়ে পালাল। বুড়োর সঙ্গীরা তারিফ করে বলল, 'রাজার দেওয়া পুরস্কার তুমিই পাবে দেখছি।'

লোকগুলো যেমন এসেছিল, তেমনই চলে গেল। তারা যাবার সময় তাকিয়েও দেখল না পুন্নি তাদের কুঁড়েঘরের দাওয়ায় বসে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। তার মায়ের হাতে লাগানো গাছ, এবারই যে তাতে প্রথম ফুল ফুটেছে!

পুন্নির বাবা জমিতে নিড়ান দিয়ে দুপুরবেলায় বাড়ি ফিরে এল। রাস্তা থেকেই শুকনো শিউলি গাছটা তার নজরে পড়েছিল। সে দৌড়ে এসে পুন্নিকে কোলে তুলে নিল। তারপর তার কাপড়ের খুঁট দিয়ে পুন্নির চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলল, 'পুন্নি কী হয়েছে?'

পুন্নির দু'গাল বেয়ে টস টস করে জল পড়তে লাগল। বাবার কাঁধে মুখটি গুঁজে চুপটি করে বসে রইল সে।

বিকাল হল। রোদ্দুরও রূপালী থেকে সোনালী হল। গৌরবর্ণ, দীর্ঘ, সুপুরুষ চেহারার এক তরুণ মনের আনন্দে গান গেয়ে পথ চলতে চলতে পুন্নিদের শুকনো শিউলি গাছটা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মাথার উপরে শরৎকালের মেঘমুক্ত নীল আকাশ। বিগত বর্ষার জল পেয়ে চারিদিকের যত গাছপালা সবুজ পাতায় আর ফুলে-কুঁড়িতে পরিপূর্ণ। সে সবের মাঝে শুকনো শিউলি গাছটা তার কাছে বড়ই বেমানান ঠেকল। পুন্নির বাবাকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'শিউলি গাছটা শুকনো কেন? এখনই তো শিউলি ফুল ফুটবার সময়।'

পুন্নির বাবা বলল, 'সকালবেলাতেও গাছটা তরতাজা ছিল। দুপুরবেলা ফিরে দেখি শুকনো কাঠ। এদিকে মেয়েটা তো কেঁদেই সারা।'

তরুণ নিজের বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের দিকে তাকাল। নখদর্পণে একে একে ফুটে উঠল পুন্নির মায়ের গাছ লাগাবার ছবি, গাছের গোড়ায় পুন্নির জল দেবার ছবি, বৃদ্ধ যাদুকর মন্ত্র পড়ে গাছ শুকিয়ে দেবার ছবি। তরুণ বলল, 'বুঝেছি। এর কী বিহিত করা যায় দেখি এখন।'

অস্ফুট স্বরে মন্ত্র পড়তে লাগল সে। পুন্নির বাবা অবাক হয়ে দেখল শুকনো গাছ আবার পাতায় পাতায় ভরে উঠল, ডালে ডালে আবার কুঁড়ি ধরল, ফুল ফুটল। কাঠবিড়ালি দুটো আবার ডালে ডালে দৌড়ো দৌড়ি করতে লাগল। পুন্নি তার বাবার কোলে বসে খলখল করে হেসে উঠে বলল, 'ফুল! আবার ফুল ফুটেছে!'

পুন্নির বাবা পুন্নিকে কোল থেকে নামিয়ে রেখে দু'হাত জোড়া করে তরুণ পথিককে বলল, 'আপনি মানুষ নন, সাক্ষাৎ ভগবান।'

তরুণ বলল, 'আমি সামান্য এক যাদুকর। রাজপুত্রের অভিষেকে ভোজবাজি দেখাতে যাচ্ছিলাম। সেরা যাদুকরকে রাজা মশাই নিজের হাতে পুরস্কার দেবেন কিনা!'

ততক্ষণে সূয্যি পাটে গিয়েছে। আকাশে রূপোর থালার মত বিরাট চাঁদ উঠেছে। তার আলোয় চতুর্দিক যেন গলানো রূপোয় মোড়া হয়ে গেল। পুন্নিদের সারা বাগানটা ফুটন্ত শিউলির সুবাসে ভরে উঠল। পুন্নি তার বাবার কোলে চড়ে ফুল তুলল, তারপর ফুলের মতই কোমল দু'হাত বোঝাই করে ফুল এনে তরুণ যাদুকরকে বলল, 'ফুল নাও।'

যাদুকর পরম যত্নে পরম আদরে পুন্নির হাত থেকে ফুলগুলি নিয়ে নিজের কপালে ঠেকাল, তারপর সেগুলি উত্তরীয়ের খুঁটে বেঁধে আবার চলা শুরু করল। পুন্নির বাবা বলল, 'আপনি উল্টো পথে যাচ্ছেন! রাজার বাড়ি যাবার পথ ওদিকে নয়, এদিকে। দেখছেন না, সবাই এদিকেই যাচ্ছে।'

তরুণ যাদুকর মিষ্টি হেসে বলল, 'রাজার দেওয়া পুরস্কার আর আমার চাই না। আমি তার চেয়েও দামী পুরস্কার পেয়ে গিয়েছি।'

ছড়া

গোবিন্দপ্রসাদ দত্ত

ব্যাঙ বলে ব্যাঙানীকে
টাকা পেয়ে কুড়িয়ে,
মিথ্যে খরচ ক'রে
কেন ফেলি ফুরিয়ে
এক টাকা দিলে পাবো
পুরো দু'টো আধুলি—
তাই দিয়ে গ'ড়ে নেব
দু'জনের মাদুলি।

সলিল মিত্র

সবুজ সবুজ গা খানি তোর
ঠোঁটটি বড়ো লাল!
ও টিয়ে তুই মুখটা বুজে
থাকবি কতো কাল?
'কেষ্ট কেষ্ট হরে হরে'
যতই আমি শেখাই তোরে
ঠুকরে দিতে আসিস্ কেবল
খুকুর রাঙা গাল!

চুনী দাশ

কলমের কেরামতি
দুনিয়ার সেরা অতি
ওর কাছে কিছু নয় যুদ্ধ;
সব করে তুচ্ছ
ময়ূরের পুচ্ছ
রামধনু তাই বাক-রুদ্ধ!!

দুঃখী এক উষ্ট্র

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সাহারাতে মরুর মাঝে
ছিল একটি উষ্ট্র
মনের দুঃখে একদিন সে
ভজল জরাথুষ্ট্র

দুঃখটা তার শুনলে পরে
লজ্জা পাবে বিশ্ব।
উষ্ট্র বলেই কাব্যলোকে
ছিল সে অস্পৃশ্য।

কাব্যলোকে পক্ষি কুলের
সবার আগে ডাক,
ছন্দে দুলে 'যাচ্ছে তবে'
শালিক বক ও কাক।

দুঃখে রাগে উষ্ট্রের তাই
সদাই পেত কান্না
কবিরা সব ভুলেও কেন
তার দিকে কেউ চান।

এই দুঃখে উষ্ট্র শেষে
জরাথুষ্ট্র ভজে',
পণ করল রাজ্যে তাঁরই
যাবে পদব্রজে।

জরাথুষ্ট্র কোন রাজ্যে
দিয়েছিলেন দেখা,
তাই খুঁজতে উষ্ট্র এবার
চলল একা একা।

পেরিয়ে এল সাহারা আর
পার হল নীলনদ।
এইখানেতেই যাত্রা কিন্তু
করতে হল রদ।

কি করবে এইবার সে
ভেবে না পায় দিশা।
যেতে হ'লে চাই যে আগে
পাসপোর্ট আর ভিসা।

সে সব এখন পাবে কোথায়?
যুদ্ধ গেছে লেগে',
ইরাক ইরাণ এ ওর পানে
কামান যাচ্ছে দেখে',

লোহিত সাগর তীরে উষ্ট্র
তাইত বসেই থাকে।
মিল মিলিয়ে কবি কি কেউ
তরিয়ে দেবে তাকে?

একটি ছেলের গল্প

মহাশ্বেতা দেবী

আমাদের বাড়ির গল্প তো এই কাগজের পড়ুয়ারা ভালবাসে, তাই এবার বাড়ির একটা ছেলের গল্পই বলা যাক। মনে হচ্ছে আমার ভাই ফল্গুর কথা কখনো বলিনি। বলব বলে ভাবি নি কখনো কিন্তু জুলাই মাসে ফল্গু এমন একটা বিচ্ছিরি ব্যবহার করে বসেছে যে তার কথা না বলে উপায় নেই।

খুব ছোটবেলায় ফল্গু মানে সর্বজীবে অপার দয়া। পথ থেকে রোগা ঠ্যাংঠেঙে কুকুরছানা নিয়ে আসত। তারপর কাতর গলায় বলত, দেখ মা! ঠিক হরিণের মত দেখতে।—রোগা কুকুর। ঘেয়ো বেড়াল সব এনে যত্ন করে সারিয়ে তুলতো। খুব ছোটবেলায় শীতকালে লালমাছদের "শীত করছে" বলে জল থেকে তুলে বাবার চুরুটের ছাই বোঝাই ছাইদানে ছাই চাপা দিয়ে রেখেছিল।

ফল্গুর জীবে দয়ার জন্য একবার, শান্তিনিকেতন থেকে ছুটিতে বাড়ি গিয়ে দেখি বাবা ও মার দুই দলে অসম্ভব মনকষাকষি চলেছে। বাড়ির কাজের লোকজন, গয়লা, চাপরাসী, রিকশাঅলা, এদের মধ্যে কেউ বাবার দলের কেউ মার দলের লোক ছিল।

কি হয়েছে ভেবে পাই না। বাবা বাড়ির কারো সাথে কথাই বলছেন না, কিন্তু সব কথা না কি নন্দন রিকশাঅলা আর বরমদেও চাপরাশীকে বলছেন।

শেষে বোঝা গেল ফল্গুর জীবে দয়ার কারণে ঘটক-বাড়ির সব বিগড়ে গেছে। বাবাকে কে যেন 'খাবেন বাবু' বলে দুটো মুরগি আর মোরগ দিয়েছিল। ফল্গু অশ্রু ছিল বুধ সাহেবের বাচ্চার মতো হাঁ করে কান্না। ফলে তাদের খাওয়া হয় নি। মার বক্তব্য, এরা স্বাভাবিক মুরগি নয়। কেন না তারা এত ডিম পাড়ে, সব ডিম ফুটে এত বাচ্চা হয় কে কবে দেখেছে। সে সব বাচ্চাও না কি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বড় হয়েছে এবং মুরগির জন্য তৈরি ঘরে থাকে না। যেখানে ইচ্ছে ডিম দিচ্ছে।

ফল্গু বলতে চেষ্টা করল, ওরা যে যার জায়গায় ডিম দেয়, সেটা মনে রাখা মানুষদের দরকার।

তেমন সুবিধে হল না। কেন না আমি নিজেই দেখলাম, বাবার সযত্নে রাখা তিন মন ওজনের গরম ওভার কোটের প্রতি পকেটে ডিম আর মুরগি। কয়েকটা অতি হতচ্ছাড়া। তারা আড়ায় টাঙানো লেপ তোশকের ওপর উড়ে বসে এবং ডিম পাড়ে। স্বভাবতই ডিম সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে ভেঙে যায়। আয়নাটেবিলের দেরাজে ডিম, ছবির পেছনে ডিম, আলনায় টাঙানো শার্ট পাঞ্জাবী পরতে যাও, পকেটে মুরগির বাচ্চা।

বেশ কয়েক মাস ধরে কোথায় মুরগি, কোথায় ডিম, তাই বের করার জন্যে সকালে ভীষণ দৌড়দৌড়ি করতে হল। আর, মোরগ ভোরে ডাকে, এ একেবারে গল্প কথা। রাতে সবাই মনে করল, ঘুমোবে। সারা রাত ধরে কিছুক্ষণ বাদ বাদই মোরগরা এক সঙ্গে বিকট ডেকে ওঠে। ফল্গুর মুরগিরা কাপ ডিস কাচের গেলাস ভাঙত এও দেখেছি।

যা হোক, এ সব মুরগি একদিন রাণীখেত অসুখে সবাই ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে মরে গেল

এখন মনে পড়ছে মুরগিগুলো ডিমে তা দিত না। তখন বর্ষার বৃষ্টিতে ফল্গু মুরগিদের চিত করে স্নান করাত। বলত, কুড়কি ছাড়াচ্ছি।

এর পরেও কেউ মুরগি পোষে? একা ন্যাদোশই

কয়েক বছর ধরে যথেষ্ট জ্বালিয়েছে। মা তো স্পষ্টই বলতেন যে এ বাড়িতে পাখি পশুও যেন কেমন হয়ে যায়।

এরপরেও ফল্গু যথারীতি এক বুড়ো মুরগি তুলে আনল পথ থেকে। মিসেস দলুই নামে এক বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী, যাঁকে আড়ালে সবাই "দলি বুড়ি" বলত তাঁরই মুরগি।

ফল্গুর হাতে পড়ে তিন দিনে সে মুরগি তাজা হয়ে সকলকে ঠুকরে বেড়াতে থাকল। মুরগিকে ফল্গু 'দলি বুড়ি" বলেই ডাকত। সবাই শুনতে পেত, এই দলি বুড়ি ঘর নোংরা করল, তাড়া দে, তাড়া দে। এই দলিবুড়ি পালাচ্ছে, ধর্ ধর্। —সব মিসেস দলুইয়ের কানে পৌঁছত। বলা বাহুল্য তিনি খুসি হতেন না। তাঁকে তো আর বলা যায় না ঠাকুরদার জ্ঞান বাবুর মতো দেখতে একটা বেড়ালের নাম ছিল 'জ্ঞান বাবু' আর 'জ্ঞানবাবুর ঠ্যাং ভাঙব' শুনে তিনি বেজায় রেগে বেরিয়ে গিয়েছিলেন আমাদের বাড়ি থেকে।

মুরগিপুরাণকে বোকা বানিয়ে দলিবুড়ি বহুদিন বাঁচে, বহু ডিম পাড়ে।

ঠিক ওপরের বোন কঞ্চি ছোটবেলা ছিল বেজায় পাজি। রাঙাদির চেলা ভালোমানুষ ফল্গু একবার এক ঝুড়ি ডিম নিয়ে উধাও। দেখা গেল, খাটের নিচে ও ডিমের ঝুড়ির ওপর উপুড় হয়ে আছে।

কি করছ ফল্গু?

রেশম রেশম চুল, অবাক আবাক চোখ, ফল্গু বলল, ডিমে তা দিচ্ছি। বাচ্চা হবে।

একবার দুজনকে সাবান দিয়ে স্নান করিয়ে ধপধপে জামা পরিয়ে ভাত খাইয়ে ঠিক দুপুরে আমি পাশের বাড়ি গল্পের বই আনতে গেছি। আসার সময় দেখি রাস্তায় উলটানো পিচের ড্রাম থেকে দুটো কালো ভূতের ছানা বেরোচ্ছে। কঞ্চির বুদ্ধিতে দুজনে পিচের ড্রামের রহস্য সন্ধানে ঢুকেছিল। আমি পিচে ভরা কান গুলো অব্দি জুত করে ধরতে পারিনি। তারপর একবার কেরোসিনে চোবাই, তারপর গরম জল আর সাবানে। বহুকাল দুজনের ভুরু আর চুলে পিচ লেগেই ছিল।

এই ফল্গু এর পরেই খেলাধুলো, সাঁতার, বক্সিং, ব্যবসায়ীদের জমা নেওয়া গাছের আম চুরি, স্কুল পালিয়ে গঙ্গা সাঁতরে চরের তরমুজ চুরি—এই সব ভালো ভালো কাজ করতে করতে বড় হয়ে গেল।

বড় হয়ে সে যে এমন পাকা গপ্পিদাদা হবে তা সত্যি ভাবা যায় নি।

কলকাতায় একদিন, আমার ছেলে বাপ্পা তখন খুব ছোট; ফল্গু এসে বলল, শীগগির চলো। ভীষণ বিপদ।

—কি হয়েছে!

—ছোড়দা আর বসন্তদার কাণ্ড (বসন্ত চৌধুরী অবুর বন্ধু ছিল) কি বলো ত? রথের মেলা থেকে দুটো হরিণ এনে ছাতে তুলেছে।

—হরিণ? জ্যান্ত হরিণ?

—নইলে কি?

—ছাতে তুলল কি করে?

—তরকারি দেখিয়ে দেখিয়ে।

—তারপর?

—তারপর তারা ছাতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ছাদ

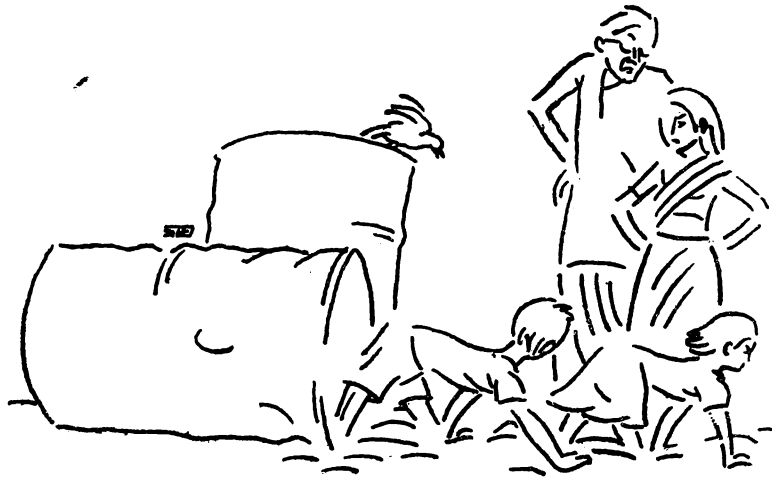

ভেঙে যাচ্ছে। বাড়িওয়ালা চেঁচাচ্ছে, ছোড়দাকে তুলে দেবে।

আমি বাপ্পাকে বগলদাবা করে দৌড়লাম। গিয়ে কি দেখলাম বল তো? ছাতের কোণে ছোট্ট একটা ফুলের টব তার ওপর এত টুকুন দুটো মাটির হরিণ।

অবু বলল, দিদি! একপাদা চিংড়ি মাছ এনেছি। চাকরটা যাতা রাঁধে। ফল্গুকে বললাম, দিদিকে নিয়ে আয়।

এই হল ফল্গু। সেদিন ডিগবয়ে গেছে, শ্বশুর বাড়ির কে এক ভদ্রলোক, আগে বহরমপুরে ছিলেন। তিনি আমাদের পাড়ার যার কথাই জিজ্ঞেস করেন, ফল্গু বলে তিনি তো নেই।

—সে কি?

—মারা গেছেন

—অমুক লোক?

—আমেরিকা গেছেন।

হয় মারা গেছেন। নয় আমেরিকা গেছেন। যাঁদের কথা হচ্ছে তাঁদের বয়েস সত্তর থেকে বিরাশি। কেউই মারা যান নি, আমেরিকাও যান নি। ফল্গুর যুক্তি হল, বেঁচে আছেন বললেই সাতগুষ্টির খবর জানতে চাইবেন, তার চেয়ে এ রকম বলাই ভালো।

ওর চূড়ান্ত বজ্জাতির কথা সহকর্মীদের কাছে শুনলাম। ও কাজ করত পাটনায়। বিহারের অন্য কোথাও গেছে। ফল্গুরা কয়েকজনই ওষুধ কোম্পানীর লোক আর সেখানে এক ওষুধ দোকানের চার ভাই এসেছে। বিহারের নিয়ম হল, কেউ মারা গেছে খবর পেলেই মাথা ন্যাড়া করতে হয়। ফল্গু ওদের দেখেই বলেছে, আরে আরে এ কি দেখছি? আপনারা তো সর্বনাশ করেছেন?

—কেন ঘটক বাবু?

—আরে, পাটনায় আপনাদের কাকা—! ওঃ, কি দুঃখের কথা। তা আপনারা মাথা কামান নি?

এ সবরটেগেলে মহা নিন্দে। চার ভাই মাথা কামিয়ে নাপিত নিয়ে বাড়ি দৌড়ল। ব্যাস, দু বছরের ছেলে থেকে আশি বছরের বুড়ো সবাই মাথা কামিয়ে ফেলল। পরদিন ভোরেই ফল্গু হাওয়া। পাটনা থেকে ওষুধব্যবসায়ী কাকার তো আসার কথা। তিনি এলেন। তারপর বোঝো সে কি ব্যাপার। অনেকগুলো ন্যাড়ামাথা লোক শুধু ঘটকবাবুকে খুঁজছে।

আমাকে একবার লিখেছিল, কলকাতা যেতে পারছি না। পাটনা এরোড্রোমে হাজার হাজার নীলগাই ঢুকে পড়েছে। আমি তোমায় চিঠি লিখছি আর চারপাশে তারা ঘুরছে।

কে জানে সেটা সত্যি না গল্প। এখন হঠাৎ মনে পড়ল, ছোট্ট বাপ্পা চিড়িয়াখানা যেতে চায়। ফল্গু বলছে

আগে খরগোশদের ব্যবস্থা হোক, তবে যাবে। এখন চিড়িয়াখানায় ভীষণ গণ্ডগোল।

—কি হয়েছে রাঙামামা?—বন্তু তো বাপ্পার চোখে বীরপুরুষ। তার সব কথাই সত্যি।

—দ্বীপে খরগোশরা ছিল, বুঝলি তো? কালো রাজ হাঁসদের পিঠে চড়ে তারা চলে এসেছে আর সারা বাগানে ছড়িয়ে পড়েছে। খরগোশদের ব্যাপার তো? বাচ্ছা হয়েছে তাড়াতাড়ি আর চিড়িয়াখানায় ঢোকাই যাচ্ছে না। পায়ের নিচে খরগোশ চাপা পড়বে না?

বন্তুর চেয়ে বড়ো গপ্পিদাদা আমি তো আর দেখি নি। আর দেখব বলে মনেও হয় না। এমন মানুষও আর দেখি নি, যে হাজির হলেই রোজকার একঘেয়ে দিনটা উৎসবের দিনের মতো আনন্দ ঝলমল হয়ে ওঠে।

বাকি দিনগুলো নিয়ে কি করা যাবে, ভেবে পাচ্ছি না।

শব্দই ব্রহ্ম

অভীক বসু

ঝিক ঝিক রাজধানী
ভোঁ—ভোঁ—বিমানে
সাইরেন বেজে ওঠে
অসময়ে কি মানে
সাপুড়ের বাঁশিতে
নাচে নাগ নাগিনী
আমিরের কণ্ঠে
সুমধুর রাগিনী।
কার বিয়ে—ব্যাণ্ডপার্টি?
ম্যারাকাস ঝুন ঝুন!
শন্ শন্ ঝড় ওঠে
ঐ আসে টাইফুন

সত্যটা ফাঁস করি
তাই এত বড় গলা
দাসবাবু শোনালেন
অদ্ভুত হরবোলা।

লোকটা

নারেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ওই যে লোকটা খুব তাগড়া জোয়ান,
এক্ষুণি গিয়ে ওকে পাকড়িয়ে আন।
অ্যাটলাস খুলে ওকে জিজ্ঞেস কর
কোন দেশে খুঁজে পাব আক্রা শহর।

গোঁফ জোড়া বড় ওর, মোম দিয়ে মাজা,
ওকে তাই দেওয়া চাই মোক্ষম সাজা।
চ্যাংদোলা করে ওকে নিয়ে আয় ধরে,
নাস্তানাবুদ কর প্রশ্নের ঝড়ে।

ফুজিয়ামা কত উঁচু, ও কি সেটা জানে?
কিংবা 'প্রাতিস্কি' শব্দের মানে?
বলুক তো দেড় রতি সোনার কী দাম,
বিজ্ঞানী শব্দুর বেড়ালের নাম।

কিচ্ছু জানে না, শুধু গোঁফের বাহার
দেখিয়ে বেড়ানো কাজ নেই আর।
ধরে এনে কাতুকুতু লাগা ওর পেটে,
তারপরে আমি দেব গোঁফজোড়া ছেঁটে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

কোগ্রামের মধু পণ্ডিত

বিপদে পড়লে লোকে বলে 'ত্রাহি মধুসূদন।' তা কোগ্রামের লোকেরাও তাই বলত। কিন্তু তারা কথাটা বলত মধুসূদন পণ্ডিতকে। বাস্তবিক মধুসূদন ছিল কোগ্রামের মানুষদের কাছে সাক্ষাৎ দেবতা। যেমনি বামনাই তেজ, তেমনি সর্ববিদ্যা বিশারদ। চিকিৎসা জানতেন, বিজ্ঞান জানতেন, চাষবাস জানতেন, মারণ উচাটন জানতেন, তাঁর আমলে গাঁয়ের লোক মরত না।

সাঁঝের বেলা একদিন কোষ্ঠকাঠিন্যের রুগী কালাবাবু মধুসূদনের বাড়িতে পাঁচন আনতে গেথেন। গিয়ে দেখেন গোটা চারেকমুশকো চেহারারগোঁফওয়ালা লোক উঠানে হ্যারিকেনের আলোয় খেতে বসেছে আর মধু-গিন্নী তাদের পরিবেশন করছে। লোকগুলোর চেহারা ডাকাতের মতো, চোখ চারদিকে ঘুরছে, পাশে পেল্লায় পেল্লায় চারটে কাঁটাওলা মুগুর রাখা।

মধু পণ্ডিত বগলাবাবুকে বলল, ওই চারজন অনেক দূর থেকে এসেছে তো, আবার এক্ষুণি ফিরে যাবে, অনেকটা রাস্তা, তাই খাইয়ে দিচ্ছি।

কথাটায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। মধু পণ্ডিতের বাড়ির উনুনকে সবাই বলে রাবণের চিতা। জ্বলছে তো জ্বলছেই, অতিথিরও কামাই নেই, অতিথি সৎকারেরও বিরাম নেই। বগলাবাবু বললেন, তা ভাল, কিন্তু আমারও অনেকটা পথ যেতে হবে, পাঁচনটা করে দাও।

ময়ু পণ্ডিত বলে, আরে বোসো, হয়ে যাবে এক্ষুণি। ঐ চারজন বরং তোমাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে যাবেখন। শচীনখুড়োকে নিতে এসেছিল, তা আমি বারণ করে দিয়েছি।

বগলাবাবু চমকে উঠে বললেন, শচীনখুড়োকে কোথায় নেবে! খুড়োর যে এখন তখন অবস্থা! এই তিনবার শ্বাস উঠল।

সেইজন্যই তো নিয়ে এসেছিল!

বগলাবাবু ভাল বুঝলেন না। পাঁচন তৈরি হল, লোকগুলোও খাওয়া ছেড়ে উঠল।

মধু পণ্ডিত হুকুম করল, এই, তোরা বগলাদাদাকে একটু এগিয়ে দিয়ে যা।

বগলাবাবু কিন্তু—কিন্তু করেও ওদের সঙ্গে চললেন। বাড়ির কাছাকাছি এসে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা বাবারা?

লোকগুলো পেন্নাম ঠুকে বলল, আজ্ঞে যমরাজার দূত, প্রায়ই আসি এদিক পানে। তবে সুবিধে করতে পারি না। ওদিকে যমমশাইকেও কৈফিয়ৎ দিতে হয়। কিন্তু মধু পণ্ডিত কাউকেই ছাড়ে না।

সেই কথা শুনে কালাবাবু ভিরমি খেলেন বটে, কিন্তু

মধু পণ্ডিতের খ্যাতি আরো বাড়ল।

হরেন গোঁসাইয়ের টিনের চালে একদিন জ্যোৎস্না-রাতে ঢিল পড়ল। হরেন গোঁসাই হচ্ছেন গাঁয়ের সবচেয়ে বুড়ো লোক বয়স দেড়শ বছরের কিছু বেশী। ডাকাবুকো লোক। একদিন লাঠি হাতে বেরিয়ে এসে হাঁক দিলেন, কে রে?

মাথা চুলকোতে চুলকোতে একটা তালগাছের মতো লম্বা সুড়ুঙ্গে চেহারার লোক এগিয়ে এসে বলল, আপনারা কী অশৈরী কাণ্ড শুরু করলেন বলুন তো! গাঁয়ের ভূত যে সব শেষ হয়ে গেল।

হরেন গোঁসাই হাঁ করে চেয়ে থেকে বললেন, তার মানে?

মানে আর কী বলব বলুন। ভূতরা হল আত্মা। চিরকাল ভূতগিরি তো তাদের পোষায় না। ডাক পড়লেই আবার মানুষের ঘরে গিয়ে জন্ম নিতে হয়। মানুষ মরে আবার টাটকা ছানা-ভূতেরা আসে। তা মশাই এই কোগ্রামে আমরা মোট হাজার খানেক ভূত ছিলাম। কিন্তু গত দেড়শ বছর ধরে একটাও নতুন ভূত আসেনি। ওদিকে একটি একটি করে ভূত গিয়ে মানুষ হয়ে জন্মাচ্ছে। ইদানিং তো একেবারে জন্মের মড়ক লেগেছে আজ্ঞে। গত মাস খানেকে এক গোপাটে চুয়াল্লিশটা ভূত গায়েব হয়ে গেল। সর্দার রাগারাগি করবে।

তা আমি কী করব?

লজ্জার মাথা খেয়ে বলি, আপনারা কি সব মরতে ভুলে গেছেন? আপনার দিকে তাকিয়ে ছিলাম বড় আশা নিয়ে। কিন্তু আপনিও বেশ ধড়িবাজ লোক আছেন মাইরি। তা মধু পণ্ডিতের ওষুষ না খেলেই কি নয়?

ভারী অসন্তুষ্ট হয়ে ভূতটা চলে গেল। কিন্তু ক'দিন পরই এক রাতে গাঁয়ের লোক সভয়ে ঘুম ভেঙে শুনল, রাস্তা দিয়ে এক অশরীরী মিছিল চলেছে। তাতে স্লোগান উঠছে, মধু পণ্ডিত নিপাত যাক! নিপাত যাক্। নিপাত যাক। এ তল্লাটে ঝুটা হ্যায় ভুলো মৎ, ভুলো মৎ, এ এলাজি ঝুটা হ্যায়! ভুলো মৎ। ভুলো মৎ। মধুর নিদান মানছি না। মানছি না। মানব না।

কিন্তু মাস তিনেক পর একদিন সুড়ুঙ্গে ভূতটা খুব কাঁচুমাচু হয়ে মধু পণ্ডিতের বাড়িতে হাজির হল সন্ধে বেলায়।

মধু তামাক খাচ্ছিল, একটু হেসে বলল, কি হে শুনলাম আমার বিরুদ্ধে খুব লেগেছো তোমরা।

পেন্নাম হই পণ্ডিতমশাই, ঘাট হয়েছে।

কী হয়েছে বাপু?

আজ্ঞে এক আমি আর সর্দার ছিলাম গতকাল অবধি। আর সব জন্মের মড়কে গায়েব হয়ে গেছে। কিন্তু কাল রাতে একেবারে সাড়ে সর্বনাশ, আমাদের বুড়ো সর্দার পর্যন্ত মানুষের ঘরে গিয়ে জন্ম নিয়ে ফেলেছে। আমি একেবারে একা।

একা তো ভালই, চরে বরে খা গে। এখন তো তোর একচ্ছত্র রাজত্ব।

জিব কেটে ভূতটা বলল, কী যে বলেন! একা হয়ে এক প্রাণে আর জল নেই। বড্ড ভয় ভয় করছে আজ্ঞে। খেতে পারছিনা, শুতে পারছিনা। রাতে শেয়াল ডাকে প্যাঁচা ডাকে, আমি কেঁপে কেঁপে উঠি।

তা তোর ভয়টা কিসের?

আজ্ঞে, একা হওয়ার পর থেকে আমার ভূতের ভয়ই হয়েছে, যমরাজার পেয়াদাগুলোও ভীষণ ট্যাটন। একা পেয়ে যাতায়াতের পথে আমাকে ডাণ্ডস মেরে যায়।

ঠিক আছে, তুই বরং আমার সঙ্গেই থাক।

সেই থেকে সুড়ুঙ্গে ভূতটা মধু পণ্ডিতের বাড়িতে বহাল হল।

একদিন জমিদার কদম্বকেশরের ভাইপো কুন্দকেশর এসে হাজির। গম্ভীর গলায় বললেন, ওহে মধু, একটা কথা ছিল।

মধু তটস্থ হয়ে বলল, আজ্ঞে বলুন।

আমার বয়স কত জানো?

বেশী বলে তো মনে হয় না।

কুন্দকিশোর একটা শ্বাস ছেড়ে বলেন, পঁচানব্বই, বুঝলে ? পঁচানব্বই । আমার কাকা কন্দর্পকেশরের বয়স জানো ?

খুব বেশী আর কী হবে ?

তোমার কাছে বেশী না লাগলেও, বেশীই । একশ পঁচিশ বছর ।

তা হবে ।

আমার কাকা নিঃসন্তান তা তো অন্তত জানো ;

মধু পণ্ডিত মাথা চুলকে বলে, তা জানি, উনি গত হলে আপনারই সব সম্পত্তি পাওয়ার কথা ।

জানো তাহলে ? বাঁচালে, তাহলে এও নিশ্চই জানো কাকার সম্পত্তি পাবো এরকম একটা ভরসা পেয়েই আমি গত সত্তরটা বছর কাকার আশ্রয়ে আছি, জানো একদিন জমিদার হয়ে ছড়ি ঘোরাব বলে আমি ভালো করে লেখাপড়া করিনি পর্যন্ত ? একদিন জমিদারনী হবে এই আশায় আমার গিন্নী এখনো বুড়ো বয়সেও যে বাড়িতে ঝি-এর অধম খাটে, তা জানো, আমার বড় ছেলের বয়স পঁচাত্তর পেরিয়েছে ! শোনো বাবু, কাকা মরুক এ আমি চাই না । কিন্তু হক্কের মরাই বা লোকে মরছে না কেন ? মরলে আমি কান্নাকাটিও করব, কিন্তু মরবে কোথায় । আর নাই যদি মরে বাপু, তবে অন্তত সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে তো যেতে পারে । বৈরাগী হয়ে পথে পথে দিব্যি বাউল গান তো গেয়ে বেড়াতে পারে । তা তোমার ওষুধ কি সে সবেও বারণ নাকি ? তোমার নামে লোকে যে কেন মামলা করে না সেইটেই বুঝিনা ।

মধু পণ্ডিত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আপনার বয়স হয়েছে জানি, কিন্তু তাতে ভয় খাচ্ছেন কেন ? বয়স তো একটা সংস্কার মাত্র, শরীর যদি সুস্থ সবল থাকে মানসিকতা যদি স্বাভাবিক থাকে তবে আপনি একশো বছরেও যুবক । উল্টো হলে পঁচিশ বছরেও বুড়ো । এই আপনার কাকাকেই দেখুন না । মোটে তো সোয়া শ বছর বয়স দেড়শ পেরিয়েও দিব্যি হাঁক ডাক করে বেঁচে থাকবেন ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুন্দকেশর বললেন, বলছ ?

নির্যস সত্যি কথা ।

কুন্দকেশর চলে গেলেন । কিছুদিন পর শোনা গেল, তিনি বিরানব্বই বছরের স্ত্রী আর পঁচাত্তর বছরের বড় ছেলের হাত ধরে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছেন ।

সন্ধে হয়ে এসেছে, প্রচণ্ড বর্ষা নেমেছে আজ । মেঘ ডাকছে । ঝড়ের হাওয়া বইছে । এই দুর্যোগে হঠাৎ মধু পণ্ডিতের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল । দরজা খুলে মধু একটু অবাক, বেশ দশাসই চেহারার একজন মানুষ দাঁড়িয়ে । গায়ে ঝলমলে জরির পোশাক । ইয়া গোঁপ ইয়া বাবরি, ইয়া গালপাট্টা, মাথায় একটা ঝলমলে টুপি, তাতে ময়ূরের পালক গায়ের রং মিশমিশে কালো বটে, কিন্তু তবু লোকটি ভারী সুপুরুষ ।

মধু পণ্ডিত হাতজোড় করে বললেন, আজ্ঞে আসুন আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না ।

আমি তোমার যম । জলদগম্ভীর স্বরে লোকটা বলল ।

শুনে মধু পণ্ডিত একটু চমকে উঠল । খুন করবে নাকি ? কোমরে একটা ভোজালিও দেখা যাচ্ছে । কাঁপা গলায় মধু বলল, আজ্ঞে ।

লোকটা হেসে বলল, ভয় পেওনা বাপু । আমি ভয় দেখাতে আসিনি । বরং বড় ভাইয়ের মত পরামর্শ দিতে এসেছি । তুমি এই গাঁ না ছাড়লে আমি কাজ করতে পারছি না । আমি যে সত্যিই যমরাজা তা বুঝতে পারছ নিশ্চই ।

মধু দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে উঠে মাথা চুলকে বলে, আপনার আদেশ শিরধার্য । কিন্তু শ্বশুরবাড়িটা কোথায় ছিল তা ঠিক মনে হচ্ছে না ।

বলো কি ? যমের চোখ কপালে উঠল, শ্বশুরবাড়ি লোকে ভোলে ?

আজ্ঞে অনেক দিনের কথাতো, দাঁড়ান গিন্নিকে জিজ্ঞেস করে আমি, বলে মধু পণ্ডিত ভিতরবাড়ি থেকে ঘুরে এসে একগাল হেসে বলে এই বর্ধমানের গোবিন্দপুর । কিন্তু গিয়ে লাভ নেই । আমার শ্বশুর শাশুড়ি গত হয়েছেন ।

যমরাজ বলেন তা শালাশালীরা তো আছে ।

ছিল, এখন আর নেই ।

তাদের ছেলে মেয়েরা সব।

আজ্ঞে তারাও গত হয়েছে। তস্য পুত্র-পৌত্রাদিরা আছে বটে। কিন্তু তারাও খুব বুড়ো। গিয়ে হাজির হলে চিনতে পারবে না।

যমরাজ গম্ভীর হয়ে বললেন তোমার বয়স কত মধু?

আজ্ঞে মনে নেই।

যমরাজা ডাকলেন চিত্রগুপ্ত! মধুর হিসেবটা দেখ তো

রোগা সুড়ুঙ্গে একটা লোক গলা বাড়িয়ে বলল, আজ্ঞে দুশো পঁচিশ।

ছিঃ ছিঃ মধু! যমরাজ অভিমানভরে বললেন এতদিন বাঁচতে তোমার ঘেন্না হওয়া উচিত ছিল। থাকগে আমি তোমাকে কিছু বলব না। পৃথিবীর নিয়ম ভেঙে চলছ চলো। মজা টের পাবে।

যমরাজ চলে গেলেন। মধু কিছুদিনের মধ্যেই মজা টের পেতে লাগলো।

হয়েছে কি, মধুর ওষুধ যে শুধু মানুষ খায় তা নয়। রোদে শুকুতে দিলে পাখিপক্ষী খায়, ঘরে রাখলে পিঁপড়ে খেড়ে ইঁদুরেও ভাগ বসায়। তাদেরও হঠাৎ আয়ু বাড়তে লাগল। কোগ্রামের মশা মাছি পর্যন্ত মরত না। বরং দিন দিন মশা, মাছি, পিঁপড়ে, ইঁদুর ইত্যাদির দাপট

বাড়তে লাগল। আরো মুস্কিল হল জীবানুদের নিয়ে। কলেরা রুগীকে ওষুধ দিয়েছে মধু, তা সে ওষুধ কলেরার পোকাও খানিকটা খেয়ে নেয়। ফলে রুগীও মরে না, কিন্তু তার কলেরাও সারতে চায় না। সান্নিপাতিক রুগীরও সেই দশা, কোগ্রামে ঘরে ঘরে রুগী দেখা দিতে লাগল। তারা আর ওঠা হাঁটা চলা করতে পারে না। কিন্তু ওষুধের জোরে বেঁচে থাকে।

এক শীতের রাতে আবার যমরাজা এলেন।

মধু! কী ঠিক করলে?

আজ্ঞে লোকে বড় কষ্ট পাচ্ছে।

তা তো একটু পাবেই। এখনো বলো যমের সঙ্গে পাল্লা দিতে চাও কিনা।

শশব্যস্ত দণ্ডবত হয়ে মধু পণ্ডিত বলে, আজ্ঞে না। তবে এখন যদি ওষুধ বন্ধ করি তবে চোখের পলকে গাঁ শ্মশান হয়ে যাবে। একশ বছর বয়সের নীচে কোনো লোক নেই।

যমরাজা গম্ভীর হয়ে বলেন, তা একটা ভাববার কথা বটে। তোমার এত প্রিয় গাঁ তাকে শ্মশান করে দিতে কি আমারই ইচ্ছে? তবে একটা কথা বলি মধু। যেমন আছো থাকো সবাই। তবে গাঁয়ের বাইরে মাতব্বরি করতে কখনো যেওনা। আমি গণ্ডি দিয়ে গেলাম। শুধু এই কোগ্রামের তোমরা যতদিন খুশি বেঁচে থাকো। অরুচি যতক্ষণ না হয়। তবে বাইরের কেউ এই গাঁয়ের সন্ধান পাবে না। কানাওলা ভূত চারদিকে পাহারা থাকবে। কোনো লোক এদিকে এসে পড়লে অন্য পথে তাদের ঘুরিয়ে দেবে।

মধু দণ্ডবত হয়ে বলে, যে আজ্ঞে।

সেই থেকে আজও শোনা যায়, কোগ্রামের কেউ মরে না। কিন্তু কোথায় সেই গ্রাম তা খুঁজে খুঁজে লোকে হয়রান। আজও কেউ খোঁজ পায়নি।

জানাজানি

সুনির্মল চক্রবর্তী

সাইকেল জানে শুধু বন্ বন্ ঘুরতে,
ঘুড়ি জানে আকাশেতে খুশি মনে উড়তে।
পুকুরের জলে মাছ জানে খেলা করতে,
দিদি জানে ভাইটির কানখানা ধরতে।
শিস্ দিয়ে কত গান পাখি জানে গাইতে,
মাঠ জানে একা একা রোদ্দুরে নাইতে।
ছাগলেরা কম কিসে? জানে ব্যা-ব্যা ডাকতে,
পাহাড়টা জানে শুধু একমনে থাকতে।
পাতিহাঁস সারাদিন জানে জলে ভাসতে,
আমি জানি বই ফেলে হো হো হি হি হাসতে॥

নলিনী দাশ

কলকাতায় গণ্ডালু

রাস্তার লোকে হৈ-হৈ করে উঠল। বুলু একটা মৃদু আর্তনাদ করে আমার হাত চেপে ধরল। আমার হৃৎপিণ্ড যেন হঠাৎ থেমে গিয়ে তারপরেই সাংঘাতিক বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। একমাত্র কালুই মাথা ঠাণ্ডা রেখে, এক হ্যাঁচকা টানে মালুকে ফুটপাথের ওপর এনে ফেলল—নইলে যে কি সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে যেত, ভাবলে এখনও বুক কেঁপে ওঠে!

গম-গম করে 'এল নাইন' বাসটা চলে গেল—এখানে ওর থামবার কথাই নয়, এটা সাধারণ বাসের স্টপেজ। বুলু এবার আমার হাত ছেড়ে কালুর হাত ধরল। কৌতূহলী লোকেদের দৃষ্টি আর মন্তব্য এড়িয়ে কালু আমাদের ডেকে নিয়ে আবার রবীন্দ্র-সরোবরের পাশে, জলের ধারে একটা নির্জন বেঞ্চ বেছে নিয়ে বসল; একটা কোয়ালিটি আইসক্রীমের গাড়ি ডেকে সবচেয়ে বড় চারখানা আইসক্রীম কিনে তিনটে আমাদের তিনজনকে দিল আর নিজে একটা খেতে শুরু করল। ততক্ষণে আমরা সবাই কিছুটা সুস্থির হতে পেরেছি, এক চামচ আইসক্রিম মুখে দিয়ে মালু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে প্রশ্ন করল, 'আমাকে অমন আচমকা ধাক্কা দিল কে?'

আমরা তো অবাক! ভেবেছিলাম, মালু নিজেই ভুল করে রাস্তায় নেমেছিল বাসটা থামবে আশা করে। কেউ ওকে ইচ্ছা করে ধাক্কা দিয়েছে কিনা তা তো লক্ষ্য করে দেখিনি!

বুলু বলল 'ও বাবা! এই লেকের জলে কত লোক ডুবে মরেছে—তবে কি'—

কালু ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল, 'বাজে কথা ছেড়ে ভাল করে ভেবে বল—ইচ্ছে করে কেউ তোকে ধাক্কা মেরেছিল, না ভিড়ের মধ্যে দৈবাৎ'—

হাঁড়ি মুখে মালু জবাব দিল 'আহা, আমি বুঝি দুটোর মধ্যে তফাৎ বুঝিনা। যেই বাসটা ঠিক সামনে এসেছে, তখনই শক্ত হাতে কে আমার পিঠে ঠেলা মারল।'

আমি বললাম, 'এই নিয়ে তো তিনবার হল'—

বুলু থাকতে না পেরে আবার বলে উঠল 'কলকাতা শহরে কোনও গুণ্ডা-ডাকাত হঠাৎ মালুর পিছনে লাগতে যাবে কেন? তোরা বুঝতে পারছিসনা, এ হল অন্য ব্যাপার!' এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও আমরা তিনজন হেসে উঠলাম। আমি বুলুকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'কলকাতার ভূতেই বা মালুর পিছনে লাগবে কেন? তা আবার ঠিক দুকুর বেলা?' কালু বলল 'ওসব গাঁজাখুরি কথা ভেবে লাভ কি? সত্যি কি ঘটেছিল, বুঝতে চেষ্টা কর।'

অত বড় একটা করে আইসক্রীম খেয়ে আমাদের সকলেরই মাথা বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল—হোক শীতকাল, হোক বড়দিনের ছুটি, আইসক্রীম খেলে সবসময়ই আমাদের মাথা ঠাণ্ডা হয়, চিন্তাশক্তি বাড়ে।

মালু বলল 'আজ সকাল পর্যন্ত তো কোন সন্দেহজনক কিছুই ঘটেনি। কর্নফিল্ড রোডে মামাবাবুর বাড়ি থেকে

বেরিয়ে রাসবিহারী এভিনিউ ধরে তোদের কাছে যাচ্ছিলাম! মস্ত উঁচু একটা অর্ধেক-তৈরি বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময়ে আমার মাথা লক্ষ করে কে যেন একটা থান ইঁট ফেলল, একটুর জন্য বেঁচে গেলাম।'

কালুর জেরা—'ইঁটটা যে তোর মাথা লক্ষ করেই কেউ ফেলেছিল তার প্রমাণ কি?'

'আমি দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, রোদ এড়াবার জন্য রাস্তা পার হব কিনা—না দাঁড়ালে ইঁটটা ঠিক মাথায় পড়ত!'

'কোথা থেকে পড়ল ইঁট?' জিজ্ঞেস করলাম।

'তা তো লক্ষ করিনি, পাঁচতলা কি ছয়তলা থেকে হবে।'

'কাউকে দেখতে পেলি?' প্রশ্ন করল কালু।

'জনমনিষ্যি ছিল না সেখানে—অবশ্য রাস্তায় লোক জড় হয়ে গেল দেখতে দেখতে। কিন্তু তারাও কাউকে দেখতে পেলনা।'

বুলু বলল, 'তবু তোরা বলবি যে এ ঘটনা স্বাভাবিক?'

'স্বাভাবিক তো বলিনি—পাঁচতলা-ছয়তলা বাড়ির উপর থেকে ইঁট ফেলাটা নিশ্চয় অদ্ভুত—তবে ভূতুড়ে নয়!'

এর পরে দ্বিতীয় ঘটনার কথা আমরা সবাই জানি। গড়িয়াহাটের মোড়ে মালুর সঙ্গে দেখা হতেই সে উত্তেজিত ভাবে আমাদের কাছে ইঁট পড়ার ঘটনা বলেছিল। গড়িয়াহাট রোড ধরে কথা বলতে বলতে লেকের দিকে হাঁটছিলাম, প্রথমে ফুটপাথ ধরেই চলেছিলাম। কিন্তু তারপর জঞ্জালের স্তূপ আর বাড়ি-ভাঙা রাবিশের জ্বালায় রাস্তায় নামলাম। রাস্তায় খুব কম গাড়ি ছিল। আমরাও ফুটপাথ ঘেঁসে হাঁটছিলাম, তবু একটা গাড়ি ফুলস্পীডে প্রায় আমাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল!

মালু বলল 'ভাগ্যিস আমি একবার পিছন ফিরে তাকিয়েছিলাম, নইলে নির্ঘাত চাপা পড়ে মরতাম—আমিই তো পিছনে ছিলাম' 'তোর চিৎকারেই তো আমরা ফুটপাথ ছেড়ে রাবিশের গাদায় চড়ে প্রাণ বাঁচালাম—পিছন ফিরেছিলি কেন?'

'কি জানি, একেই হয়তো আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি বলে'—

'কিরে বুলু? এটাকেও তুই ভৌতিক ব্যাপার বলবি নাকি?' ঠাট্টা করল কালু।

রাবিশের গাদায় হোঁচট খেয়ে পড়ে বুলুর হাত পা ছড়ে গিয়েছিল। রেগে বলল, 'এটা তো স্পষ্টই একটা দুষ্টু লোকের কাণ্ড—আমরা মরতে মরতে বেঁচে গেলাম আর সে কিনা একবার দাঁড়ালো না—গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল!'

'সেটাই তো সন্দেহ জনক,' বলল কালু 'তারপর এই বাস-স্টপেজের ঘটনাটা যদি সত্যি হয়ে থাকে—'

'যদি মানে?' রেগে বলল মালু 'আমি কি মিথ্যে বলছি?'

'চটছিস কেন? যদি সেটা ইচ্ছাকৃত না হয়ে কাকতালীয় ব্যাপার হয়ে থাকে?'

মালু বলল 'কিন্তু কালো গাড়িটা? সেটা ইচ্ছা করে আমাদের চাপা দিতে চেষ্টা করেছিল তাতো আমরা সকলেই দেখলাম।'

'না, তাও দেখলাম না।' বলল কালু। 'আমরা ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তায় নেমেছিলাম। সেখান দিয়ে খুব স্পীডে একটা কালো গাড়ি আসছিল, আর একটু হলেই আমরা চাপা পড়তাম। কলকাতায় এই রকম হামেশাই ঘটে। মালু সবার পিছনে ছিল'—আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ইঁটটাও কি দৈবাৎ মালুর মাথা লক্ষ করে পড়েছিল?'

'এই তো তোদের দোষ—কোন কথা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখতে চাস না। মালু ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছিল। আর তার সামনে একটা ইঁট পড়েছিল, আর একটু হলেই তার মাথায় পড়তো।—এটুকুই হল ঘটনা। মালুর মাথা লক্ষ করেই যে ইঁটটা ফেলা হয়েছিল তার কি প্রমাণ আছে?'

আমি বললাম, 'তুই কি বলতে চাস যে এটাও কাকতালীয় ঘটনা? পরপর তিনটে কাক এসে তিনটে তাল ফেলবে, সেটাই বুঝি স্বাভাবিক।'

খুশি হয়ে কালু বলল 'এটাই তোদের এতক্ষণ বোঝাতে চাইছিলাম। এর মধ্যে কোন একটা ঘটনা থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না। কিন্তু, পরপর তিনটে এরকম ব্যাপার ঘটা অসম্ভব না হলেও অস্বাভাবিক, সুতরাং সন্দেহজনক!—' তাই বলে কয়েক দিনের জন্য কলকাতায় এসে কি ঘরে বসে থাকব? কিছুক্ষণ তর্ক বিতর্কের পর ঠিক হল যে মালু কখনো একা রাস্তায় বেরোবে না। দ্বিতীয়ত, গাড়ি-

ঘোড়ার রাস্তায় সর্বদা ফুটপাথ দিয়ে হাঁটব, যতই অসুবিধা হোক। তৃতীয়তঃ মালু সব সময় মাঝখানে থাকবে, সামনে বা পিছনে নয়। আমাদের সবসময়ে চোখকান খোলা রাখতে হবে, সন্দেহ জনক কিংবা অস্বাভাবিক লোক বা ঘটনা লক্ষ করে দেখতে হবে।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'এখন তাহলে খুব সতর্ক ভাবে আমাদের বাড়ি চল। দুদিন তো আমাদের বাড়িই থাকবি একটু প্ল্যান করে নেওয়া দরকার।'

কালু বলল, 'সমস্ত ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়'—বুলু ভয় পেয়ে তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'এই বুঝি আবার শুরু হল রহস্য আর এডভেঞ্চারের পরিকল্পনা! মালু তিন তিনবার মরতে মরতে বেঁচে উঠল, তবু তোদের শিক্ষা হল না?'

মালু মিষ্টি হেসে তার হাত ধরে বলল 'তিনকে আর চার হতে দেওয়া হবে না রে—সব রহস্যই তো আমরা সমাধান করে ফেলি—এটাও করে ফেলব'—

বুলু তবু মুখ হাঁড়ি করে আমাদের সঙ্গে চলল। রবীন্দ্র সরোবর থেকে বেরিয়ে আমরা সতর্কভাবে সাদার্ন এভিনিউ পার হলাম। তারপর লেক রোড ধরে চললাম। ডানদিকে বিবেকানন্দ পার্ক আর বাঁ দিকে কতগুলো গভর্ণমেণ্ট কোয়ার্টার। এখানে বেশ চওড়া ফুটপাথ থাকায়, রাস্তায় নামার দরকারও হল না। শীতের ছোট বেলা, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। লেকের ধারে বা সাদার্ন এভিনিউতে যারা বেড়াতে বেরিয়েছিল, তারা এখন ফিরছে। বিবেকানন্দ পার্কে যে সব ছেলে-মেয়েরা খেলছিল, তারা হৈ-চৈ করতে করতে বাড়ি যাচ্ছে। সকলেই দিব্যি সহজ আর স্বাভাবিক। তবু কেন বার বার মনে হচ্ছে কে বা কারা আমাদের 'ফলো' করছে, আমাদের ওপর নজর রাখছে! কে বা কেন এমন করবে, সেটা কিন্তু আমাদের অজানা।

* * *

এই ঘটনাগুলো ভাল করে বুঝতে হলে আমাদের বিষয়ে কিছুটা জানা দরকার। কালু, মালু, বুলু আর আমি (টুলু) কাঞ্চনপুরের কাছাকাছি একটা চমৎকার স্কুলে, হোস্টেলে থেকে পড়ি। আমরা রহস্য আর এড-ভেঞ্চার ভালবাসি আর অনেকগুলো রহস্যের সমাধান করেছি বলে বন্ধুরা আমাদের নাম দিয়েছে 'গোয়েন্দা গণ্ডালু' —মানে এক গণ্ডা-লু। আমরা বেড়াতে ভালবাসি তাই আমাদের প্রত্যেকের মামা-কাকা-মাসি-পিসিরা সবাই আমাদের নানা দেশে নেমন্তন্ন করেন। যখন আমাদের বাবা-মারা আটজন দল বেঁধে আমাদের নিয়ে কোথাও বেড়াতে যান, তখন ভারি মজা হয়। আমরা এডভেঞ্চার ভালবাসি বলে এডভেঞ্চারও যেন আমাদের ভালবাসে, যেখানেই যাই, কোন না-কোনো রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ি, মাঝে মাঝে বেশ বিপদে পড়লেও, শেষ পর্যন্ত সব সময়েই বিপদ কাটিয়ে রহস্যের সমাধান করে ফেলি।

এবারে, বড়দিনের ছুটিতে আমাদের চারজনেরই বাবা-মা, আমাদের নিয়ে কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এসেছেন। কর্নফিল্ড রোডে মালুর মামাবাড়িতে মালুরা উঠেছে হালতুতে কালুর বড় মামার বাড়ি কালুরা আছে। যোধপুর পার্কে বড় কাকার বাড়ি বুলুরা আর লেক রোডে জেঠুর বাড়ি আমরা উঠেছি।

আমরা সকলেই অবশ্য আগে কয়েকবারই কলকাতায় এসেছি। কিন্তু এভাবে চারজনে একসঙ্গে বেড়াবার সুযোগ কখনও পাইনি, তাই ভেবেছি পালা করে চারজনে একসঙ্গে বিভিন্ন আত্মীয়ের বাড়ি থাকব। কলকাতার সব দ্রষ্টব্য দেখব, সন্দেশ কার্যালয়ে আর বই মেলায় যাব। কোনো এডভেঞ্চার করার ইচ্ছাই ছিল না আমাদের। কি করে যে এমন একটা বিচ্ছিরি রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়েছি যার মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না! বিপদকে আমরা ভয় পাই না, বরঞ্চ বুদ্ধি খাটিয়ে বিপদ জয় করতে বেশ একটা রোমাঞ্চকর উত্তেজনা অনুভব করি। কিন্তু এবার বিপদটা যে কি ধরনের তা বুঝতেই পারছি না তাই বড় অস্বস্তি বোধ করছি।

জেঠামশাইর বাড়ি রাত্রে খাবার পরে সেই কথাই হচ্ছিল। জেঠিমা দারুণ খাইয়েছিলেন। দোতলায় রাস্তার দিকের ঘর আমাদের চারজনকে ছেড়ে দিয়েছিলেন, সঙ্গে একটা ছোট্ট ঝুল-বারাণ্ডাও ছিল। বাতি নিভিয়ে, সেই বারাণ্ডায় বসে আমরা চুপিচুপি কথা বলছিলাম। আমি বললাম, 'ঘটনাগুলো যদি কাকতালীয় না হয়ে থাকে,

তাহলে তার কোনো একটা কারণ থাকবে তো ?'

এর আগে আমরা যখনই বিপদে পড়েছি, তার একটা নির্দিষ্ট কারণও আমাদের জানা থেকেছে।

কালু একটু চিন্তা করে জবাব দিল, 'নিশ্চয় একটা নির্দিষ্ট কারণ আছে আমরা এখনও বুঝতে পারিনি সেটা কি'—

বাধা দিয়ে মালু বলল, 'বা-রে, আমি মফঃস্বল স্কুলের ছাত্রী, কদিনের জন্য কলকাতায় এসেছি, কাউকে চিনিনা, কারো কোন ক্ষতি করিনি'—

'হয় তো এখনও করিস নি—পরে করতে পারিস'—

'হেঁয়ালি রেখে সোজা ভাষায় বল্ তো'—বলল বুলু।

'কারো কোনো দুষ্কর্মের কথা হয়তো মালু জেনে ফেলেছে। সেটা ফাঁস করে দিলে সে বিপদে পড়বে, তাই আগেই সাবধান হচ্ছে'—

মালু বলল, 'আমাকে ঠাট্টা করিস, এখন তুই নিজেই দেখি একটা গল্প রচনা করছিস! ডিটেকটিভ নভেলে পড়া যায় বটে, দৈবাৎ কেউ কোন খুন বা ডাকাতির সাক্ষী হয়ে পড়ল, তখন তাকেও খুন করে অপরাধী নিরাপদ হতে চাইল —কিন্তু আমি তো ভাই কোনো খুনটুনের সাক্ষী নই—'

'হয়তো দেখে ফেলেছিস কিছু, নিজেই ঠিক জানিস না—'

'কি আবার দেখে ফেলব ?' প্রশ্ন করল মালু।

'রোজই তো কলকাতা শহরে কত কিছু ঘটে যাচ্ছে, ভেবে দেখ কি দেখে ফেলেছিস—কাকে চিনে রেখেছিস—' বলল কালু।

আমি বললাম 'কাল সকালেই না তোদের পাড়ায় সেই সাংঘাতিক ব্যাঙ্ক ডাকাতিটা হয়েছিল—রেডিওতে শুনলাম'—

মালু বলল, 'সে তো আমিও রেডিওতেই শুনেছি—ব্যাঙ্কের ধারে কাছেও যাই নি কোনদিন।'

বুলু বলল 'আর সেই বাচ্চা মেয়ে চুরি যাবার খবর কাগজে বেরিয়েছিল, সেও তো তোদের পাড়াতেই'—

'পাড়াতে তো বটেই, মেয়েটিকে আমি দেখেওছি, বছর পাঁচ কি ছয় বয়স, দিব্যি ফুটফুটে, বাপের নাকি অগাধ টাকা। —কিন্তু, চুরি হতে তো আর দেখিনি, যে ছেলেধরাকে পুলিশে ধরিয়ে দেব ?'

কালু বলল 'সেই গয়নার দোকানে চুরির কথাও ভুলিস না—সেও তোদের পাড়াতেই'—

মালু এবার রেগে গেল 'হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের দুটো বাড়ি পরে সেই গয়নার দোকানে মাঝ রাতে চুরি হয়েছিল। কিন্তু আমি এর কোন চোরকে দেখিই নি'—

'হয় তো দেখেছিস, কিন্তু নিজেই জানিস না যে তুই দেখেছিস'—

'আহা চোরকে যদি চোর বলে নাই বুঝে থাকি, তাহলে তাকে ধরিয়ে দেব কি করে ?'

'হয় তো তারা ভাবছে যে তুই চিনে রেখেছিস, সুযোগ পেলেই পুলিশে দিবি'—

'যত সব আজগুবি কথা! —বড্ড ঘুম পেয়েছে'—

আমাদের সকলেরই ঘুম পেয়েছিল. তাই সভা ভঙ্গ করে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে সন্দেশ কার্যালয়ে গেলাম। নলিনীদির সঙ্গে দেখা হল, তিনি বারবার বলে দিলেন যেন বই-মেলায় সন্দেশ নিউক্লিপ্টের স্টলে অবশ্যই যাই।

জেঠুর বাড়ি থেকে সন্দেশ-কার্যালয় দূরে নয়। আমরা ফুটপাথ ধরে গল্প করতে করতে হাঁটছিলাম। একটা কালো এম্বাসাডার গাড়ি রাস্তা দিয়ে বেশ আস্তে চলছিল, কালু আর মালু জুতোর ফিতে বাঁধবার ছল করে কি যেন পরামর্শ করে নিল একবার।

গাড়িটা লেক রোড ধরে গতি বাড়িয়ে চলে গেল। দৌড়ে বাড়িতে ঢুকেই কালু বলল, 'তাড়াতাড়ি লিখে নে গাড়ির নাম্বার বি এল এ ৪৩২১'—

মালু বলল 'লোকটার চেহারা খুব ভাল করে লক্ষ করেছি—কেমন যেন চেনা চেনা লাগছিল'—

আমিও লক্ষ করেছিলাম—বেশ লম্বা-চওড়া লোক চওড়া কপাল, চোখা নাক, কানদুটো কেমন যেন চ্যাপটা গোছের, বাঁ গালে একটা কাটা দাগ, কতকটা ইংরেজী V অক্ষরের মতন। মালু লোকটার একটা ছবি আঁকল তার খাতার পাতায়—চটপট পোট্রেট আঁকতে ভারি ওস্তাদ সে।

বুলু বলল 'কি দারুন স্মার্ট একটা ছাই রঙের গরম

স্যুট পরেছিল লক্ষ করেছিলি ? আবার নীল কালো ডোরা দেওয়া বাহারে টাই বেঁধেছিল !'

কালু বলল 'পোশাক লক্ষ করে লাভ নেই, চট করে কাপড় পালটে ফেলতে পারে। ডানহাতের আস্তিনের ফাঁক দিয়ে কব্জিতে কাঁকড়ার ছোট্ট উল্কিটা লক্ষ করেছিলি ?'

'আমি দেখেছিলাম, খুব অদ্ভুত লেগেছিল দেখে— এরকম স্মার্ট পোশাক পরা লোক আবার উল্কি কাটে !'

বুলু বলল 'কে-না-কে লোক , তার সম্বন্ধে তোদের এত

কৌতূহল কেন শুনি?'

মালু বলল 'কাল ভাল করে লক্ষ করার সময় পাইনি তবু এক পলকে যেটুকু দেখেছিলাম, মনে হচ্ছে এই লোকটাই—'

বুলু আঁৎকে উঠল—'ওরে বাবা! আজ যদি সত্যি চাপা দিত!'

'ফুটপাথে চড়ে চাপা দিলে রাস্তার লোকে ওকেই মার দিত। আজ ও কেবল আমাদের ওপর নজর রাখছিল। যেই বুঝেছে আমরাও ওকে লক্ষ করছি, অমনি কেটে পড়েছে!'

আমরা স্নান সেরে সামনের ঝুল বারান্দায় বসলাম। জেঠিমার ভাঁড়ার থেকে টুকিটাকি কিছু সংগ্রহ করে খেতে খেতে রাস্তা দেখতে লাগলাম। আজ কালু-মালু ও বুলুর মা-বাবাকে জেঠু খেতে বলেছেন। তারপরে সবাই মিলে বেলুড় আর দক্ষিণেশ্বর বেড়াতে যাওয়া হবে।

রাস্তায় কত রকম লোক চলাচল করে, তাদের দেখে নানা রকম কল্পনা করতে আমাদের খুব ভাল লাগে!

কলকাতার রাস্তায় যতরকম ফেরি-ওলা আর ভিঁখিরি দেখা যায়, এমন আর কোন শহরে দেখিনি! একটি লোক হাঁকতে হাঁকতে যাচ্ছে,' স্লাই—ই—ই—ই,'—আর একজন বলছে 'শ—কাট্‌রে ও—ও—ও!' জানা না থাকলে কে বুঝবে যে একজন জুতো সেলাই করবে আর অন্য জন শিল কাটবে? ধনুকের মত যন্ত্র নিয়ে একটা লোক টংকার দিতে দিতে চলেছে, মুখে কিছুই বলছে না।

সে হল ধুনুরি, লেপ-তোষকের তুলো ধুনে নতুন করে দেবে!

সব চেয়ে বেশি চেঁচামেচি করছে লাল-হলদে ছাপা ঘাগরা আর সবুজ আলোয়ান গায়, ছোট বাচ্চা কোলে একটি মেয়ে। রাস্তায় বা ফুটপাথে যাকে হাঁটতে দেখছে তাকেই বলছে 'আমার অনাথ ছেলেটা দুদিন কিছু খায়নি বাবু—ওমা, এই বাচ্চা ছেলেটাকে কিছু খেতে দাও—'.

পিঠে ঝোলা নিয়ে যে লোকটি হাঁকছে 'বি—ক—রি—ই,' সে কিন্তু কিছু বিক্রি করছে না, পুরোন শিশি-বোতল-কাগজ কিনতে চাইছে!

করতাল বাজিয়ে গান করতে করতে কয়েকটি লোক চলেছে—'অন্ধ, খোঁড়া, বোবা, কালা—বাবু মোদের বড় জ্বালা'! চোখে কালো চশমা, ময়লা আলখাল্লা পরা একটা লম্বা লোক একটা হুইল চেয়ার ঠেলে নিচ্ছে, সেই বোধহয় অন্ধ, একপাশে একটি খোঁড়া লোক আশ্চর্য তাড়াতাড়ি দুটো ক্রাচে ভর দিয়ে চলছে, অন্য পাশে ছেঁড়া শার্ট-পাজামা পরা কুচকুচে কালো, ঝাঁকড়া চুল লোক করতাল বাজাচ্ছে, হুইল চেয়ারে টুপিতে মাথা মুখ প্রায় ঢেকে বসে এক বেঁটে বামন মাউথ অর্গানে আশ্চর্য সুন্দর সুর তুলছে, সঙ্গে দরাজ সুরেলা গলায় গান করছে অন্ধ আর খোঁড়া। এরাও কি ভিখিরি? কই কারো কাছে ভিক্ষা চাইছে না তো? তবে ফুটপাথ থেকে নেমে একটি মহিলা যখন ভিক্ষা দিলেন, বামন একটা টিন বাড়িয়ে সেটা নিয়ে তাঁকে সেলাম ঠুকল দেখলাম। তারপর গানবাজনার তালে তালে পা চালিয়ে দলটা চলে গেল।

তারপরেই এলো মাথায় লম্বা রঙচঙে টুপি আর রঙচঙে অদ্ভুত পোশাক পরা একটা লোক, ঝুমঝুমি বাজিয়ে নেচে নেচে সে কি যেন চানাচুরের গান গাইতে লাগল। তার পিছনে চলেছে ছেলেপিলের দল। কেউ কেউ কিনে খাচ্ছে তার চানাচুর, আবার কেউ কেউ কেবল ভিড় বাড়াচ্ছে।

বুলু বলল 'জানিস, আমাদের যোধপুর পার্কের বাড়ির সামনেও এইরকম সব ভিখিরি আর ফেরিওয়ালা দেখি। এই চানাচুরওলা, অন্ধ-খোঁড়া-বোবা-কালার দল সবাই যায়।' মালু বলল 'কর্নফিল্ড রোডেও ওদের দেখেছি—বেঁটে লোকটি সবসময়ে গাড়িতে থাকে না, মধ্যে মধ্যে অন্ধ লোকটির কাঁধে বসেও মাউথঅর্গান বাজায়—সুন্দর বাজায়। আর ঐ দেখ, কোয়ালিটি, ফ্যারিনি আর কুলফি আইসক্রীমের গাড়ি আসছে—ওরাও সব পাড়াতেই যায়।'

সবে ভাবছি একটা করে আইসক্রীম খেলে মন্দ হত না, এমন সময় বুলু, মালু, কালুর মা-বাবা এসে পড়লেন। খাওয়া-দাওয়া সারতে বেশ বেলা হল। তারপর তিনটে গাড়ি বোঝাই করে কলরব করতে করতে আমরা বেরোলাম। জেঠু আমাদের চার বন্ধুকেই তাঁর নিজের

গাড়িতে নিয়েছিলেন। সমস্ত কলকাতা পার হয়ে যেতে যেতে জেঠু কত কিছু দ্রষ্টব্য দেখিয়ে গল্প বললেন।

দক্ষিণেশ্বর পৌঁছে একটু নিরিবিলিতে গঙ্গার ধারে যেতেই বুলু ফিসফিস করে বলল 'তোরা তো দিব্যি হাসি গল্প করছিস, ওদিকে বাড়ির সামনের ফুটপাতে গজিয়ে ওঠা চায়ের দোকানে গেরুয়া পাজামা-পাঞ্জাবী পরা একটা গুণ্ডা প্যাটার্নের লোক যে বাসা বেঁধেছে, তা জানিস? নিশ্চয় আমাদের ওপর নজর রাখছে—কি হবে?' তার ভয় দেখে আমরা হেসে ফেললাম। হেসে বললাম 'হয় তো বেচারির বাড়িতে চা খাবার সুবিধা নেই তাই সকাল-সন্ধ্যে ফুটপাথে চা খায়—তোর তাতে আপত্তি কেন এত?'

মুখ ভার করে বুলু বলল 'লোকটার চেহারা আর রকম-সকম সুবিধের নয়রে!'

শীতের ছোট বেলা, আমাদের দক্ষিণেশ্বরের মন্দির আর বেলুড় মঠ দেখে বাড়ি ফিরতে ফিরতে অন্ধকার হয়ে গেল। কালু আর মালুর বাবা-মা তখনই তাদের নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জেঠিমা আমাদের আরো একদিন রাখতে চাইলেন। কখন যে তিনি চা তৈরি করে ফেলে-ফেলেছিলেন, খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত স্থির হলো যে এরপর আমরা দুদিন মালুর মামাবাড়ি, দুদিন বুলুর কাকার বাড়ি আর দুদিন কালুর বড়মামার কাছে থেকে তারপর, শেষ দুদিন যে যার নিজের বাড়ি থাকব, তারপর একসঙ্গে কাঞ্চনপুরে ফিরব।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর আবার বাতি নিভিয়ে ঝুল বারান্দায় বসলাম।

আমি বুলুকে ঠাট্টা করে বললাম 'তোর গেরুয়াধারী বন্ধু এখনও চা খাচ্ছেরে'—

কালু কিন্তু গম্ভীরভাবে বলল, 'হাসিস নারে, এর মধ্যে সত্যি কিছু রহস্য থাকতে পারে। আমরা বাড়ি ফেরার সময়ে চোখে পড়ে গেল সেই বি-এল-এ ৪৩২১ গাড়িটা বাতি নিভিয়ে, লেকভিউ রোডের মোড়ের কাছে, একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে—ভিতরে সেই সাহেবি পোশাক পরা মস্তানের সঙ্গে এই গেরুয়াধারীকেও দেখলাম মনে হল'—

মারা

রবি ভট্টাচার্য

মাছি মারা কেরাণীর ঘুষি মারা রোগ
দুষ্টুটা চুপ মারে ভুল করে যোগ।
পাড়ে বসে উঁকি মারে ডোবাটায় বক
লালদার টাকা মারে চাল মেরে ঠক।
সাততালি মারা জামা পরে রামা রায়
পুজোর খিঁচুড়ি মারে ভুঁড়ি ঢাকা দায়।
এখানে ওখানে সাত মুল্লুক মেরে
গপ্‌পো মারার তালে গুপু ঘরে ফেরে।
গরুচোর বাঘ এক গরু নিতে এসে
লজ্জায় মারা গেল ধরা পড়ে শেষে।

মালু বলল, 'আমিও লক্ষ্য করেছিলাম—আমাদের গাড়িটা ওখানে একটু থামতেই গেরুয়াধারী চট করে পাশের গলিতে ঢুকে পড়ল—ওমা একটু পরেই এখানে এসে চা খেতে বসে গেছে!'

বুলু বলল 'ওরে, তবু তোরা পুলিশে খবর দিচ্ছিস না!'

'কি খবর দিবি শুনি? একটা গুণ্ডা প্যাটার্নের লোক আমাদের বাড়ির সামনে বসে চা খায়।'

'আর তার কালো গাড়িওয়ালা বন্ধু যে আমাদের চাপা দিয়ে মারতে চেয়েছিল?'

'সে যে ইচ্ছে করে আমাদের চাপা দিতে চেষ্টা করেছিল সেটা প্রমাণ করা যাবে না, যতক্ষণ না আমরা তার কোনো কারণ আবিষ্কার করতে পারছি। সরকারি রাস্তায় গাড়ি চালানো আর ফুটপাথে বসে চা খাওয়া তো বে-আইনি নয়।' মালু অনেক্ষণ কিছু বলেনি, হঠাৎ বলল 'আমরা কেন কেবল কলকাতার ঘটনাগুলোর কথাই ভাবছি? কত গুণ্ডা আর দুষ্টুলোককে জব্দ করেছি, তারাও তো প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করতে পারে? ঝাউতলার বলাই সাহা, মানালির গর্জন সিং, সবাই তো আমাদের ওপর খাপ্পা হয়ে গেছে!' (সন্দেশ—শারদীয়া সংখ্যা ১৩৮৭, শারদীয়া

সংখ্যা ১৩৮৬) আমরা তার কথায় হেসে ওঠায় মালু খুব রেগে গেল।

পরদিন সকালে আবার দেখি সেই গেরুয়া-পরা লোকটা এসে চায়ের দোকানে জুটেছে। আমাদের চমকে দিয়ে কালু করল কি, সোজা চায়ের দোকানে গিয়ে বলল—'দিন তো দুখানা নানখাটাই—'

দোকানী যতক্ষণে বিস্কুট দিচ্ছে আর কালু পয়সা বের করছে, আমরা খুব ভাল করে লোকটিকে দেখে নিলাম —মা গো! কি বিশ্রী গুণ্ডা প্যাটার্ন চেহারা!! থ্যাবড়া চওড়া নাক, কুচকুচে কালো কদমছাঁট চুল, গায়ের রঙ প্রায় সমান কালো, মুখে আবার বসন্তের দাগ! কি আশ্চর্য, এর ডান হাতেও খুব ছোট একটা কাঁকড়ার উল্কি আঁকা।

মালুর মামী আমাদের আর আমাদের সকলের মা-বাবাকে খেতে বলেছিলেন দুপুরে। কর্নফিল্ড রোডে মালুর মামাবাবুর ফ্ল্যাটটা দোতলার পিছন দিকে। বাড়িতে বসে রাস্তা দেখার সুযোগ নাই। খেয়ে দেয়ে মায়েরা গল্পগাছা শুরু করলেন। মালুর মামাবাবু আর কালু ও মালুর বাবা আমাদের নিয়ে পার্ক সার্কাসের বই মেলায় যেতে চাইলেন। আমরা তো ভারি খুশি। পাঁচ মিনিটে বেরোবার জন্য তৈরি। মামাবাবুরা তখনও রেডি হননি। হঠাৎ রাস্তায় একটা চেনা গানের সুর শুনে আমরা নেমে বাইরে এসেই সোজাসুজি সেই অন্ধ-খোঁড়া-বোবা-কালার দলের সামনে পড়লাম। মালু এগিয়ে গিয়ে তার ব্যাগ থেকে পয়সা বার করে সেই বামনের টিনে দিল, সেও একটা সেলাম ঠুকলো। জোরে জোরে গানবাজনা করতে করতে দলটা হনহনিয়ে চলে গেল। মালু কিন্তু হতভম্ব হয়ে রাস্তার মাঝখানেই দাঁড়িয়ে রইল। কালুও কেমন যেন উত্তেজিত।

'কি হল রে?' জিজ্ঞেস করতেই মালু ফিসফিস করে বলল 'লক্ষ করেছিলি!' উত্তর দিল কালু, 'আমি লক্ষ করেছি' বলল কালু, 'বোবা-কালার চেহারা অবিকল সেই গেরুয়াধারীর মতন!'

'কি যে বলিস আবোল তাবোল'—বলল বুলু 'সে লোকটার তো কালো কদম ছাঁট চুল ছিল। বোবা কালার চুল ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া!' 'ঝাঁকড়া পরচুল কি পাওয়া যাচ্ছে না? তা ছাড়া, ডান হাতের কব্জিতে যে এরও সেই ছোট্ট কাঁকড়া রয়েছে! আমার তো মনে হয়, অমন বিশ্রী চেহারার লোক দুটি হতে পারে না—এ সেই গেরুয়াধারীই।'

মালু বলল, 'অন্ধ লোকটিকেও লক্ষ্য করে দেখলাম। কালো চশমা চোখে, ফিটফাট ভাবে চুল আঁচড়ে, স্যুট-টাই পরালে এই লোকটাই কি মোটর চালক হয়ে দাঁড়াবে না? ঠিক তেমনি লম্বা-চওড়া, চোখ নাক, চ্যাটালো কান। কাঁকড়া দেখতে পাইনি, আলখালার আস্তিনে ঢাকা ছিল।

আমি বললাম 'গেরুয়াধারীর সঙ্গে বোবা কালার আর মোটর চালকের সঙ্গে অন্ধ—অথবা অন্ধ-সাজা লোকটার খুব সাদৃশ্য আছে, মানলাম। কিন্তু, ওরা পরস্পরের ভাইটাইও তো হতে পারে, হয়তো বা যমজ ভাই!'

অধৈর্য হয়ে কালু বলল, 'যমজ ভাই হলেই বুঝি গালের ঠিক এক জায়গায় একরকম কাটা দাগ থাকবে?'

ঠিক তখনই মামাবাবুরা এসে পড়লেন তাই আর কথাবার্তা হতে পারল না।

বই-মেলাতে গিয়ে আমাদের খু-উ-ব ভাল লাগল। বিশেষ করে শিবশঙ্করদার আঁকা দারুন সেই দৈত্য-মার্কা সাইনবোর্ড লাগানো সন্দেশ-নিউক্রিপ্টের দোকান। মজার মজার ছড়া ছবি দিয়ে সাজানো, শিশিরদা, প্রণবদা, ভবানীদার বই বিক্রি—সবই যেন নতুন ধরনের। লেখকদের সকলের অটোগ্রাফ নিলাম। মালুর ইচ্ছা ছিল শিশিরদাকে আমাদের রহস্যময় অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে, সমাধানের কাজে তাঁর সাহায্য নেয়। কিন্তু কালুর ঘোর আপত্তিতে সেটা হতে পারল না। তা ছাড়া, এখানে নিরিবিলিতে কথা বলবার সুযোগই বা কোথায়?

রাত্রে নিজেদের ঘরে বসে অনেক আলোচনা করেও কোনো সমাধান তো পেলামই না। বরঞ্চ নতুন সূত্র আবিষ্কারের ফলে রহস্য যেন আরো ঘনীভূত হল।

প্রথম প্রশ্ন হল, সত্যিই কি নকল-অন্ধ আর বোবা

কালাই গাড়ি নিয়ে আর গেরুয়া পরে আমাদের অনুশরণ করেছিল? যদি তাই হয়ে থাকে, তবে দ্বিতীয় প্রশ্ন হল —কেন? তৃতীয় কথা, ওদের এত দামী গাড়ি আর ভাল ভাল পোশাক আছে, তবু ওরা অন্ধ-খোঁড়া-বোবা কালা ভিখিরি সেজে ছেঁড়া ময়লা জামা কাপড় পরে ঘোরে কেন?

চতুর্থতঃ, সত্যিই যদি ওরা মালুকে খুন করতে চেষ্টা করে থাকে, কেন করেছিল?

বুলু বলল 'খোঁড়া লোকটা মনে হয় সত্যিই খোঁড়া, আর বামন তো বামনই। ওদের নিয়ে ঘোরে কেন এরা?'

কালু বলল, 'হয়তো লোকের সন্দেহ এড়াবার জন্য এদের নিয়ে ভিখিরি সেজে সব জায়গায় সুলুক-সন্ধান নিয়ে বেড়ায়। সুযোগ বুঝলে ষণ্ডা লোক দুটো গিয়ে চুরি ডাকাতি করে।'

আমি প্রশ্ন করলাম 'দুদিন ওরা আমাদের ওপর নজর রাখল তারপর সে চেষ্টা ছেড়ে দিল কেন?'

বুলু 'হয়তো দুদিনেও যখন আমরা পুলিশ ডাকলাম না, তখন মনে করল যে পুলিশে খবর দেবই না! আমি বলি কি—এই সুযোগ নিয়ে পুলিশে খবর দিই চল।'

কালু বলল 'নারে, আমার মনে হয় ওরা বুঝে ফেলেছে যে আমাদের 'ফলো' করতে গেলে আমরা টের পেয়ে যাই'—

মালু উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল 'প্রথম প্রশ্নটাই তোরা এড়িয়ে যাচ্ছিস—লোকগুলি চুরি, ডাকাতি, যাই করে থাকুক না কেন। আমরা তো কেউ তা দেখিনি, তবু আমাদের পিছনে লেগেছিল কেন?—কেন? কেন?'

কালু হেসে ফেলল, বলল 'ওদের না হোক, আমাদের এতে লাভ হয়েছে, আমরা ওদের চিনে ফেলেছি—এবার আমরাই ওদের ফলো করে দেখতে পারি ওরা কিসের তালে ঘুরছে।'

বুলু দারুন ভয় পেয়ে গেল। 'ওরা, সত্যিই কোনো অপরাধ করেছে এমন প্রমাণ না পেয়ে ওদের ফলো করবি কেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম!

কালু বলল, 'বড় মামার এক বিশেষ বন্ধু মিঃ তরফদার পুলিশ বিভাগের বড় অফিসার'—

তার কথা শেষ হবার আগেই বুলু বলে উঠল 'তাহলে তাঁকেই বল না দলটার ওপর নজর রাখতে?'

'তাঁকে জানাতে চাই বলেই তো আমাদের আরো কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করা দরকার।'

পরদিন সকালে কালু কয়েকটা টুকিটাকি দরকারি জিনিস সংগ্রহ করতে মামাবাড়ি গিয়েছিল, ফিরল দারুন উত্তেজিত হয়ে!

ওর বড়মামার বাড়ি হালতুর একেবারে পূর্বপ্রান্তে, বলতে গেলে শহরের বাইরে, সেখানে কলের জল পর্যন্ত নেই, টিউবওয়েল থেকে পাম্প করে জল তুলতে হয়। অথচ কালু নাকি সেই বি· এল-এ ৪৩২১ কালো গাড়িটাকে ওদের বাড়ি পার হয়ে পুব দিকে যেতে দেখেছে, সম্ভবত সেই লোকটাই চালাচ্ছিল।

'সে কিরে? তোর বড় মামার বাড়ির পর তো গাড়ি যাবার উপযুক্ত রাস্তা নেই! দূরে একটা ছোট বস্তি আর দুএকটা পোড়ো বাড়ি ছাড়া বাড়িঘরও তো নেই'! সেই কথাই তো বলছি রীতিমত সন্দেহজনক' বলল কালু।

তার পরদিন আমরা প্রায় সারাটা দিনই চিড়িয়াখানায় কাটালাম। বাঘ-সিংহ-হাতি-বাঁদর-পাখি—সবকিছুই আমাদের দেখতে ভাল লাগে; ফিরতে না ফিরতেই শুনি 'আলেয়াতে' একটা হাসির ছবি এসেছে, মামাবাবু টিকিট কেটে রেখেছেন আমাদের জন্য। পরদিনটাও ঘুরে ঘুরেই কাটল। সকাল সকাল বুলুর বড় কাকার বাড়ি, যোধপুর পার্কে, গেলাম। স্নান খাওয়া সেরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আর বিড়লা প্লানেটেরিয়াম দেখলাম। ময়দানের ধারে হেঁটে পাতাল রেলের কর্ম কাণ্ডও দেখা হল। রাত্রে বড়কাকা আমাদের সকলের বাবা-মাদের নেমন্তন্ন করে ছিলেন। কালু আগে থেকেই বড় মামীকে বলে রেখেছিল নেমন্তন্ন-টেমন্তন্ন করতে হলে যেন রাত্রে করেন, তাহলে আমরা সারাটা দিন বেড়াতে পারি। বেশ নেমন্তন্ন খেয়ে বড়দিনের ছুটিটা কাটছে।

দু-দিন যা ঘুরছি কালো গাড়ি আর অন্ধ-খোঁড়া-বোবা কালাদের কথা ভুলেই গেছি বলতে গেলে। বুলুর বাব

আর কাকা সকালে আমাদের পরেশনাথের মন্দির দেখিয়ে আনলেন। ফিরবার সময়ে অন্ধ-খোঁড়া-বোবা-কালার গানের সুরটা কানে এল, দূর থেকে একবার দলটাকে দেখতেও পেলাম, কিন্তু, তারা বাড়ির সামনের পথে না এসে একটা গলিতে ঢুকে গেল।

কালু বলল 'আজ দেখি অন্ধ বামনটাকে কাঁধে বসিয়ে নিয়েছে'—

আমি বললাম 'অন্ধ তো নকল অন্ধ, কিন্তু বামনটা সত্যিই বামন—ওর ওজন খুব বেশি হবে না'—

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা বিড়লা টেক-নলজিকাল মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। সোজা মিনিবাসে যোধপুরে পার্ক থেকেই যেতে পারলাম। কাঞ্চনপুরে আমরা কত মাইলের পর মাইল হাঁটি, কিন্তু কলকাতার রাস্তার যা অবস্থা হয়েছে আজকাল, হাঁটতে ইচ্ছেই করে না! তাছাড়া এখন আমাদের হাতে সময়ও নাই বেশি।

বিড়লা মিউজিয়ামে নানারকম বৈজ্ঞানিক জিনিস দেখে ভারি ভাল লাগল, বিশেষতঃ কালুর। এখনও ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম দেখতে বাকি। কাল কিংবা পরশু যেতে হবে। ছুটি তো প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।

বাড়ি ফিরতে আমাদের বেশ সন্ধ্যা হল। ততক্ষণে মুখে মুখে খবরটা প্রচার হয়ে গিয়েছিল। সঠিক খবর কেউ অবশ্য জানেনা—সবাই ফিসফিস করে শোনা কথা আর অনুমানের কথা বলে। মূল খবরটা কিন্তু সবাই শুনেছে, মোড়ের বড় বাড়ির পাঁচবছরের ছেলেটিকে নাকি দুপুর থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। ছেলের মা নাকি পাগলের মতন হয়ে গিয়েছেন।

রাত্রে খাবার টেবিলে এই নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছিল। পরে, নিজেদের ঘরে শুতে গিয়েও আলোচনা করছিলাম। কালু বলল 'ষণ্ডা লোকটা বামনটাকে হঠাৎ কাঁধে তুলেছিল কেন?'

আমি বললাম, 'আগেও তো কাঁধে নিয়েছে শুনলাম'—

মালু বলল 'হ্যাঁ, কর্নফিল্ড রোডে যেদিন ওদের প্রথম দেখি সেদিনও বামনটা কাঁধে ছিল'—

আমি বললাম, 'এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছিস কেন?'

অধৈর্য হয়ে কালু বলল, 'তুচ্ছ নয়—মোটেই শুধু খেয়াল নয়—এটা ওদের সাংঘাতিক পরিকল্পনা!'

'কি বলতে চাচ্ছিস, সেটা খুলেই বলনা?'

'কি বোকা আমরা—আগেই বুঝিনি কেন? বামনটা যদি ঐ নকল অন্ধর কাঁধেই ছিল, তাহলে ঠেলাগাড়িতে বসেছিল কে?'

আমি একটু ভেবে বললাম, 'টুপি আর জোব্বা-জাব্বায় ঢাকা কেউ একটা ছিল বলেই তো মনে হচ্ছে'—

হঠাৎ মালু বলল, 'মোড়ের বাড়ির ছেলেটাকেই ওরা ঐ ভাবে চুরি করে নিয়ে গেল নাকি? তারাও তো শুনেছি খুব বড়লোক।'

'বারে, ৫/৬ বছরের ছেলে, ধরতে গেলে চেঁচাবেনা?'

'হয় তো ওষুধ শুঁকিয়ে অজ্ঞান করে নিয়েছিল। ছেলে ধরারা ঐ ভাবেই কাজ করে বলে তো শুনেছি।'

মালু উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, 'কি আশ্চর্য, যেদিন কর্নফিল্ড রোডে বামনটাকে নকল অন্ধর কাঁধে প্রথম দেখি ঠিক সেদিনই তো সেই মেয়েটি চুরি হয়েছিল!'

'সেদিনও কি ঠেলাগাড়িতে কেউ বসেছিল?' বুলু জিজ্ঞেস করল।

'লক্ষ্য করে দেখিনি সেদিন। কিন্তু, এখন ভেবে দেখে মনে হচ্ছে যেন কেউ ছিল।'

'তুই ওদের লক্ষ্য করে দেখেছিলি? মানে, দলটাকে?'

'আমি কিছুক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওদের দেখেছিলাম, কারণ আমার কাছে ওদের খুব অদ্ভুত মনে হয়েছিল। কিন্তু তার আগে তো কোনদিন দেখিনি, দলে কজন আছে, কে কাঁধে আর কে চেয়ারে বসেছে—এসব প্রশ্নও মনে জাগেনি।'

বললাম, 'কিন্তু ওরা তো আর সে কথা জানতোনা, ওরা ধরেই নিয়েছিল যে হয়তো তুই ওদের শয়তানি বুঝে ফেলেছিস, অন্ততঃ কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিস,—তাই ওরা তোর পিছনে লেগেছিল।'

কালু কিছুক্ষণ চুপ করে ছিল—তার এই মূর্তি আমাদের কাছে খুব পরিচিত, ঠোঁট দুটো চাপা, চোখ দিয়ে যেন

আগুন বেরোচ্ছে।

সে বলল 'যত রকম অপরাধ আছে, আমার মনে হয় ছোট ছেলে মেয়ে চুরি করাটা সব চেয়ে জঘন্য অপরাধ। এর কোন ক্ষমা নেই।'

বুলু বলল 'এবার তো অপরাধের প্রমাণ পেলাম – এখনই পুলিশে খবর দে—ওরা কি সাংঘাতিক লোক তারও প্রমাণ পেয়েছিস'—ভয়ে তার গলা কাঁপছিল।

'পুলিশে খবর তো দিতেই হবে, কিন্তু আরো কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণ না দেখাতে পারলে পুলিশ ওদের কিছু করতে পারবে না ওরা ঠিক জাল ছিঁড়ে পালাবে'—

মালু বলল 'দূর থেকে আমাদের দেখেই তো পালালো। কি করে বুঝবে যে আমরা ওদের ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেছি?'

পরদিন সকালে কালুর বাবা এসে আমাদের নিয়ে গেলেন। হালতুতে ওদের বাড়ি পৌঁছেই দেখি বড়মামার কাছে পুলিশ অফিসার মিঃ তরফদার এসেছেন। বুলু তো পারলে তখনই তাঁকে সব খুলে বলে। কিন্তু কালুর রাম-চিমটি খেয়ে মুখ খুলতে পারল না। কেবল কাতর দৃষ্টিতে মালুর আর আমার দিকে চেয়ে রইল।

কালু বেশ চালাকি করে মিঃ তরফদারকেই প্রশ্ন করতে লাগল ছেলেধরার বিষয়ে। তিনি বললেন যে কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের জানা এই দুটি ছেলে মেয়ে ছাড়াও আরো তিনটে ছেলে চুরির ঘটনা পুলিশের কানে এসেছে। সবাই বড় লোকের ছেলেমেয়ে, বাপ-মায়ের কাছে টাকা আদায় করবার জন্যেই এদের চুরি করা হয়। কখনও কখনও ছেলেমেয়েদের ক্ষতি হবার ভয়ে বাপ মা পুলিশকে কোনো খবরই দেন না।

সন্দেহ করা হচ্ছে যে কোন একটা সুচতুর শয়তানের দল এই কাজ করছে। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও তাদের ধরতে পারছে না।

কালু প্রশ্ন করল, 'কেউ যদি গুণ্ডাদলের হদিশ দিতে পারে তাহলে আপনারা তখনই ব্যবস্থা করবেন তো? নাকি এত দেরী করবেন যে পাখি উড়ে পালাবে?'

হো হো করে হেসে উঠলেন বড়মামা কালুর বাবা আর মি, তরফদার নিজেও। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন 'সাধারণ থানায় খবর দিলে তাই-ই হবে, কিন্তু এই ব্যাপারে আমরা একটা বিশেষ গোপন বিভাগ খুলেছি। তারা আরো বেশি তৎপর হবে আশা করতে পারি—'

বড়মামা বললেন 'ওরা যে নিজেরাই গোয়েন্দাগিরি করে তা বুঝি জানেন না?'

কালুর বাবা ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন 'তাই বলে তোমরা এই ব্যাপারে নাক গলাতে যেও না, কলকাতার গুণ্ডারা সাংঘাতিক!'

কত সাংঘাতিক দলকে আমরা কত সাংঘাতিক পরিস্থিতির মধ্যে ধরেছি তা তো তাঁরা পুরোটা জানেন না! মালু মিষ্টি হেসে বলল, 'কি যে বলেন মেসোমশাই, কলকাতায় তো আমরা বেড়াতে এসেছি—'

কালু এরই মধ্যে চুপিচুপি মিঃ তরফদারের কাছে তাঁর বিশেষ দপ্তরের ফোন নম্বর নিজের খাতায় লিখে নিল।

স্নান খাওয়ার পরে বড়রা যখন বিশ্রাম করতে গেলেন, তখনই আমাদের নিরিবিলি কথা বলার সুযোগ হল।

বুড়োর আদর

কালিদাস ভট্টাচার্য

দেখলাম পথে যেতে
এক বুড়ো পার্টি পেতে
বসে আছে গায়ে দিয়ে
পশমী চাদর।
চাদরের তলে ক'াকে
রেখে খোকা খোকা ডাকে?
আমি ভাবি নাতিটিকে
করে সে আদর।
চাদরটা ফেলে দিতে
হাসি এলো মুখটিতে,
চেয়ে দেখি কোলে তার
একটি বাঁদর॥

প্রথমেই বুলুর রাগ। 'মিঃ তরফদারকে সব কথা খুলে বললি না কেন?'

কালু বলল বলব ওঁদের সাহায্য নিতেই তো হবে। কিন্তু এখনও সময় আসেনি।'

'রহস্য করছিস কেন? মৎলবটা তোর কি ভেঙ্গেই বল না!' কালু বলল 'সকাল থেকেই তোদের বলতে চাইছি কিন্তু এর আগে সুযোগই পাইনি! আজই, এখানে আসার সময় ওদের গাড়িটাকে হালতু ছাড়িয়ে পুবদিকে যেতে দেখলাম। মামীর ফাইফরমাশ খাটে সোনা আর মোনা, আমাদের বয়সী দুটি মেয়ে, তারা ঐ দিকের বস্তিতে থাকে, তারা বলছে যে একটা কালো গাড়ি ঐ দিকের পোড়ো বাড়িতে ঢোকে—'

'তবে তো হদিশ পেয়েই গেছিস—এখনই মিঃ তরফদারকে ফোন করে খবর দে—'

'হদিশ আর পেলাম কোথায়? ওরা তো আর গাড়ির নম্বর বলতে পারছে না—'

'তাবলে গুণ্ডাদের ঘাঁটিতে যাবি?' দারুন ভয় পেয়ে বুলু বলল।

'বাড়িটা সত্যিই ওদের ঘাঁটি কিনা সে খবরটুকু তো নিতে হবে। ভয় নেই সাবধানে কাজ করব।'

জানলা থেকে মালু বলল 'ঐ দ্যাখ—গাড়িটা কলকাতার দিকে চলে যাচ্ছে—'

ব্যস্ত হয়ে কালু বলল 'জলদি জলদি তৈরি হয়ে নে—এমন সুযোগ আর পাব না—'

ঝোলাঝুলি ঘেঁটে কালু চারটে আধময়লা রঙীন শাড়ি বার করল, সেগুলো পরে, আমরা সোনা মোনার মতন চুল বেঁধে, ছেঁড়া চটি পায়ে দিয়ে, পাঁচমিনিটে তৈরি! আমাদের দেখলে কে বলবে যে আমরা আধুনিক স্কুলের মেয়ে! সোনা মোনা তখন কাজ সেরে বাড়ি যাচ্ছিল। কালু বলল 'চল তোদের বাড়ির দিকে একটু বেড়িয়ে আসি।'

'এই ভর দুকুরে কোথায় যাবে গো দিদিমণিরা?'

'চুপ চুপ—মা-মাসিমা জেগে ওঠার আগেই ফিরে আসব।'

'সোনা মোনার সঙ্গে আমরা ভাঙ্গা-চোরা রাস্তা দিয়ে চললাম। সোনা মোনার সঙ্গে চেহারা বা পোশাকে আমাদের কোনো তফাৎ নেই—কে বলবে আমরা সেই বিখ্যাত গণ্ডালুদল! পূবদিকে কিছুদূর এগিয়ে সোনা-মোনা ডানদিকে একটা পোড়ো বাড়ি দেখিয়ে, বাঁদিকে ঘুরে নিজেদের বস্তিতে চলে গেল। বাইরে থেকে দেখতে বাড়িটা ভূতুড়ে বলে মনে হয়, পুরনো রঙ ওঠা, শেওলা ধরা। একটাও দরজা জানালা খোলা নেই। কালুকে ঐ বাড়িতে ঢুকতে বদ্ধপরিকর দেখে বুলু দারুন ভয় পেয়ে গেল। কালু বলল তুই আর টুলু ঐ গাছটার নিচে বসে পাহারা দে, আমরা এগোই, যদি কালো গাড়িটাকে বা কোনো সন্দেহজনক লোককে আসতে দেখিস, হুইস্‌ল বাজিয়ে বিপদ-সংকেত জানাবি, আর যদি এক ঘণ্টার মধ্যেও আমরা না ফিরি, বাড়ি গিয়ে মিঃ তরফদারকে ফোন করবি।'

কালু মালুর হাত চেপে ধরে বুলু মিনতি করে বলল 'এরকম বিপদের ঝুঁকি নিসনা—বার বার বলছি'—কালু এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিল আর মালু মিষ্টি হেসে বলল, 'লক্ষ্মী হয়ে বসে থাক, দেখনা আমরা এখনই দিগ্বিজয় করে ফিরে আসছি!'

সত্যি কথা বলতে কি আমারও খুব ইচ্ছা করছিল যে কালু-মালুর সঙ্গে গিয়ে 'দিগ্বিজয়' করি। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এডভেঞ্চার করে আমাদের রীতিমত নেশা ধরে গেছে। কিন্তু বুলু তো একা থাকতে পারবে না। তা ছাড়া বাইরে পাহারায় থাকাটাও যে বিশেষ দরকার। বটগাছ তলায় গিয়ে আমরা মাটিতেই পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম আরাম করে। কতক্ষণ কাটল খেয়ালই ছিলনা। শীতের দুপুরে কেমন যেন তন্দ্রার মতন এসেছিল। বুলু বোধহয় একটু ঘুমিয়েই পড়েছিল। ঘুমের আর দোষ কি, যা রাত জেগে আড্ডা দিই আমরা! হঠাৎ কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতির মধ্যে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। বুলুও চোখ মেলে তাকাল। কি সর্বনাশ! বি-এল-এ ৪৩২১ গাড়িটা যে এদিকে আসছে! তাড়াতাড়ি বুলু আর আমি জোরে হুইস্‌ল বাজিয়ে দিলাম—তারপরে একগলা ঘোমটা টেনে স্থির হয়ে বসে রইলাম। হুইস্‌লের শব্দে নকল-অন্ধ গাড়ি

থামাল। বোবা-কালা রাস্তায় নেমে চারিদিকে তাকাল, —তারও পরনে দেখি সাহেবি পোশাক! বোবা-কালা না আরো কিছু! দিব্যি দুজনে কথাবার্তা বলছিল। গাড়িতে খোঁড়া আর বামনও ছিল।

দুটি গ্রাম্য চেহারার বৌকে গাছতলায় বসে থাকতে দেখে তারা লক্ষ করলনা, আবার গাড়ি চালিয়ে বাড়ির দিকে চলল। এদিকে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আমাদের চক্ষু কপালে উঠল! একঘটা তো প্রায় হয়ে গেছে -- কালু মালু করছে কি? কোনো বিপদে পড়েনি তো? গাড়িটা আর একটু এগিয়ে যেতেই আমরা আবার জোরে হুইস্‌ল্ বাজিয়ে বিপদ-সংকেত দিলাম, তারপর ঘোমটা টেনে বাড়ির দিকে দৌড় লাগালাম।

আমাদের ভাগ্য সেদিন সুপ্রসন্ন ছিল বলতে হবে, বাড়ি পৌছতে না পৌছতেই মিঃ তরফদার এসে হাজির। আমরা তাড়াহুড়ো করে হাঁফাতে হাঁফাতে যা বললাম সেটা মামাবাবু আর মেসোমশাইর বুঝতে দেরী হলেও মিঃ তরফদার এক নিমেষে বুঝে নিলেন। তাড়াতাড়ি আমাদের তৈরি হয়ে নিতে বললেন। পাঁচমিনিটও লাগল না আমাদের আবার টুলু-বুলুতে রূপান্তরিত হতে! মাসিমা আর বড় মামীকে প্রশ্ন করবারও সুযোগ না দিয়ে আমরা মেসোমশাই ও বড় মামার সঙ্গে মিঃ তরফদারের গাড়িতে চড়লাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌছে গেলাম সেই অদ্ভুত পোড়ো বাড়িতে।

ভেবেছিলাস মি তরফদার বুঝি সরাসরি লোকগুলিকে গ্রেপ্তার করবেন। তার বদলে তাঁকে নিতান্ত ভদ্রলোকের মতন সদর দরজায় গিয়ে কলিং বেল বাজাতে দেখে একটু হতাশ হলাম। দরজা খুলল নকল-কালা-বোবা, এখন তার পরনে শার্ট-পাজামা। আমাদের দেখে অবাক হলেও মিঃ তরফদারের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলল। তাঁরা পাড়ার ভদ্রলোক, বিশেষ প্রয়োজনে দেখা করতে এসেছেন শুনে বৈঠকখানায় নিয়ে বসাল। তারপর এল সেই নকল-অন্ধ। এখন তার পরনে ধোপদস্ত ধুতি পাঞ্জাবী আর গায় একটা বাহারে শাল। নিজের নাম বলল সুবল সমাদ্দার।

মিঃ তরফদার ছেলেধরার ব্যাপারের ধার দিয়েও কিন্তু গেলেন না। কসবা-হালতুর কোনো কোনো অঞ্চলে নাকি লুকিয়ে বোমা তৈরি হচ্ছে, স্থানীয় ভদ্রলোকদের নিয়ে একটা প্রতিরোধ সমিতি গড়ে তোলা দরকার, ইত্যাদি নানা কথা ফেঁদে বসলেন। আবদুল, মানে সেই নকল কালা-বোবাকে ইশারায় চা আনতে বলল সেই মোটর চালক সুবলবাবু। তার মুখ দিয়ে যেন মধু ঝরছে! পাড়ার নিরাপত্তার ব্যাপারে তার সাহায্য চাওয়া হয়েছে, তাতেই যেন সে কৃতার্থ হয়ে গেছে। সব রকমে সে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

এদিকে আমাদের বুক দুরদুর করছে। এত দেরী হয়েছে, আমরা এত জোরে জোরে কথা বলছি, তবু কালু আর মালু বেরিয়ে আসছে না কেন? কোথায় তারা?

রূপকথা

বিজন গঙ্গোপাধ্যায়

রূপকথা তো কয়না কথা রূপকথা তো ডাকে
এক যে ছিল ডাইনীবুড়ি গহন বনে থাকে।
পাহাড় ঘেরা বনের মাঝে রাজার আছে বাড়ি
রাজার মেয়ে ঘুমিয়ে আছে ভাঙে না ঘুম তারি।
রাজার দুখে রাণীর দুখে কাঁদছে যত লোক
আসছে কত বদ্যি, ওঝা অসুখ ভাল হোক।
ডাইনী বুড়ি ভালই ছিল মন্ত্র পড়ে শেষে
করলে ভালো রাজকন্যায় রাজার বাড়ি এসে।
বললে রাজা,—'তোমায় দেব যা হোক তুমি চাও'।
ডাইনীবুড়ি বললে,—'শুধু মেয়েটিকেই দাও।'
কাঁদেন রাজা কাঁদেন রাণী দিলেন মেয়ে তারে
ডাইনী বুড়ি হাসল শুধু কেবল বারে বারে।
ফিরিয়ে দিল রাজার মেয়ে একটি চুমো খেয়ে
চলল বুড়ি আপন ঘরে বনের পথটি বেয়ে ॥

বুঝতে পারছি বড়মামা আর মেসোমশাইও ভিতর-ভিতর আমাদের মতই অধৈর্য হয়ে পড়ছেন। মিঃ তরফদারের কিন্তু কোনো ভাবান্তর নেই—সুবল সমাদ্দারের সঙ্গে যেন তিনি ভদ্রতার প্রতিযোগিতা লাগিয়েছেন!

কুড়ি-পঁচিশ মিনিট পরেই কিন্তু বুঝলাম মিঃ তরফদারের কি বুদ্ধি! অনেকগুলি গাড়ি আসার শব্দ পেলাম। আবদুল এসে সমাদ্দারকে কি যেন বলল কানে কানে! রাগ দেখিয়ে সমাদ্দার বলল 'এসব কি ব্যাপার মশাই? এ-ভাবে ভদ্রলোকের বাড়ি চড়াও করে'—

মিঃ তরফদারের তখনও মধুমাখা কথা, মিষ্টি হাসি, 'কিছু না মশাই, একেবারে রুটিন ব্যাপার। এই তো আপনার পাড়ার দু-জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক রয়েছেন - এঁদেরই জিজ্ঞেস করুন না—যে সব বাড়িতে বোমা তৈরি হচ্ছে বলে উড়ো চিঠি পেয়েছি, সে সব বাড়িই সার্চ করে দেখতে হবে ওপর অলার হুকুম।'

সুবল তখনও রাগ দেখাচ্ছে, 'বেশ, করুন সার্চ, মনে রাখবেন. এর জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। নিরীহ নাগরিকদের ওপর হামলা!' মিঃ তরফদার তখনও হাসছেন, 'বলেন কেন মশাই, রোজই তো জবাবদিহি করছি! জানি কিছুই পার না—তবু যখন হুকুম আছে সার্চ করতেই হবে। পুলিশের চাকরিতে ঘেন্না ধরে গেল।'

পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে বড়মামা, মেসোমশাই, বুলু আর আমিও সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। বাড়িটা বেশী বড় নয়। বাইরে থেকে পোড়োবাড়ি মনে হলেও, ভিতরটা ঝকঝকে পরিষ্কার আর সাজানো গোছানো। খোঁড়াকে পাওয়া গেল রান্না ঘরে। বামনও ছিল, পরিষ্কার শার্ট আর হাফপ্যান্ট পরে বসেছিল। কিন্তু কোথাও কালু বা মালুকে দেখতে পেলাম না, চুরি করে আনা ছেলেমেয়েও না। ছ দ থেকে রান্নাঘর, মায় বাথরুম পর্যন্ত খুঁজে দেখলাম, বাড়ির চারধার ঘুরে দেখলাম, কেউ কোথাও ছিল না!

আমাদের যে কি সাংঘাতিক ভয় করছিল, কি বলব! কান্না পাচ্ছিল আর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। বুলু বরফের মতন ঠাণ্ডা হাতে আমার হাত চেপে ধরে রেখেছিল মেসোমশাই আর বড় মামাকেও উদ্বিগ্ন দেখলাম। নির্বিকার কেবল মিঃ তরফদার।

গোটা বাড়িটা ঘুরে দেখার সময়ে যতবার পিছনের দিকে গেছি, মনে হয়েছে যেন একটা খট-খট-খট, ঠক ঠক শব্দ শুনতে পেয়েছি। খেয়াল করে শুনে মনে হল যেন তার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন আছে—আরে এতো মর্স কোড—টেলিগ্রাফের টরে-টক্কার ভাষা! কালু খুব ভাল করে মর্স কোড জানে। আমরাও কিছু কিছু জানি। বুঝলাম কে যেন মর্স কোডে বার বার বলছে S.O.S.—মানে 'বিপদ'—সাহায্য চাই! নিশ্চয় মালু আর কালু—কিন্তু কোথায় ওরা? আমরা তো এ ভাষা ভাল জানি না, বই দেখে দেখে অনেক কষ্টে বুঝতে পারি!

ইতিমধ্যে খোঁড়া লোকটাও খট-খট শব্দ শুনতে পেয়েছে মনে হল। সে আবদুলকে কি যেন বলল, আবদুল গিয়ে সমাদ্দারকে কানে কানে সে কথা বলতেই তার কি রাগ! প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'এবার বিদায় হোন মশাই, আমাকে জরুরি কাজে এক্ষুনি বেরোতে হবে'—

মিঃ তরফদার যেন ইচ্ছে করেই সময় নিচ্ছেন। তখনও শান্তভাবে বলে চলেছেন। 'নিশ্চয়, নিশ্চয় সবই তো দেখলাম - এবার আপনার একটা লিখিত বিবৃতি পেলেই চলে যাব।'

দারুন রেগেও সমাদ্দার কিছু করতে পারল না, তাড়াতাড়ি মিঃ তরফদারকে প্রায় হাত ধরে টেনে বৈঠকখানায় নিয়ে গেল।

ততক্ষণে একটি পুলিশ অফিসারও খট-খট শব্দটা শুনে ফেলেছেন। কোথা থেকে আসছে শব্দটা? মাটির তলা থেকে? মাটিতে বসানো একটা জলের ট্যাঙ্ক দেখে অফিসারটি তার ওপর রুলের ঘা দিয়ে মর্স কোডে জিজ্ঞাসা করলেন 'কোথায় তোমরা? সেখানে যায় কি করে?'

সঙ্গে সঙ্গে অনর্গল খট-খটাখট কথা আসতে লাগল আর তারপরেই তার উত্তর গেল। বুলু আর আমি একবর্ণও বুঝতে পারছিলাম না। তবু কালু-মালুর হদিশ পেয়েছি ভেবে বেশ উৎফুল্ল বোধ করছিলাম।

এর মধ্যে হঠাৎ সমাদ্দারের নির্দেশে আবদুল গিয়ে

গাড়িতে স্টার্ট দিল। কিন্তু পালাবে কোথায়? গেটে পুলিশের কড়া পাহাড়া। মর্স কোডের নির্দেশ অনুসারে ট্যাঙ্কের ঢাকনা খুলতেই তলায় একটা বেশ বড় ঘরের সন্ধান পাওয়া গেল মাটির নিচে! কালু আর মালু দাঁড়িয়ে, তাদের নোংরা কাপড় আরো ময়লা,। চুলে মাথায় ঝুল-কালি কিন্তু মুখে আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি!

কি আশ্চর্য! ওখানে ঢুকল কি করে ওরা?

পরে শুনলাম যে পাতাল ঘরের সন্ধান পেয়ে, ওরা সিঁড়ি ছাড়াই লাফিয়ে ভিতরে নেমেছিল, কোনো বেরোবার পথ পায় নি, ওদিকে ঢাকনাটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল!

পুলিশের লোকে গ্যারেজে একটা মই পেয়ে সেটা এনে লাগাতেই তাদের সঙ্গে আমরাও পাতাল ঘরে নেমে পড়লাম—এত কাণ্ডের পরে কালু-মালুর হাত ধরে একটু না লাফালে চলে কি করে? বাইরে থেকে দেখে মনে হয়েছিল. মাটিতে বসানো অতি সাধারণ একটা জলের ট্যাঙ্ক—যেমন আজকাল অনেক বাড়িতেই থাকে। তলায়, তাজ্জব ব্যাপার, রীতিমতন মাঝারি সাইজের একটা ঘর, মূল বাড়ির তলায় ঢুকে গেছে। শেষ প্রান্তে গোটা দশেক ছোট খাট, গুটি আষ্টেক ছোট ছেলে-মেয়ে ঘুমিয়ে আছে—সম্ভবতঃ তাদের ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে! তাদের মধ্যে কর্নফিল্ড রোডের মেয়েটি, যোধপুর পার্কের ছেলেটি আর মিঃ তরফদারের খবর পাওয়া তিনটি ছেলে তো আছেই উপরন্তু এমন আরো তিনটি আছে, যাদের বাবা মা পুলিশে খবরই দেননি। এখন ছেলেমেয়েদের ফেরত পেয়ে বাবা মায়ের যে কি আনন্দ হবে, ভাবতেও আমাদের ভারি ভাল লাগছে!

সমাদ্দার এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ চলে গেল। তরফদার বললেন যে গত কয়েকমাস ধরে এত ছেলেমেয়ে চুরি যাচ্ছিল কলকাতায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিল। শত চেষ্টা করেও পুলিশ ছেলেধরাদের কোনো হদিশ পাচ্ছিল না, তাই ২০০০, টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল।

আমরা এই ব্যাপারে দারুন প্রশংসা আর অভিনন্দন পেলাম। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যে পুরস্কার ঘোষণা

করা হয়েছিল সেটা আমরা চারজনে ভাগাভাগি করে তো পেলামই উপরন্তু মিঃ তরফদার ব্যক্তিগতভাবে সুন্দর সুন্দর বই উপহার দিলেন আমাদের। সমস্ত খবরের কাগজে আমাদের ছবিও বেরিয়েছিল—তোমরা দেখ নি?

ছোটদের জন্যে বড়দের জন্যে
সুরের ছন্দ মজার ছন্দ
যে রেকর্ড পেয়ে আনন্দ
যে রেকর্ড দিয়ে আনন্দ
সেই লং প্লে রেকর্ড
সত্যজিৎ রায়ের
হীরক রাজার দেশে
ECSD 3418 স্টিরিও
পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজিত
সকলকে ভুলিয়েছে যে ছায়াছবি তারি মজার গানে ভরপুর
আর মজাদার সব সুর নিয়ে এই লং প্লে রেকর্ডটি
এইচ এম ভি প্রকাশ করেছে
এতে আছে অনুপ ঘোষালের কণ্ঠে অনুপম এক গুচ্ছ গান,
অমর পালের কণ্ঠে অবিস্মরণীয় একটি গান
আর সত্যজিৎ রায়ের আবহ সঙ্গীতের মূর্ছনা
আর আছে
এই প্রথম বহুবর্ণে মুদ্রিত
বাংলা ছায়াছবির রেকর্ডের
ডাবল্ জ্যাকেট যেখানে সব
কটি গানের কথা সাজিয়ে
উপহার দেওয়া হয়েছে
আজই আপনার
নিকটতম
এইচ এম ভি
ডীলারের কাছে
খোঁজ করুন
HMV

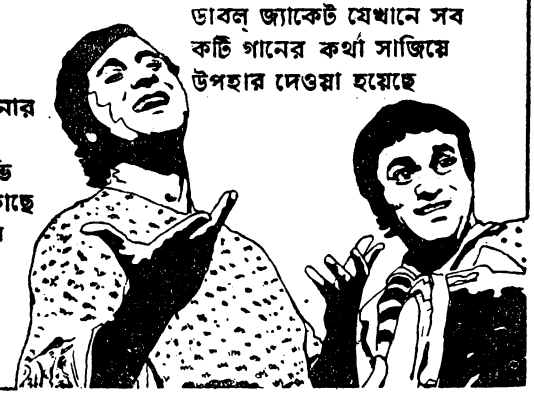

'ব্যাপারটা কি ?' জোড়া প্রতিযোগিতা

১। প্রফেসর চট্টোরাজ কি দেখে এত অবাক হয়েছেন সেটা এঁকে বুঝিয়ে দাও।
(ডানদিকের ফাঁকা জায়গাটাতে আঁকতে হবে।) দরকার হলে ছবিটা কাঁপ করে নাও।

২। সংক্ষেপে, একশ শব্দের মধ্যে, লিখে বুঝিয়ে দাও ব্যাপারটা কি ?

(নিয়মাবলী পরের পৃষ্ঠায়)

নাম..... বয়স.....

গ্রাহক নং .....

নিয়মাবলী

১। সতের বছরের কম বয়সের সব গ্রাহক / পাঠক যোগ দিতে পারবে।

২। গ্রাহক স্কুল, ক্লাব, লাইব্রেরির ছাত্র, মেম্বাররাও ব্যক্তিগত ভাবে যোগ দিতে পারবে।

৩। নাম, ঠিকানা, বয়স ও গ্রাহক নম্বর স্পষ্ট করে লিখবে। যে স্কুলের গ্রাহক নম্বর নেই তারা স্কুলের আর জেলার নাম লিখবে।

৪। যারা গ্রাহক নয় তারা নিচের ফর্মটা ভর্তি করে দেবে।

৫। ৩০ শে অক্টোবরের মধ্যে উত্তর আমাদের হাতে পৌঁছন চাই। খামের উপর লিখবে 'ব্যাপারটা কি ?'

৬। একই নম্বরে একাধিক গ্রাহক থাকলে সকলেই ব্যক্তিগত ভাবে যোগ দিতে পারবে।

৭। প্রত্যেকে একটি বা দুটি প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে কিন্তু একই প্রতিযোগিতার একাধিক উত্তর দিতে পারবে না।

৮ প্রথম প্রতিযোগিতায় চারটি ও দ্বিতীয়তে চারটি, মোট আটটি পুরস্কার থাকবে—,

ক বিভাগে—যাদের বয়স ১২র কম—১ম ২০,০০ এবং ২য় ১০,০০

খ বিভাগে—বয়স ১২ বা তার বেশী কিন্তু ১৭র কম—১ম ২০,০০ এবং ২য় ১০,০০।

(দরকার হলে পুরস্কার ভাগাভাগি করে দেওয়া হবে।)

লাইন বরাবর কেটে পৃষ্ঠাটা আলগা করে নাও।——————————→

যারা গ্রাহক নও তাদের

নাম..... **বয়স**.....

ঠিকানা

.....

.....

.....

পূজোয় বিশেষ আকর্ষণ

অমর চিত্র কথায়

সচিত্র

রামায়ণ ৯.০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র অনূদিত

সম্প্রতি প্রকাশিত :

রাম শাস্ত্রী লোকমান্য তিলক জয়প্রকাশ

বাবা সাহেব আম্বেদকার।

উচ্চারণ : ২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট /

কলিকাতা-৭০০ ৭৩

P. B. SIRKAR & SONS

JEWELLERS

89, CHOWRINGHEE ROAD,

CALCUTTA—20

Phone : 44-8773

We have no Branch Shop

তোমাদের মনের মতো রঙিন পূজাবার্ষিকী

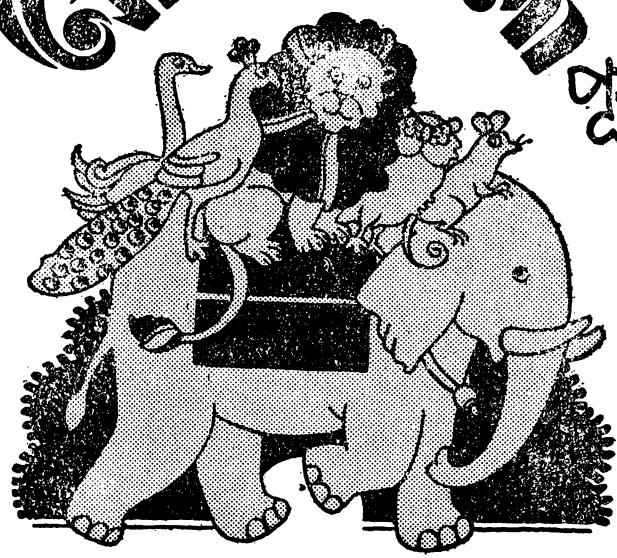

বিশেষ আকর্ষণ

অবনীন্দ্রনাথের
অপ্রকাশিত রচনা

শিশিরকুমার বসুর
আমরা নেতাজীর ক্যাডেট

শমীর চিঠি
কী করে নম্বর বাড়াতে হয়

ছড়া
অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুনির্মল বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, মৌমাছি, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, সুশীল রায়, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

গল্প
মনোজ বসু, লীলা মজুমদার, বুদ্ধদেব গুহ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, অরবিন্দ গুহ, অরুণ বাগচী, নবনীতা দেবসেন, তারাপদ রায়, হিমানীশ গোস্বামী, বলরাম বসাক, শেখর বসু ও আরও অনেকে।

ভ্রমণকাহিনী, ধাঁধা, শব্দসন্ধান ও আরও অনেক আকর্ষণ

দাম ১৬.০০ টাকা
রেজিস্ট্রীডাকে ১৮.৯০

উপন্যাস
সত্যজিৎ রায়ের
(সুবিশাল শঙ্কু-কাহিনী)
আশাপূর্ণা দেবী
সমরেশ বসু
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
শৈলেন ঘোষ

বড় গল্প
বিমল মিত্র
বিমল কর
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ফটো টাইপ সেটিং পদ্ধতিতে অফসেটে ছাপা, অনবদ্য লেখায় ঠাসা পূজাবার্ষিকী

গোয়েন্দা রিপের সুবিশাল চিত্রকাহিনী "হারানো মেয়ে"

AAM/CAS-2/81 BEN

ছোটদের বই

ছোটদের মনের মতো বই

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

কিশোর সমগ্র

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

কিশোর রচনাবলী

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

১১-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

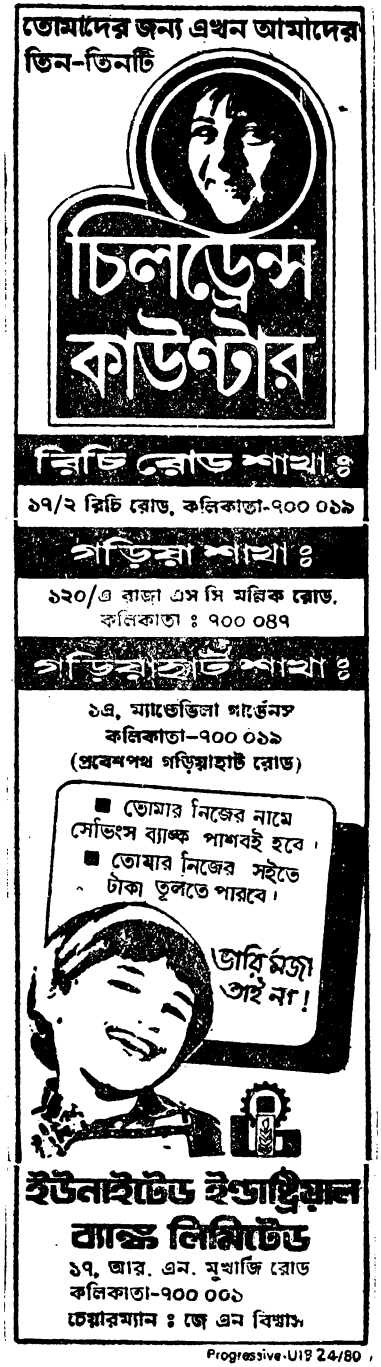

স্বাগত?

ব্রিটানিয়া বিস্কুট সবার কাছেই এমনি আদরের।
মুচমুচে, মুখরোচক, আর যখনই মুখে দেবেন
একেবারে টাটকা স্বাদ! ব্রিটানিয়ার মত
এতো রকম রকম বিস্কুটও আর হয় না।
সাধারণ ধরনের, ক্রীমে ভরা, মিষ্টি, মসলাদার কি
নোনতা যেমনটি চাই পাবেন। ব্রিটানিয়ার সব
বিস্কুটই স্বাদে ভরা—সবার সেরা। ব্রিটানিয়া
বিস্কুটের আদর তাই সবার কাছে, সব সময়।

ব্রিটানিয়া
বিস্কুট

আপনার আদরের শিশুটির জন্য...

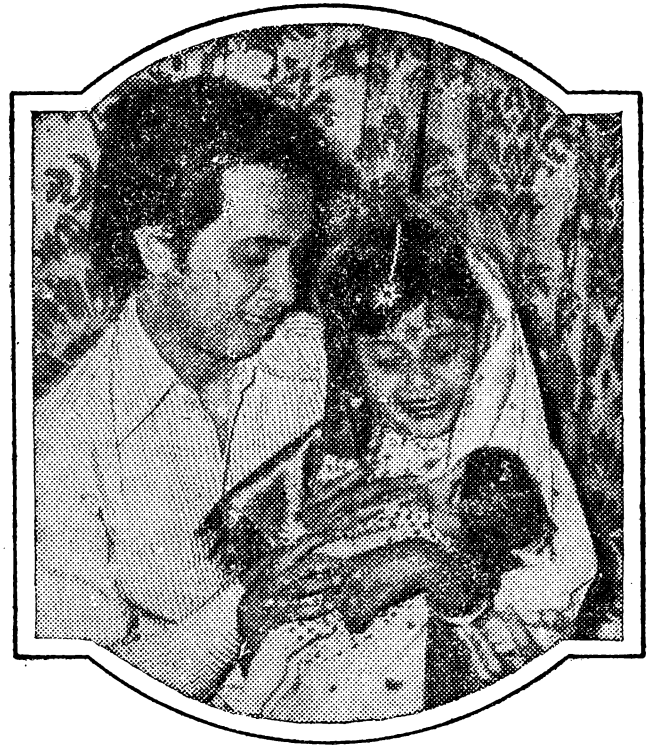

শিশু উপহার প্রকল্প
যা আপনার স্বপ্নকে করে সত্যি

আপনার শিশুকে ইউনিটের একটি বিশেষ উপহার দিন—পঞ্চাশের উর্ধ্বে এবং দশের গুণিতকে। শিশুর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আপনার উপহারের পরিমাণও বাড়তে থাকবে—নিরাপদে, নির্ভাবনায়। একুশবছর বয়সে (মেয়েদের আঠারো) সে দেখবে একটি বিরাট অংকের টাকা তার জন্য অপেক্ষা করছে–ঠিক যখন তার টাকার দরকার—বিয়ে কিংবা উচ্চশিক্ষার জন্য।

এ ছাড়াও প্রত্যেকের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় বোনাস—লটারীতে নগদ পুরস্কার পাবার সুযোগ—কে বলতে পারে আপনার শিশুর জন্য হয়তো একটি ছোট ভাগ্য ওঁৎ পেতে রয়েছে।

বিশদ বিবরণের জন্য যে কোন ব্যাংক/ আমাদের এজেন্ট অথবা সরাসরি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন—

ইউনিট ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া

(একটি সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত আর্থিক সংস্থা)
৪ ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা-৭০০০০১,
ফোন : ২৩-৯৩৯১, ২৩-১৬৩৮, ২২-৮৭৯৫

সঞ্চয় গড়ে তুলুন–ইউনিটে ইউনিটে

UTI-144/80 Ben

॥ বাস্তবের মুখোমুখী ॥

সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় চেতনার ক্ষেত্রে প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে যে শহর কলকাতা সমগ্র ভারতবর্ষে একটি স্থান অধিকার করেছিল, স্বাধীনতার তিরিশ বছরের মধ্যে জাতীয় নেতৃত্বের ঔদাসীন্য ও অবহেলায় চারিদিক থেকে স্তূপীকৃত নৈরাশ্য তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইছে।

এই শহরের সমস্যা চিত্র যেমন বিশাল তেমনি ভয়াবহ। আলোবাতাসহীন অন্ধকার নোংরা ঘিঞ্জি বস্তি, খোলা নর্দমা, খাটা পায়খানা, স্তূপীকৃত আবর্জনা, রাতে মশা—দিনে মাছি, পথ-কুকুর, ছাড়া গরু, পানীয় জলের অভাব, ফুটপাথের বাসিন্দা, ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট, ট্রাফিক জ্যাম, হকারি, মস্তানি, গুণ্ডামি, ভেজাল খাবার, ভেজাল ওষুধ, মদের চোরা কারবার, জুয়া, অপসংস্কৃতি সব মিলিয়ে আমাদের টানে এক অঅলান্ত গহ্বরের দিকে।

কিন্তু তবু এই কলকাতায় নৈরাশ্যের অন্ধকারের মধ্য থেকেই জীবনের শত সহস্র আলোর ধারা ছড়িয়ে পড়ে। খেলার মাঠে, ময়দানের সভায়, পথে পথে মিছিলে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

আশাবাদী মানুষ, সরকার যদি উদ্যোগী হয় তাহলে মানুষ ধৈর্য ধরতে এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতেও প্রস্তুত। তাই আমাদের আবেদন ;

১। জলের অপচয় করবেন না। কলের মুখ খোলা থাকলে বন্ধ করে দিন।

২। নির্দিষ্ট পাত্রে ছাড়া রাস্তায় কোথাও জঞ্জাল ফেলবেন না।

৩। রাস্তার বাতিস্তম্ভ থেকে বিদ্যুৎ চুরি একটি ঘৃণ্য অপরাধ।

৪। দেওয়ালে কুৎসিত কিছু লিখিবেন না।

৫। ফুটপাথ পথচারীদের, এখানে কায়েমী স্বত্ব গড়ে তুলবেন না।

৬। রাজস্ব আদায় সমৃদ্ধির অন্যতম চাবিকাঠি—কর বাকি ফেলবেন না।

৭। ভেজালকারীদের চিহ্নিত করে সংগঠিতভাবে তার শাস্তি দাবি করুন।

গঠনমূলক সমালোচনা এবং ঐকান্তিক সহযোগিতা আমাদের সমস্যা সমাধানের পথ সুগম করবে।

কলকাতা পুরসভা কর্তৃক প্রচারিত।

অসতর্কতা থেকেই দুর্ঘটনা

ছোটরা

পথচলার এই নিয়মগুলি মেনে চল নয়ত তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে

কি করবে

* পার্ক অথবা খেলার মাঠের মত নিরাপদ স্থানে খেলাধূলা করবে।
* বর্ষাকালে বেশী সতর্ক থাকবে। কারণ পিছল রাস্তায় চলন্ত গাড়ী হঠাৎ থামতে পারে না, খানিকটা গড়িয়ে যায়। তোমরা সামনে এসে পড়লে আঘাত লাগতে পারে।
* গাড়ী চলাচলের সংকেত ও পথের সাংকেতিক চিহ্নগুলি শিখে নেবে।
* রাস্তার ধারে রেলিং থাকলে তার ভিতর দিয়ে চলাফেরা করবে।

কি করবে না

* হঠাৎ দৌড়ে কখনও রাস্তায় নামবে না।
* বন্ধুকে ধরার জন্য অথবা ঘুড়ি বা বলের পিছনে কখনো রাস্তায় দৌড়বে না।
* রাস্তায় দাঁড়ানো গাড়ীর আসেপাশে খেলবে না।
* চলন্ত গাড়ীতে কখনও ঝুলবে না বা চড়বার চেষ্টা করবে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

আই সি এ—২১৫৫২। ৮১

IT IS BETTER TO LIGHT A CANDLE THAN
CURSE THE DARKNESS

With best compliments from :

M/S VIJAY TUBES AND CONES
PRIVATE LIMITED

Kamal Kumar Kapur Director

Manufacturers of :

Laminated Paper Containers and Tubes of all Sizes

Factory :
Plot No. 4 & 5
M. I. D. C. Area
Satpur
NASIK—422007
Gram : VIJAYTUBE
Phone : 8128 : 8428 : 8528
Telex : 0752-235

Office :
Rabia Manzil, 1st Floor
82, Trinity Street
Dhobi Talao
BOMBAY—400 002
Gram : VIJAYTUBE
Phone : 262842
266397

With best compliments from :-

RAYCO

RAYCO ELECTRO ENTERPRISE

43, BIPIN BEHARI GANGULY STREET

CALCUTTA—700012

Phone: 27-6947; 27-0050-

With best compliments from :

GBM AGENCIES PRIVATE LTD.

CAMAC COURT
25, CAMAC STREET
CALCUTTA : **700 016.**

PHONE	TELEX	GRAM
44 2189	021 2461	'FLAWLESS'
43 2058	GBEM IN	Calcutta

With Compliments of

Indian Lead Private Limited
Smelters & Refiners
of
Secondary Lead

Kalipark, P. O R, Gopalpur
Dist. 24-Parganas (W. B.)
Tel. No. 57-4233/57-4779
Telex No. 021-2956.

Lal Bahadur Shastri Marg
Majiwada, Thane, Maharashta,
Tel. No. 59-3300/59 2458
Telex No. 011-4948.

মুখে দিলে গলে যায়, আহারে কি পুষ্টি!

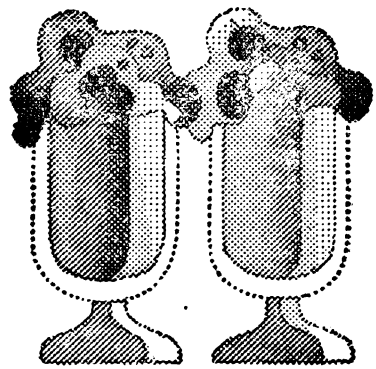

Kwality
আইসক্রীম

কোয়ালিটি আইসক্রীমস্ প্রাইভেট লিমিটেড ৭৪ ডায়মণ্ড হারবর রোড কলিকাতা ৭০০ ০২৩

With best Compliments from :

ASHOKA INDUSTRIES

Engineers & Manufacturers

Specialised in Pressure and Gravity

Die Casting

To

The Readers & Patrons of 'SANDESH'

Address AshoKa Industries
16. India Exchange Place
Room No. II
2nd Floor
Calcutta-I

Phone : 22-8857
22-3936

Blending products,
processes and technology
with people,
their needs, and the
environment: at GKW,
these are the priorities that
define our purpose.

Our range of
products have evolved out
of these needs,
and today constitute vital
intermediates, integral to
almost every area
of industry and life. In
India, and even overseas.

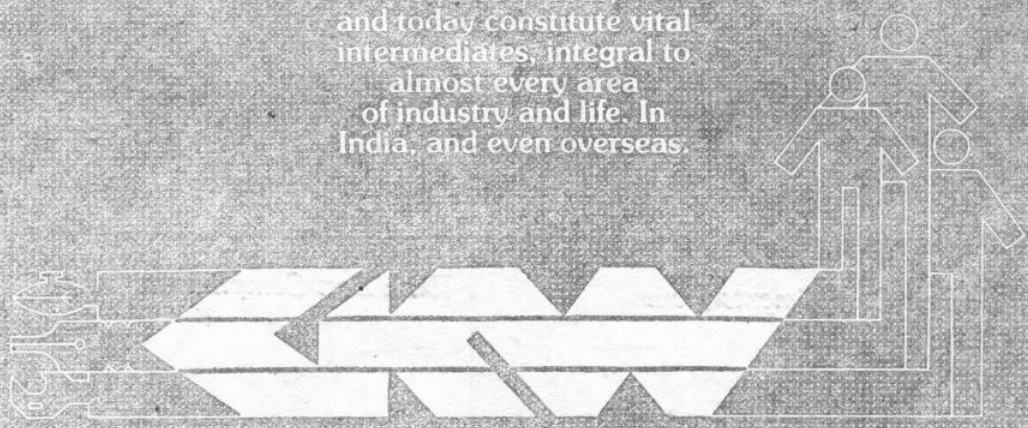

Our speciality: fusing technology with needs

GUEST KEEN WILLIAMS LTD.

The Engineers' Engineers

SAA/GKW/14

With Best Compliments from

INDIAN PACKAGING INDUSTRIES

8, CAMAC STREET, CALCUTTA-700017

Telephone : 44-5436
44-4986

Telegraph : "INPTACKTAPE"

Makers's of

'Suraj' Brand Bitumenised Waterproof Paper, Waxed Paper, Gummed Paper tape rolls, Pollythene Lined Bitumenised Hessian cloth and Bags & Wholesaler of All Kinds of Paper and Boards.

With Best Compliments from

Apeejay Private Limited

APEEJOY HOUSE

15, Park Street

Calcutta-16

Telex 0217309 A P C A

Gram Apeejay

Phone 247537

With Best Compliments from

Sri Ganesh Chakravorty

(**Govt. Contractor**)

P-33, Bhupen Roy Road

Calcutta-700034

সন্দেশের পাঠকদের জানাই
শারদীয়া শুভেচ্ছা

★

যন্ত্র শিল্প

ট্রান্সফর্মার, কয়েল, রেকটিফায়ার ও ব্যাটারিচার্জারের
নির্মাতা এবং সংস্কারসাধক

৭৫, এস এন রায় রোড
কলিকাতা-৭০০০৩৮

খাল-বিল-নদীর ভরা যৌবন।
শিশিরে ভেজা মাটিতে এখন পূজোর গন্ধ।
কাঠামো, খড়, মাটি ও ছাঁচ।
তার উপর তুলির রঙ্গে আর ঘামে অপরূপ প্রতিমা।
তার বোধনের আর কত দেরী?

কলকাতাও এমনি এক অপরূপ প্রতিমা।
তিলে তিলে গড়ে উঠেছে এই তিলোত্তমা।
তার চাল-চিত্র রচনায় আমরা দিন-রাত ব্যস্ত।
বোধনের আর দেরী নেই।

মেট্রো রেলওয়ে

medium

—কাছে বা দূরে—

পুজোর ছুটিতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমাদের বাসে বেড়িয়ে আসুন

ভ্রমণ—ছেলেমেয়েদের কাছে শিক্ষা ও আনন্দের এক শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। আর এরই প্রশস্ত সময় পুজোর ছুটি,—আকাশে বাতাসে যখন রোদ ঝল্‌মল্‌ শরতের খুসীর ছোঁয়া।

তাই ওদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। কলকাতার ভেতর ত' আছেই—যেমন ঝিল্‌মিল্‌, শিশু উদ্যান বা বটানিক্যাল গার্ডেনস্‌। তাছাড়া কাছে দূরে বা অল্পদূরের অনেক জায়গাতে আমাদের বাস যায়। পাহাড়, জলপ্রপাত দেখতে চান তো নেতার হাট, হুন্ড্রু (রাঁচী) চলুন।

ছেলেমেয়েদের কাছে সমুদ্র যে কত আনন্দের তা' ত জানেনই। তাই আমাদের বাস আপনাকে দীঘা নিয়ে যাবে অথবা বকখালি বা ফেজারগঞ্জ যাওয়ার জন্য নামখানা পর্য্যন্ত পেঁাছে দেবে। উড়িষ্যার জঙ্গল দেখতে হলে কেওনঝড় চলুন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পলাশী ও মুর্শিদাবাদের দেখার জায়গা গুলি আমাদের বাসে করেই ছেলেমেয়েদের দেখিয়ে আনতে পারেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন, রামকৃষ্ণদেব ও সারদাদেবীর স্মৃতি বিজড়িত কামারপুকুর আর জয়রামবাটী, বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির মন্দির কিংবা পীঠস্থান তারাপীঠ ষ্টেট ট্রান্সপোর্টের বাসে করেই সপরিবারে দেখে আসুন।

তারা তাদের চোখ দিয়ে দেখে আনন্দ পাবে। আপনি আপনার অনুভূতি দিয়ে উপভোগ করুন।

কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্পোরেশান
৪৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ,
কলিকাতা—১৩,

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

শারদীয় ১৩৮৮

৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলকাতা ৭৩

ছবি এঁকেছেন
দেবাশিস দেব
প্রচ্ছদ এঁকেছেন
অমিয় ভট্টাচার্য

দাম ১৫·০০।
রেজেস্ট্রী ১৮·০০।

৬টি কল্প-বিজ্ঞানের গল্প লিখবেন

বিমল কর ।। নিরঞ্জন সিংহ
অনীশ দেব ।। মুস্তাফা সিরাজ
আনন্দ বাগচী ।। সিদ্ধার্থ ঘোষ
দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ।।

৩টি বিজ্ঞান-ভিত্তিক উপন্যাস লিখবেন

অদ্রীশ বর্ধন ।। সঙ্কর্ষণ রায়
ও সমরজিৎ কর

৫টি বিজ্ঞান-ভিত্তিক গল্প লিখবেন

বিকাশ বসু ।। বিমলেন্দু মিত্র
বৃন্দাবন বাগচী ।। কিন্নর রায়
শিশির মজুমদার এবং
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

আন্তর্জাতিক বিখ্যাত তিনটি রচনার অনুবাদ
এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ।। চণ্ডী সেনগুপ্ত
এবং সৌরীন ভট্টাচার্য

১০টি বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক আবিষ্কার

সুনীল সরকার ।। বিবেক রায়
সমীর ঘোষ ।। গণেশ বিশ্বাস
দিবাকর সেন ।। মৃন্ময়ী দাস
শক্তিপদ সরকার এবং আরও অনেকে

পশু-পাখি ও গাছপালা

অজেয় রায় ।। সুনির্মল চন্দ
বলরাম মজুমদার
অজয় হোম

অপ্রকাশিত রচনা
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের
ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ

বিশেষ রচনা
শ্রীপান্থের
অজানা কলকাতার রেখা রহস্য

শিবকালী ভট্টাচার্য
বুদ্ধি-স্মৃতি-মেধা

সত্যজিৎ রায়ের
বিশাল শঙ্কু কাহিনী

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
ঘনাদার ফ্যাণ্টাসী

২০টি নির্বাচিত প্রবন্ধ

জয়ন্ত বসু ।। ক্ষেত্রমোহন সেনশর্মা
রমাতোষ সরকার
সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র
জগদীশ ভট্টাচার্য ।। অনাদি দাঁ
অমরনাথ রায় ।। বিমান বসু
শ্রীকুমার রায় ।। অরুণ চক্রবর্তী
মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ
প্রসাদকুমার দাস

২টি সায়ান্স ফ্যাণ্টাসী

লীলা মজুমদার
পার্থসারথি চক্রবর্তী

১০টি কল্প-বিজ্ঞানের ছড়া

অন্নদাশঙ্কর রায় ।। কৃষ্ণ ধর
অমিতাভ চৌধুরী ।। সুশীল গুপ্ত
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
দক্ষিণারঞ্জন বসু
রঞ্জন ভাদুড়ী

পড়াশোনা বিভাগে

তারকমোহন দাশ
অরূপরতন ভট্টাচার্য

মায়েদের প্রধান ভরসা...

কেয়ার্স ফেস-ক্রীম

হোমিওপ্যাথিক উপাদানে তৈরী শিশুদের এক অপরিহার্য্য প্রসাধন। এতে শিশুর ত্বকের স্বাভাবিক কোমলত্ব বজায় থাকে ও ত্বককে করে তোলে নীরোগ ও উজ্জ্বল। শরীর হয় ঝরঝরে, মনে আনে উচ্ছলতা। মায়ের মন খুশীতে ভরে ওঠে।

Standard

CARE

প্রস্তুতকারক ঃ—
কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল
রুবী পার্ক, কলিকাতা-৭৮

রূপের জগতে এলো অপরূপ শ্যাম্পু

হোমিওপ্যাথিক উপাদানে বিশেষ ভাবে তৈরী বলে অন্যান্য বাজার চালু সিন্থেটিক শ্যাম্পুর মতো চুলের কোনো ক্ষতি করে না। আর্নিকা শ্যাম্পু চুলের রুক্ষতাকে দূর করে। চুল ওঠা বন্ধ করে খুসকি থেকে আপনার চুলকে রক্ষা করে। আপনার চুলের কমনীয়তার জন্য আজই আর্নিকা শ্যাম্পু ব্যবহার করুন।

CARE

প্রস্তুতকারক ঃ—
কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল
রুবী পার্ক, কলিকাতা-৭৮

ইনডেন্টিং এজেন্ট : **ক্যালকাটা মারকেটিং সার্ভিস,** ২০০ডি, এস, পি, মুখার্জী রোড, কলি-২৬, ফোন : ৪৬-৩৭২৭।

ছোটদের মন-মাতানো বই

কুলদারঞ্জন রায় অনুদিত
জুল ভার্ন-এর আশ্চর্য দ্বীপ ২'০০
কন্যান ডয়েল-এর 'অজ্ঞাত জগৎ' ১৫'০০
শুধু জুল ভার্ন আর কন্যান ডয়েল-এর রোমাঞ্চকর অভিযানের কাহিনী বলেই আকর্ষণ করে না, কুলদারঞ্জন রায়ের অনবদ্য অনুবাদের গুণে জানা গল্পও আবার পড়তে হয়।
নিরেট মস্তকদের জন্য শিবরাম চকোরবর্তীর মাথাব্যথা
মাথা যদি নিরেট হয় ৪'০০
পাতাল পথে ডকটর কয়াল ৩'০০
প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়ের আকর্ষণীয় সায়ন্স ফিক্‌শন
কু ঝিক ঝিক রেল গাড়ী ৬'০০
রেলগাড়ীদের নিজের মুখে তাদের আবিষ্কারের ইতিহাস
এক যে ছিল যাদুকর ৬'০০ জে বি হ্যালডেন
কেলোর কীর্ত্তি ৩'০০ রমা ভট্টাচার্য
অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দির এ১৮এ কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০০০৭

With the best compliments of

Allied Enterprise

58B, CHAKRABERIA ROAD,
CALCUTTA-20

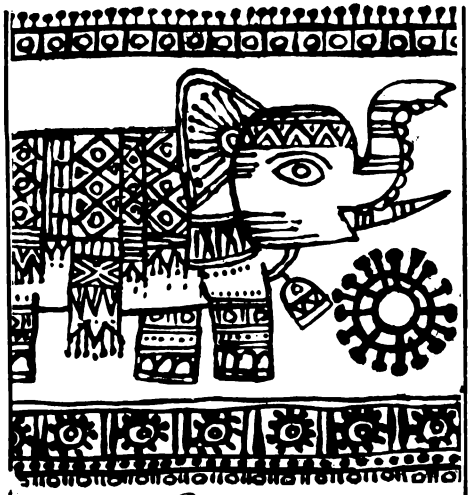

পুজোয় চাই নতুন চটি

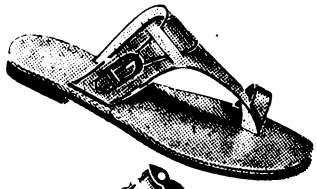

জুবিলি ১২
সাইজ ২-৫
টা. ২৬.৯৫

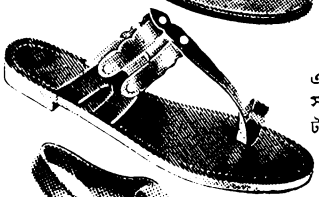

এভারিবডি ১১
সাইজ ১২-১
টা. ১৮.৯৫

টোনি ০৮
সাইজ ৪-৬, ৭-১০
টা. ১৭.৯৫, ১৯.৯৫

স্লেমেট ৫০
সাইজ ৩-৬, ৭-১০
টা. ১৮.৯৫, ২০.৯৫

লিলিপুট ৫৩
সাইজ ৫-৮, ৯-১১
টা. ১৯.৯৫, ২০.৯৫

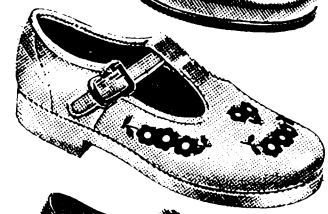

লিলিপুট ৬৫
সাইজ ৫-৮
টা. ২২.৯৫

বাবলগামার্স এ২
সাইজ ৪-৬, ৭-১০
টা. ১৭.৯৫, ১৯.৯৫

Bata understands shoes

লিলিপুট ২৯
সাইজ ৫-৮, ৯-১১
টা. ১৯.৯৫, ২০.৯৫

বাবলগামার্স জি২
সাইজ ৪-৮
টা. ১৫.৯৫

নটিবয় ০২
সাইজ ৯-১১,
১২-১, ২-৫
টা. ৩৮.৯৫,
৪২.৯৫, ৪৮.৯৫

Bata

কালি প্রিন্টার্স এণ্ড বাইণ্ডার্স ১০৯বি, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত
সন্দেশ কার্যালয়—১৭২/৩ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯
অশোকানন্দ দাস কর্তৃক প্রকাশিত।